জীবনবেদ

অর্থাৎ

শ্রীমদ্ আচার্য

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের

নিজমুখ-বিবৃত স্বীয় জীবনতত্ত্ব



নববিধান পাবলিকেশন্ কমিটি

৯৫, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

নববিধান পাব্লিকেশন্ কমিটি

ও

ব্রাহ্মসমাজ অফ্ ইণ্ডিয়ার উদ্যোগে

শ্রীতপোব্রত ব্রহ্মচারী, সম্পাদক, নববিধান পাব্লিকেশন্ কমিটি কর্তৃক ৯৫
কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীসুনীলকৃষ্ণ
পোদ্দার কর্তৃক শ্রীগোপাল প্রেস, ১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৪ হইতে মুদ্রিত

সংস্করণ-পরিচয়

আচার্যদেবের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় চিকিৎসকদের পরামর্শে ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শকে (৪ঠা জুন, ১৮৮২ খৃঃ) তাঁহাকে সপরিবারে দার্জিলিং লইয়া যাওয়া হয়। সেখানকার জলবায়ুতে বিশেষ উপকার না হওয়ায়, ২৬শে আষাঢ়, ১৮০৪ শকে (৯ই জুলাই, ১৮৮২ খৃঃ) তাঁহাদের কলিকাতায় ফিরাইয়া আনা হয়। দার্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসিবার পর, ৮ই শ্রাবণ, ১৮০৪ শক (২৩শে জুলাই, ১৮৮২ খৃঃ) হইতে আচার্যদেব প্রায় প্রতি রবিবার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে "জীবনবেদের" এক এক অধ্যায় বর্ণন করিতে থাকেন। গৃহস্থ-প্রচারক স্বর্গগত নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয় ঐ উপদেশগুলি ধরিয়া রাখিয়া মহৎকার্য সাধন করেন। ঐ উপদেশগুলি প্রথম "ধর্মতত্ত্ব" পত্রিকায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পুস্তিকাকারে "সেবকের নিবেদন" (নূতন প্রকরণ) ৭৩-৭৭, ৮০-৮৬, ৮৯-৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। একত্রে "জীবনবেদ" নামে ঐ পুস্তিকাগুলিকে ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটি ১৮০৫ শকে মাঘমাসে (জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ) পুস্তকাকারে উপস্থিত করেন। ঐটিকেই "জীবনবেদের" প্রথম সংস্করণ বলিয়া ধরা হয়। ঐগুলি ৬নং কলেজস্কোয়ারে বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্বস্ব ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৮০শকে ৭২নং আপার সার্কিউলার রোডস্থ বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্বস্ব ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ও ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংস্করণ ১৮২১ শকে ঐভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। চতুর্থ সংস্করণ ১৮৩৩ শকে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটস্থ মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে কে, পি, নাথ দ্বারা মুদ্রিত ও ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে পুস্তকের আরম্ভে "জীবনবেদ" প্রার্থনাটি এবং "জীবনগ্রন্থ" শীর্ষক সেবকের নিবেদনের উপদেশটি দেওয়া হয়। পঞ্চম সংস্করণ ৭৮নং অপার সার্কিউলার রোডস্থ বিধান প্রেসে আর. এস. ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ও ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে "অনৃতখণ্ডন" শীর্ষক অধ্যায়টি "ধর্মতত্ত্ব" হইতে লইয়া সংযুক্ত করা হয় এবং প্রথমদিকে "জীবনগ্রন্থ" উপদেশটি তুলিয়া দিয়া, "জীবনবেদ" প্রার্থনা সহ একটি ভূমিকা দেওয়া হয়। ষষ্ঠ সংস্করণ ১৮৪৮ শক—১৯২৬ খৃঃ ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থ নববিধান প্রেসে বি. এন. মুখার্জি দ্বারা মুদ্রিত ও ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। সপ্তম

সংস্করণ ১৮৫৬ শক—১৯৩৪ খৃঃ ৩নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটস্থ নববিধান প্রেসে শ্রীপরিতোষ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও ৮৯নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীট হইতে নববিধান পাব্লিকেশন্ কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। অষ্টম সংস্করণ ১৮৭৬ শক—১৯৫৪ খৃঃ নববিধান পাবলিকেশান কমিটির পক্ষে স্বর্গগত সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। দেখা যায়, জীবনবেদ বর্ণনার প্রথমেই আচার্যদেব "জীবনগ্রন্থ" উপদেশটির উল্লেখ করিয়াছেন। এই উপদেশটিতেই জীবনবেদ বিবৃতির প্রেরণার প্রকৃত উৎসের সন্ধান রহিয়াছে। সেইজন্য অবতরণিকা স্বরূপ "জীবনগ্রন্থ" উপদেশ ও "জীবনবেদ" প্রার্থনাটি অষ্টম সংস্করণে যুক্ত করা হয়; বহুকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিবার পর বর্তমান সংস্করণটি নববিধান পাব্লিকেশান কমিটি ও ব্রাহ্মসমাজ অফ্ ইণ্ডিয়ার যৌথ পৃষ্ঠপোষকতায় পুনরায় জনসম্মুখে উপস্থিত করা হইল। নূতন সংস্করণে অধ্যাপক শ্রীসুরথ চক্রবর্তীর লেখা ভূমিকা সংযোজিত হইল। এই ভূমিকাটি "জীবনবেদ" পাঠে অত্যন্ত সহায়ক হইবে বলিয়া আশাকরা যায়। ইহা ছাড়া ব্রাহ্মসমাজ অফ্ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক শ্রীঅনিলকুমার মৈত্রেয় লেখা "ব্রাহ্মসমাজ-ইউনিটেরিয়ানবাদ-কেশবচন্দ্র" পরিশিষ্টে সংযুক্ত হইল।

"জীবনবেদ" জীবন তত্ত্ববিষয়ে একটি অপূর্ব গ্রন্থ। আচার্যদেব বলিয়াছেন—'মানুষের জীবনই প্রকৃত ধর্ম পুস্তক।' যে জীবনে জীবন্তসত্য প্রকাশিত হয় সেই জীবন ঈশ্বরস্পর্শে হয় ধন্য ও পবিত্র। ভক্তের জীবনে ঈশ্বরের প্রেমলীলা কেমন সুকৌশলে সংঘটিত হয় তাহারই বর্ণনা পাওয়া যায় এই পুস্তকটিতে। ভাব ও ভাষার দিক হইতে এই পুস্তক কেবল বঙ্গ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদই নয়। এই পুস্তক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে মনের অগোচরে অন্তর্জীবনের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই—হিন্দি (দুটি), উর্দু, সংস্কৃত, তেলেগু, উড়িয়া, মারাঠি, ইংরাজি (চারটি) ও ফরাসী ভাষায় পুস্তকটি অনুবাদিত হইয়াছে। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় পুস্তকটির সমাদর কতখানি।

অবতরণিকা

জীবনগ্রন্থ

(সেবকের নিবেদন, ২১ নভেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত)*

যখন নববিধান স্বর্গ হইতে অবতরণ করিলেন, তখন তিনি স্বর্গীয় পিতার নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি পৃথিবীতে গিয়া কি শিক্ষা দিব, শিক্ষার মূল গ্রন্থ কি, এ বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন। ভগবান্ বলিলেন, "নববিধান, তোমার বিশেষ কোনো পুস্তক অবলম্বন করিতে হইবে না। লোকের চরিত্র পুণ্য প্রেমে গঠন করিয়া, জীবনগ্রন্থ হইতে ঘটনাশ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিবে এবং তদ্দ্বারা জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার করিবে। জীবন হইতে জীবন জন্মিবে তুমি দৃষ্টান্তের প্রমাণে সত্য প্রচার করিবে। তুমি পৃথিবীতে গিয়া মৃত পুস্তকের পরিবর্তে জীবন্ত গ্রন্থ প্রচার করো, এই তোমার প্রতি অনুজ্ঞা।" নববিধান এই উপদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। পৃথিবীতে আসিয়া আজ্ঞা প্রচার করিলেন, কোনো বিশেষ পুস্তকের আধিপত্য থাকিবে না, বাইবেল কোরাণ, বেদ পুরাণ সকলের উপরে ভক্তজীবনরূপ ধর্মপুস্তক সমাদৃত হইবে, সর্বত্র ঐ গ্রন্থ পূজিত হইবে ; উহা পৃথিবীকে হরিপ্রেমলীলা জীবন্ত আকারে প্রদর্শন করিয়া ধর্মশিক্ষা দিবে।

মনুষ্যের নিকটে জীবনের তত আদর নাই, যত গ্রন্থের। পৃথিবীতে গ্রন্থপূজা অত্যন্ত প্রবল। গ্রন্থের পরাক্রম ও মহিমা বলিয়া শেষ করা যায় না, কিন্তু গ্রন্থের গৌরব জীবন থাকিতে হয় না। জীবন অবসান হইলে গ্রন্থের আদর। যতদিন ভক্তজীবনে হরি জীবন্ত ধর্ম দেখান, ততদিন উহাই ঈশ্বররচিত বাইবেল কোরাণ বলিয়া আদৃত হইবে। মনে করিয়া দেখ, পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রতি লোকের এত শ্রদ্ধা কেন ? উহাতে ভক্তজীবন লেখা আছে বলিয়া। পুরাণের গৌরব এইজন্য যে, এক সময়ে ভক্তেরা স্বীয় স্বীয় জীবনে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাই উহার ভিতরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভক্তজীবনের ঘটনা লিপিবদ্ধ

---

* জীবনবেদের সূচনায় আচার্যদেব এই উপদেশটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

হইলেই তাহা পুরাণ হইল। যখন ঘটনা ঘটে, যখন লোকে উহা চক্ষে দেখে, তখন উহা গ্রন্থবদ্ধ হয় না। তখন লোকে পড়ে না, দেখে। ঘটনাস্রোত ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইল, ইতিহাস কালক্রমে নিস্তব্ধ হইল, অভিনয় শেষ হইল, রঙ্গভূমি হইতে অভিনেতৃগণ ফিরিয়া গেলেন। জীবনচরিত ইতিহাসে পরিণত হইল, তখন পুরাণের আরম্ভ হইল। গ্রন্থ জীবনের স্থান গ্রহণ করিল, মানুষের চরিত্র শাস্ত্রে পর্যবসিত হইল। প্রত্যক্ষ ঘটনা শ্রুতি স্মৃতি হইল। পূর্বে যাহা চক্ষু দেখিল, এখন তাহা কলম লিখিল, বুদ্ধি বুঝিল।

যাহা হউক, মূলশাস্ত্র জীবন, নববিধান এই গূঢ় কথা প্রকাশ করিলেন। এখন গ্রন্থের সময় নহে, জীবনের সময়, জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের সময়। বর্তমান বিধানে এই শুভ সংবাদ প্রচার হইল যে, বেদ পুরাণ অপেক্ষা ভক্তজীবন বড়ো, উপদেশ অপেক্ষা চরিত্র বহুমূল্য। এখন যে পুস্তক চাই না, তাহা নহে। পূর্বেও যেমন, এখনো তেমনি পুস্তকের প্রয়োজন। ধর্মগ্রন্থ না হইলে পৃথিবীতে ধর্ম প্রচার হয় না। মূলগ্রন্থ না থাকিলে কোথা হইতে শ্লোকের ব্যাখ্যা হইবে, কি অবলম্বন করিয়া আচার্য বেদী হইতে উপদেশ দিবেন? মূলগ্রন্থ থাকিলে তবে তাহার টীকা হয়, তাহার ব্যাখ্যা হয় এবং সত্য প্রমাণিত ও বিস্তৃত হয়। ভ্রান্তের ভ্রম, অবিশ্বাসীর সংশয় ও পাপীর পাপ মোচনের জন্য গ্রন্থ চাই। নববিধান এক নূতন অভ্রান্ত ঋগ্বেদ পৃথিবীতে আবিষ্কার করিলেন। হে নববিধান, লোকে বলে, তোমার গুরু নাই, গ্রন্থ বেদ নাই, বেদান্ত নাই, ঈশ্বররচিত কোনো ধর্মশাস্ত্র নাই; তবে তুমি কিরূপে লোকসমাজে জ্ঞান বিতরণ করিবে? কী দেখাইয়া জীব উদ্ধার করিবে? হে ভক্তগণ, তোমারা এ প্রশ্নের উত্তর দাও, লোকের আপত্তি ও উপহাস খণ্ডন কর। জীবন্ত দৃষ্টান্ত লোকের চক্ষের সম্মুখে ধারণ করিতে হইবে, জীবনরূপ বেদ বেদান্ত প্রস্তুত করিয়া মানুষের হাতে দিতে হইবে। তোমাদের এক এক জনের জীবন পুস্তকরূপে লোকের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকের জীবন ঋগ্বেদ, আমাদের জীবনই শ্রেষ্ঠ পুরাণ। কেন না আমাদের জীবনে দয়াময় হরি আপন প্রেমের লীলা দেখাইয়াছেন এবং আমাদিগকে তাহার সাক্ষি করিয়াছেন। এ ধর্মে অন্য সাক্ষি নাই, ঈশ্বর আমাদের জীবনকে সাক্ষি নিয়োগ করিয়াছেন। সময় হইয়াছে, হে ভক্তগণ তোমরা আপন আপন জীবনপুস্তক প্রস্তুত করো এবং মুদ্রাঙ্কিত করিয়া সর্বসাধারণের গোচর

করো। পৃথিবী এই সকল কথায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিতেছে, কি নববিধান অভ্রান্ত বেদ আনয়ন করিবে! হিন্দুধর্ম কি ম্লান হইয়াছে? ঋক যজু সাম অথর্ববেদ পুরাণ এই সমুদয়কে অতিক্রম করিয়া শাস্ত্রশূন্য ব্রাহ্মধর্ম জয়ী হইবে? ঋগ্বেদ অপেক্ষা কি নববিধান বড়ো হইবে? দেখ, নববিধানকে সকলে উপহাস করিতেছে।

হে ভক্তগণ, তোমরা ইহার মর্যাদা রক্ষা করো, তোমারা ইহার মুখ উজ্জ্বল করো, ঈশ্বরবাণীর যথার্থতা সপ্রমাণ করো। কোনো পুস্তকের উপরে নির্ভর করিও না। এই নববিধানের জীবনপুস্তকের প্রাধান্য সর্বত্র প্রচার করো। ভক্তজীবন উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মগ্রন্থ হইবে। অদ্য ব্রহ্মমন্দিরে এই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করো, শত শত বৎসর পরে তোমাদিগের জীবন ব্রহ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবেদ বলিয়া গৃহীত ও আদৃত হইবে। যে বিধানের কোনো প্রকার পুস্তক নাই, লোকে তাহাতেও পুস্তক অন্বেষণ করিবে। আমরা পুস্তক মানি না, তথাপি পৃথিবীর লোক আমাদিগের নিকট শাস্ত্র চাহিবে। অতএব, হে ব্রহ্মোপাসকগণ, তোমরা ত্বরায় জীবন গঠন করো। এখন গদ্যে পদ্যে গ্রন্থ রচনা করো, যেন তোমাদিগের জীবন পড়িয়া লোকে জীবন্ত ভগবানের মহিমা দেখিতে পায়। যদি আজ কাল কোথাও ভগবান্ পাপীর একটি প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন, সহস্র লিখিত পুস্তক অপেক্ষা ঐ জীবন্ত ঘটনাটি মানুষের মনকে আকর্ষণ করিবে। প্রাচীনকালে কোথায় ভগবান্ কি লীলা দেখাইয়াছেন, সে পুরাণ লইয়া এখন কি হইবে? এখন নূতন কথা, নূতন ব্যাপারের প্রয়োজন। আঠার শত বৎসর পূর্বে অমুক সাধু অমুক স্থানে অমুক পাহাড়ে ঈশ্বরকর্তৃক দীক্ষিত ও আদিষ্ট হইয়া শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং সত্য প্রচার করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া বিশেষ কি লাভ হইবে? আজ নিজের ঘরে নিজের কর্ণে শুনিতেছি ভগবান্ এই কথা বলিলেন, নিজ চক্ষে দেখিতেছি তিনি এই কর্ম করিলেন। আজ অমুকের ঘরে লক্ষ্মী হইয়া সমুদয় সংসারের কাজ ঈশ্বর আপনি নির্বাহ করিলেন, আপনি অন্ন পরিবেশন করিলেন, আপনি অন্ন দিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিলেন। আজ অমুক ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াছিল, ভগবান্ তাহার সমুদয় ভার নিজ মস্তকে গ্রহণ করিলেন, তাহার সমুদয় বিপদ ভঞ্জন করিয়া শান্তি প্রদান করিলেন। এ সকল নূতন কথা প্রকাশ হওয়া চাই। চক্ষে যাহা দেখা হইল, লোকসমক্ষে বলা চাই। এইরূপে ঈশ্বর প্রমাণিত হইবেন, এইরূপ ব্রাহ্মধর্মের মুখ উজ্জ্বল হইবে।

যদি পুস্তক চাই স্বীকার করিলে, তবে প্রত্যেকে পুস্তক হইতে চেষ্টা করো। আমি বর্ত্তমান শতাব্দীতে পৃথিবীর একটি ধর্ম্মপুস্তক হইব, আমার চরিত্রে ক্ষমা সহিষ্ণুতা বিনয় নিরহংকারের দৃষ্টান্ত দেখাইব, আমার জীবনসম্বন্ধে ভবিষ্যতে কত লোক সুমধুর স্বরে গান করিবে। আমাদিগের জীবনে গদ্যে পদ্যে লিখিত প্রত্যাদেশ দেখাইতে হইবে। আমরা কত দূর নিরহংকারী বিনয়ী হইতে পারি, ঘোর বিপদে নিপতিত হইয়া ব্রহ্মের উপর একান্ত নির্ভর করিতে পারি, ইহার দৃষ্টান্ত জীবনপুস্তকে বিবৃত করিতে হইবে। ব্রহ্মের আদেশ ঘোষণা করিবার জন্য অনেক গ্রন্থ, অনেক পুস্তকের প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ে নানাপুস্তক, নানা পত্রিকা প্রচারের জন্য উদ্যোগ হইতেছে, তৎসংক্রান্ত আমার একটি প্রস্তাব আছে। পুস্তক-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তজীবন প্রচার করিলে একটি বিশেষ অভাব মোচন হইবে। নববিধানের মূলগ্রন্থ নাই, লোকের এই কুসংস্কার আছে, তাহা আর থাকিবে না। লোকে যখন বলিবে, তোমাদিগের বেদ নাই, সর্ব্বাগ্রে জীবনরূপ মূলগ্রন্থ যেন তাহাদিগের হস্তে প্রদত্ত হয়। তোমরা সকলে জীবনের বৃত্তান্ত সকল লিখিয়া সাধারণের এই অভাব মোচন করো। ছোটো ছোটো পুস্তক প্রচার করিতে তোমরা প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনবৃত্তান্ত প্রচারিত হউক। ব্রহ্মধামে যে মুদ্রাযন্ত্র আছে, তাহাতে আপন জীবনগ্রন্থ মুদ্রিত করো। যে কয়খানি হয়, বিশুদ্ধ ভাষায় জীবনগ্রন্থ রচনা করিয়া, ঈশ্বরের যন্ত্রে ছাপাইয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হউক, সকলে জানুক যে, জীবন্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের অভাব নাই। ক্ষমার তত্ত্ব, নীতির তত্ত্ব, উপাসনার তত্ত্ব, যোগের তত্ত্ব, ভক্তির তত্ত্ব, বিশ্বাসের তত্ত্ব, এই সকল তত্ত্বের এক একখানি গ্রন্থ বর্ত্তমান কালের বেদ পুরাণ নামে প্রচারিত হউক। এই সকল পাঠ করিয়া সকলের বিশ্বাস বৃদ্ধি হউক, সকলের পাপ তাপ নিবারণ হউক।

মনুষ্যের জীবনই প্রকৃত ধর্ম্মপুস্তক, এই মত বুঝাইয়া দিয়া সকলের ভ্রান্তি দূর করা হউক। ঈশ্বরনিষ্ঠ জীবন জীবন্ত সত্য প্রকাশ করে, ইহা প্রচার করিয়া সকলে নববিধানকে সাহায্য করুন। জীবনপুস্তকে মানুষের বুদ্ধিরচিত প্রবন্ধ লেখা নাই, কিন্তু কেবল হরির আশ্চর্য্য প্রেমলীলা। উহাতে মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান্ যে সকল অলৌকিক ঘটনা সংঘটন করেন, তৎসমুদয় প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত ও উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে

অবিশ্বাসী বিশ্বাসী হয়, নাস্তিক আস্তিক হয়, অভক্ত প্রেমিক হয়, এবং অসাধু সাধু হয়। এমন গ্রন্থ কি তোমাদের কাহারো নিকটে নাই? অবশ্য আছে। গুপ্ত জীবনরহস্য বাহির করো, লুক্কায়িত বেদ বেদান্ত প্রকাশ করো। ভক্তজীবন-পুস্তকে প্রথমে যে উৎসর্গপত্র আছে, তাহাতে লিখিত আছে, ঐ গ্রন্থ ব্রহ্ম-পাদপদ্মে উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হইল। এমন উপহার, জীবনদান, তিনি কি গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারেন? যে ব্যক্তির জীবনপুস্তকে ভক্তি শ্রদ্ধা বিনয় উৎসাহ যোগ জীবন্তভাবে প্রদীপ্ত রহিয়াছে, যে ব্যক্তির জীবন কেবল ঈশ্বরের প্রেমকীর্তি প্রকাশ করিতেছে, তাহারই জীবন উপহার গ্রহণে পরমেশ্বর সদা উৎসুক। সেই ভক্তজীবন অমূল্য ধন, উহা দ্বারা পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ হয়।

ভক্তেরা যোগীরা আপন আপন জীবনে ঈশ্বরকে দেখিয়া যে সকল কথা বলেন, তাহা সত্যের সাক্ষি এবং এজন্য ব্রহ্মের অত্যন্ত আদরণীয়। এই গ্রন্থ উৎকৃষ্ট লাল কালিতে মুদ্রিত। কালো অক্ষরে ইহা ছাপা হয় না, কিন্তু ভক্তের শোণিতে ঈশ্বরের কথা মুদ্রিত হইয়া থাকে। জীবনের ঘটনা অন্য কালিতে লেখা হইতে পারে না। সামান্য কালিতে সামান্য কাগজে প্রত্যাদেশের কথা অংকিত হইতে পারে না। হৃদয়ের জীবন্ত তেজস্বী রক্ত ভিন্ন তেজস্বী হরিতত্ত্ব লেখা যায় না। ঈশ্বরের নাম ও তাঁহার শাস্ত্র লিখিবার একমাত্র কালি জীবের রক্ত। তোমাদের জীবনের চারি বেদ রক্ত দিয়া লেখ, তবে তো উহা জীবন্ত ও জীবনপ্রদ শাস্ত্র হইবে। নির্মল রক্ত দিয়া যত সুখ সম্পদ, জ্ঞান ধর্ম, আমরা ঈশ্বরের নিকট লাভ করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে হইবে, রক্ত দিয়া সত্য প্রমাণ করিতে হইবে, রক্ত দিয়া ভগবানের মহিমা মহীয়ান্ করিতে হইবে। আপনার রক্ত দিয়া যাহা লিখিবে, লোকের নিকটে তাহাই চিরাদৃত হইবে।

ভক্তরক্তে ঈশ্বর পৃথিবীর পাপ ধৌত করেন। কেবল মুখের কথায় জগতে সত্য সপ্রমাণ হয় না; রসনা সত্যের সাক্ষি হইতে পারে না। যে রক্ত দেয় না, সে কেবল বক্তৃতা করিয়া ধর্মপ্রচার করিতে পারে না। যদি পৃথিবীর উদ্ধারের পথ প্রমুক্ত করিতে চাও, সতেজ রক্তে জীবন্ত ধর্ম কথা লিখিয়া প্রচার করো। জীবনের সমুদয় ঘটনাগ্রন্থ রক্তবর্ণ অক্ষরে লিখিবে। বুদ্ধির কালো কালিতে আপনার মত একটিও লিখিবে না, কেবল ব্রহ্মের শ্রীমুখের বাণী শোণিতাক্ষরে লিখিবে। একটি একটি ঘটনা একটি একটি শ্লোক পাঠ মাত্র শরীর রোমাঞ্চিত হইবে, নূতন জীবনের সঞ্চার হইবে, লেখক এবং পাঠক

উভয়েই কৃতার্থ হইবে। সহস্র গ্রন্থ পাঠ করিলেও ঐ একটি শ্লোকের তুলনা হয় না। ঈশ্বর ভক্তের হস্ত ধারণ করিয়া বর্তমান শতাব্দীতে কবে কি করিয়াছেন, এই সকল পুস্তকে দেখিবামাত্র সকলে বুঝিতে পারিবে। ঈশ্বর কেমন জীবন্ত জলন্ত ভাবে অবিশ্বাস নিবারণ করিতেছেন, ব্রহ্ম কাহার জীবনে কবে কি করিলেন, সমস্ত তাহাতে লেখা আছে। ঈশ্বর বিনা কিছুই হয় না, ইহা সকলে বিলক্ষণ জানিবে। আচার্যেরা ব্রহ্মমন্দিরে এই সকল পুস্তক হইতে ঘটনাশ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিবেন, তচ্ছ্রবণে উপাসকমণ্ডলীর রোমহর্ষণ হইবে।

শুষ্ক নির্জীব বেদ বেদান্ত অপেক্ষা জীবনশাস্ত্র অধিক ফলপ্রদ হইবে। এ সকল আবার হৃদয়রঞ্জন। ইহা সচিত্র সকলে সচিত্র পুস্তক দেখিতে উৎসুক। ভক্তের জীবনে যে কেবল ঘটনা ও প্রেমতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নহে, স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট চিত্র সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। ব্রহ্মের ভূমা আকাশমূর্তি কিরূপ, যদি আঁকিয়া দিতে পারো এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে টীকা ব্যাখ্যান সংযুক্ত করো, তাহা হইলে জগতের নিকটে উহার অত্যন্ত আকর্ষণ হইবে। গৃহলক্ষ্মীর মূর্তি, যোগেশ্বরের মূর্তি, স্বর্গীয় ভক্তগণের মূর্তি, পৃথিবীতে বৃক্ষতলে ভক্ত যোগী নিস্তব্ধ ভাবে ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, এ সকল মূর্তি চিত্রিত করিতে হইবে। দশজন ভক্ত একত্র মিলিত হইয়া ব্রহ্মপূজা করিলেন, এক সময়ে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সকলের নিকট প্রদীপ্ত হইল, ইহার ছবি অংকিত করিতে হইবে। সকলে আপন আপন জীবন-পুস্তক দেখ, উহাতে বিচিত্র চিত্র দেখিয়া মোহিত হইবে।

নববিধানের গ্রন্থ দৃষ্টান্তের গ্রন্থ। উহাতে তত্ত্ব-কথা আছে, আবার ছবির দ্বারা উহা প্রমাণিত। উহাতে জীবন্ত বিধান বর্ণিত ও চিত্রিত, সুতরাং ঈশ্বরের লীলার খুব উজ্জ্বল সচিত্র বর্ণনা দেখিয়া, লোকে সহজে বুঝিবে এবং মুগ্ধ হইবে। ব্রহ্মভক্তগণ তোমরা এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাইয়াছ, সকলের নিকট উহা প্রকাশ করো। তোমরা গোপনে যাহা দেখিয়াছ, যাহা শুনিয়াছ, নির্ভয়ে রাজপথে দাঁড়াইয়া লোকের নিকটে তাহা প্রকাশ করিয়া বলো। উপাসনার ঘরে যাহা দেখিয়াছ, শুনিয়াছ, ছাদের উপরে উঠিয়া তাহা ঘোষণা করো। কুড়ি বৎসর অন্তরে অন্তরে যাহা চাপিয়া রাখিয়াছ, তাহা আর চাপিয়া রাখিবার সময় নাই। নববিধান উদিত হইয়াছেন, এখন আর তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে

পারো না। ব্রহ্ম যাহার সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন, সকল প্রকাশ করিয়া বলো। কে কে পুস্তক লিখিবেন, একেবারে স্থির করিয়া ফেলুন। হরিকথামৃত লিখিয়া, হরির দয়া প্রকাশ করিয়া, গ্রন্থখানি রচনা করিতে হইবে এবং তাহাতে ছবি আঁকিয়া দিয়া, আরো মনোহর করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে। সমুদয় বই প্রকাশ হইলে, সমুদয় ছবি তাহাতে আঁকিয়া দিলে সকলে আদরের সহিত উহা গ্রহণ করিবে।

জীবনবেদ

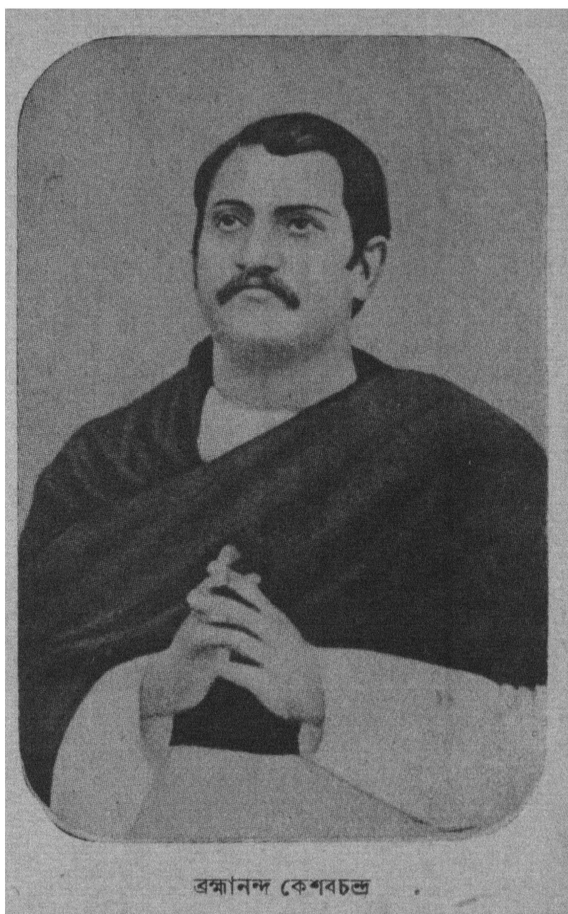
(আচার্যের প্রার্থনা, ২২ জুন, ১৮৮২ খৃঃ, দার্জিলিঙে বিবৃত)

হে প্রাণেশ্বর, হে দয়াময়, শাস্ত্র বলিয়া চারি দিকে খুঁজিয়া বেড়াই, কিন্তু শাস্ত্র আপনি। অনেক বেদ লিখিয়াছ তুমি, হে অনন্ত বেদব্যাস, কিন্তু জীবনবেদ তুমি যেমন লিখিয়াছ, এমন শাস্ত্র আর কৈ? যত পড়ি, তত জ্ঞানী হই; যত বুঝি, তত মোহিত হই। হে গুরু, জীবন-পুস্তকে যে সমুদয় তত্ত্ব পড়াইলে, বুঝাইলে, সে সমুদয় অতি আশ্চর্য তত্ত্ব। দয়াময় এ বই কিন্তু তুমি লিখিয়াছ, তাহাতে ভুল নাই। আমার জীবন পুস্তক তুমিই লিখিয়াছ। পদ্যগুলি কি সুমিষ্ট, কি ভাবে পূর্ণ! গদ্যগুলি কী নীতিপূর্ণ, কি গম্ভীর! পরমেশ্বর, এই এক এক গ্রন্থ তোমার এক এক লীলা! তোমার জ্ঞান, প্রেম, বাৎসল্য, পুণ্য এক এক খণ্ডে প্রকাশ পাইতেছে। তুমি নিজ হস্তে কলম ধরিয়া লিখিতেছ। এ পুস্তকের শিষ্য চাই, পাঠক চাই। গুরু তুমি, লেখক তুমি। পাঠক চাই। যদি এই গ্রন্থ শিষ্য হইয়া পড়ি, কত জ্ঞান, পুণ্য লাভ হয়। দয়াময়, আমিও পড়ি, সকলেও পড়ুন। এই জীবন-গ্রন্থ তুমি দয়া করিয়া বুঝাইয়া দাও। এই নববিধান-গ্রন্থে তোমার ভক্তদের জীবন লিখিয়াছ। এ গ্রন্থ কেন আমরা ভালো করিয়া পড়ি না? যেমন লেখা, তেমনই ভাব, তেমনই ভাষা, তেমনই ভাবার্থ। পরমেশ্বর, জীবন-পুস্তক বড়ো বহুমূল্য। এই বহুমূল্য পুস্তকখানি মানুষ যদি আপনি বুঝিতে যায়, অনর্থ ঘটে। তুমি লিখিয়াছ, তুমিই বুঝাইতে পারো; আর কেহ পারে না। এই সকল ভাবের কথা জীবনে লিখিয়াছ; অনেক অনেক গভীর উচ্চ উচ্চ কথা লিখিয়াছ, পৃথিবী পড়ে না বলিয়া দুঃখ হয়। মা, তুমি বইখানি খুলিয়া পৃথিবীর কাছে দাও। গুপ্ত জীবনের রহস্যগুলি লোককে পড়াও। পৃথিবী পড়ুক, শিখুক। এই সকল

নরনারীর জীবন-গ্রন্থে যে সকল তত্ত্ব লিখিয়াছ, তাহা বহুমূল্য, তাহা সকলের নিকট আদরের হউক। হে প্রেমস্বরূপ, আত্মতত্ত্ব শিখাও। এ পুরাণ ছাড়া নূতন-পুরাণ, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের হাতের লেখা বাইবেল গ্রন্থ। এ কেবল সামান্ত মনুষ্য-জীবন; কিন্তু হরি হে, সামান্ত মনুষ্য-জীবনেই কি লেখা লিখিয়াছ! দয়াময়, জীবন-পুস্তক পাঠ করিলে যে ফল হয়, তাহা ইহ-পরকালে সম্ভোগ করিতে দাও। ইহা ভবিষ্যতে হাজার হাজার লোকে পাঠ করিবে, জ্ঞান পাইবে এবং সেই জ্ঞানে শান্তিরস পাইবে। হরি হে, ইহার অক্ষরগুলি দেবাক্ষর, পদ্মাক্ষর। মা, তোমার সকলই ভালো। এ পাপীর জীবন লিখিলে মুক্তার অক্ষরে? সরস্বতী, কোটি কোটি প্রণাম করি তোমাকে! জীবন-পুস্তক আমার নিকট পূজিত হউক; ভাই বন্ধুদের নিকট আদরের হউক। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্বাদ করো, আমরা যেন এই জীবন-পুস্তকের সমাদর করি, এবং ইহার সত্য সকল সাধন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই। মা, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্বাদ করো। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সূচীপত্র



ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

জীবনবেদ

অনেক দিন হইল, এই বেদী হইতে জীবন-পুস্তকের মহিমা বর্ণন করা হইয়াছে। সকল গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ জীবন। বিশ্বাসীর জীবন, সাধকের জীবন সর্বশ্রেষ্ঠ। সকল বস্তু অপেক্ষা আদরণীয় আপনার জীবন। যদি ব্রহ্মাণ্ডপতি মনুষ্য-জীবনকে বেদ বেদান্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া থাকেন, তবে বিশ্বাসী মাত্রেরই কর্তব্য জীবনের কথা ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বিবৃত করা। সেইজন্য পরম পিতার আদেশে এই বক্তার জীবনের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই লোকেশ, গণেশ, পরেশ, মহেশ যিনি—তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে বার বার প্রণাম করিয়া এই সুমিষ্ট মধুময় কার্যে প্রবৃত্ত হই।

প্রার্থনা

আমার জীবনবেদের প্রথম কথা প্রার্থনা। যখন কেহ সহায়তা করে নাই, যখন কোনো ধর্মসমাজে সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্মগুলি বিচার করিয়া কোনো একটি ধর্ম গ্রহণ করি নাই, সাধু বা সাধক শ্রেণীতে যাই নাই— ধর্মজীবনের সেই উষাকালে 'প্রার্থনা করো, প্রার্থনা করো' এই ভাব, এই শব্দ হৃদয়ের ভিতরে উত্থিত হইল, ধর্ম কী, জানি না ও ধর্মসমাজ কোথায়, কেহ দেখায় নাই; গুরু কে, কেহ বলিয়া দেয় নাই; সংকট বিপদের পথে সঙ্গে লইতে কেহ অগ্রসর হয় নাই— জীবনের সেই সময়ে আলোকের প্রথমাভাস-স্বরূপ 'প্রার্থনা করো, প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই' এই শব্দ উচ্চারিত হইত। কেন, কিসের জন্য প্রার্থনা করিব তাহাও সম্যক্‌রূপে বুঝিতাম না, তর্ক করিবারও সময় হয় নাই। কেন প্রার্থনা করি, জিজ্ঞাসা করিবার লোকও ছিল না। কে প্রার্থনা করিতে বলিল, তাহাও কোনো লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভ্রান্ত হইতে পারি— এ সন্দেহও হইল না। প্রার্থনা করিলাম। ভিত্তিস্থাপনের সময় কে অট্টালিকার সৌন্দর্য চিন্তা করে? কী রঙ দিব বারাণ্ডায়, তাহা কি মানুষ তখন ভাবে? তখন কেবল অটলভাবে ভিত্তিই স্থাপন করিতে হয়।

'প্রার্থনা করো, বাঁচিবে; চরিত্র ভালো হইবে; যাহা-কিছু অভাব, পাইবে'— এই কথাই জীবনের পূর্ব দিক হইতে পশ্চিমে, উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইত। এই ভাবনারই ভাবুক হইয়াছিলাম; এই কর্মেরই কর্মী হইয়াছিলাম। প্রার্থনা গুরু, অসহায় জনের অপার সহায়। এই একজনকেই চিনিয়াছিলাম, একজনের সঙ্গেই আলাপ হইয়াছিল, আর কাহাকেও জানিতাম না। ধর্মবন্ধু কেহ ছিল না। আকাশের দিকে তাকাইতাম, কোনো বিধানের কথা শুনিতাম না, কোনো ধর্মতত্ত্ব বুঝিতাম না। গির্জায় যাইব কি মসজিদে যাইব, দেবালয়ে যাইব কি বৌদ্ধদিগের দলে যোগ দিব— তাহার কিছুই ভাবিতাম না। প্রথমেই বেদ বেদান্ত, কোরান পুরাণ

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা, তাহাই অবলম্বন করিলাম।

আমি বিশ্বাসী ; বিচার করি, আর বিশ্বাস করি। একবার বিশ্বাস করিলে আর টলি না। চক্ষু দ্বারা বিচার করিলাম। হইয়াছে কি ?—বিচারের জন্য এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। 'হইয়াছে— আরো চলো'— এই উত্তর পাইলাম। সকালে একটি, আর রাত্রিতে একটি, লিখিয়া প্রার্থনা সাধন করিতে লাগিলাম। ক্রমে উষা হইতে প্রাতঃকালে আসিলাম। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল। চারি দিক আচ্ছন্ন ছিল অন্ধকারে, পরিষ্কৃত হইয়া পড়িল। পথ-ঘাট, বাড়ি-ঘর, সকল দেখা গেল। এই প্রার্থনা করিতে করিতে সিংহের বল, দুর্জয় বল, অসীম বল লাভ করিতে লাগিলাম। দেখি, আর সে শরীর নাই, সে ভাব নাই। কী কথার বল! কী প্রতিজ্ঞার বল! বলিলেই হয়, প্রতিজ্ঞা করিলেই হয়! পাপকে ঘুষি দেখাইতাম আর প্রার্থনা করিতাম। সন্দেহ, অবিশ্বাস, পাপ, প্রলোভনকে ভয়ানক সংকল্পের মূর্তি দেখাইতাম। প্রার্থনা করিব, বলিলেই সব ভয় পাইত।

যেমন আব্দার করিয়া বসিতাম ঠাকুরের পদতলে, কিছু লইতাম। কিছু পাইতে হইবে, কে দিবে ? কোথায় যাইতে হইবে ? কে পথ দেখাইবে ? পাপকে কে দূরীভূত করিবে ? সকল বিষয়েরই সহায় প্রার্থনা। তখন একমাত্র প্রার্থনা ধনই ছিল ; তাহারই উপর কেবল নির্ভর করিতাম। সুখের প্রত্যাশা করিতাম প্রার্থনার নিকট। সাহায্য পাইতে হইলে প্রার্থনার আশ্রয় লইতাম। 'সবে ধন নীলমণি' যেমন কথায় বলে, প্রার্থনা আমার তেমনই ছিল।

তোমাদের বন্ধু কেবল এই একটি পরম সহায় পাইয়াছিল। কী পুস্তক পড়িতে হইবে, কী আলোচনা করিতে হইবে, কার কাছে যাইতে হইবে— কিছুই জানিতাম না। সে অবস্থায় না ফেলিলে এত বিশ্বাস বোধ হয় প্রার্থনার উপর হইত না। কেহ কিছু বলিলে চক্ষু বন্ধ করিয়া বলিতাম— 'প্রার্থনা! কোথায় রহিলে? বিপদকালে কাছে এসো।' আমি বাংলা ভালো জানিতাম না যে, ভাষাবদ্ধ করিয়া

প্রার্থনা করি। ভাব রাখিতে পারিতাম না। জানালার ধারে বসিয়া চক্ষু খুলিয়া একটি কথা বলিতাম। তাহাতেই আনন্দ ভারি। এক মিনিটে মহামূল্য রত্ন লাভ। রত্ন পাইয়া কাকে দিব, কার কাছে গিয়া বলিব, তখনই এমনই করিয়া সময় গেল। এইজন্যই প্রার্থনাকে এত ভালোবাসি। তোমরা যেমন বন্ধু, প্রার্থনা আমার তদপেক্ষা বন্ধু। যদিও অদৃশ্য, তথাপি তাঁহাকে আমি বন্ধু বলিয়াই জানি। বোধ হয়, এখানকার সকল লোক অপেক্ষা আমি অধিক ঋণে প্রার্থনার কাছে আবদ্ধ আছি; কেননা, এমন সময় ছিল যখন আমার প্রার্থনা ব্যতীত আর কেহই ছিল না।

আমি জানিতাম, প্রার্থনা করিলেই শোনা যায়। আদেশের মতো এইরূপ প্রথম হইতেই হৃদয়ে নিহিত আছে। কী ধর্ম লইব, প্রার্থনা তাহার উত্তর দিতেন। আফিসের কাজ ছাড়িব কি, ধর্ম-প্রচারক হইব কি, প্রার্থনাই তাহা বলিয়া দিতেন। স্ত্রীর সহিত কিরূপ সম্পর্ক রাখিব, প্রার্থনাই তাহা নির্ধারণ করিতেন। টাকার সহিত কী সংস্রব, প্রার্থনাই তাহার ব্যবস্থা করিতেন। আদেশের মতো বড়ো তখন ভাবিতাম না। প্রার্থনা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, দেখিতে চাহিলে দেখা যায়, শুনিতে চাহিলে শোনা যায়— এই জানিতাম। বুদ্ধি এমনই পরিষ্কার হইল প্রার্থনা করিয়া, যেন দশ বৎসর বিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, কঠোর শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিয়া আসিলাম। আমাকে ঈশ্বর বলিতেন — 'তোর বইও নাই, কিছুই নাই, তুই কেবল প্রার্থনাই কর্।' প্রার্থনা করিয়া আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতাম। কই, কাজ ছাড়িব কি না, বলিলে না? উহা কিরূপে হইবে, জানাইয়া দিলে না? কেবল এইরূপ করিতাম। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলাম, সাধক হইলাম, প্রচারক হইলাম, উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলাম— সব হইল। প্রার্থনা মানি বলিয়াই, জীবন যাহা, তাহা। প্রার্থনা মানি বলিয়াই বন্ধুদিগের অবস্থা মন্দ দেখিতেছি।

প্রার্থনা সম্বন্ধে প্রবঞ্চনা আমাদের মণ্ডলী হইতে দূর করা আবশ্যক। যে প্রার্থনা করিয়া আদেশের জন্য অপেক্ষা করে না —সে প্রবঞ্চক। যার উপরে ভিতরে সমান নয়, যে বহুভাষী হয়, মনটা সে সময় ঠিক রাখে না— সে প্রবঞ্চক। প্রার্থনার অবস্থা বড়ো কঠিন অবস্থা। যে বহুভাষার স্রোতে চলিয়া যায়— সে প্রবঞ্চক। সকালে প্রার্থনার সময় কী বলিয়াছে, বৈকালে মনে নাই; রবিবারে কী বলিয়াছে, মঙ্গলবারে জিজ্ঞাসা করিলে আর বলিতে পারে না— সে প্রবঞ্চক। ধন মানের জন্য, সংসারের জন্য, কিংবা চৌদ্দ আনা ধর্ম আর দুই আনা সংসারের জন্য, অথবা সাড়ে পনেরো আনা পারত্রিক সদ্‌গতি আর আধ আনা সংসারের জন্য যে কামনা করে প্রার্থনা সম্বন্ধে সে প্রবঞ্চক। পরীক্ষাতে শিখিয়াছি— একটি পয়সা সংসারের জন্য যে চাহিবে, তার সমস্ত প্রার্থনা বিফল হইবে; এইজন্য প্রার্থনা বিমল রাখিবে। শেষে ইহলোক, পরলোক, সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী হইবে।

এক, দুই, তিন, চার, ঠিক দিয়া তেরিজ কষিয়া যেমন অভ্রান্তরূপে কী হইল বলা যায়— প্রার্থনার সত্যও তেমনি করিয়া বোঝানো যায়। এই আমার ছিল না, আমি পাইয়াছি; আমি এই এখানে ছিলাম না, আসিয়াছি। এইজন্য বার বার বলি বন্ধুদিগকে, যার বাড়িতে রোগ. বিপদ, কি টাকাকড়ির জন্য কষ্ট হইতেছে, তার প্রার্থনার বড়ো ভালো অবস্থা। বিপদের সময় প্রার্থনা খুব হয়। যখন যার অবস্থা পীড়া দেয়, তখন হাসিতে হাসিতে সে যদি বলে— 'আমার কিসের দুঃখ? আমাকে ইহার মধ্যে বৈরাগ্য শিক্ষা দাও; তাহা হইলে যাই বলিবে ভক্ত, অমনি তাহার ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হইবে। পারত্রিক মঙ্গলেরই কামনা করিবে, অথচ হইবে সকলই। যখন গৃহে বিবাদ, মত লইয়া কলহ, ঠাকুরের সন্তানগণ তখন কেবল প্রার্থনাই করিবে। আসিবে প্রার্থনা করিয়া, আর শান্তি স্থাপন হইবে। বন্ধুদিগকে এইজন্য কেবল প্রার্থনা করিতে বলি। বন্ধুরা

করেন না, তাই কষ্ট পান। এই জীবনের প্রথম কথা বর্ণন করিলাম। প্রার্থনা কী বস্তু, তাহা জানিয়া প্রার্থনার আদর করিলাম। সকলেই স্ত্রী-পুত্র অপেক্ষা প্রিয় জানিয়া, ধর্মগ্রন্থ জানিয়া, ধর্ম ও সংসারের সম্বন্ধে সারবস্তু জানিয়া, এই প্রার্থনাকে যেন আদর করেন।

•

[রবিবার, ৮ শ্রাবণ, ১৮০৪ শক ; ২৩ জুলাই ১৮৮২ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত।]

ভক্তমণ্ডলী জিজ্ঞাসা করিলেন, তার পরের কথা কী? প্রথম প্রার্থনা। জীবন-গ্রন্থের দ্বিতীয় কথা কী? ভক্তবৃন্দ শ্রবণ করো। দ্বিতীয় কথাও গুরুতর কথা। এ বিষয়েও আমার সঙ্গে অপরের অনেক অনৈক্য দেখিবে। পাপবোধ আমার অনেক প্রবল; অনেক জীবনে এত প্রবল নয়। পাপ কী, কী করিলে পাপ হয়— এ-সকল বিচার করিয়া আমার পাপবোধ হয় নাই। পাপ-দর্শনে পাপবোধ হইল; পলকের মধ্যে সহজে পাপ বোধ করিলাম। যে অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, সে অবস্থায় আর কেহ গুরু হইয়া পাপ বোধ করাইয়া দেয় নাই; আপনার পাপের প্রবলতম সাক্ষী আপনিই হইলাম। 'আমি পাপী, আমি পাপী,' মন কেবল এইরূপই বলিত। প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে জাগিয়া হৃদয় যদি কোনো কথা বলিত, তাহা আর কিছুই নয়— কেবল বলিত, আমি পাপী। প্রাতঃকালে, পূর্বাহ্ণে, অপরাহ্ণে, অষ্টপ্রহরই— যতক্ষণ জাগ্রত থাকিতাম, ততক্ষণই পাপবোধ। চুরি, ডাকাতি, পরদ্রব্যহরণকে পৃথিবীর অভিধানে পাপ বলে। যিনি তোমাদের নিকট এখন কথা কহিতেছেন, ইঁহার অভিধানে পাপ গ্লানি, পাপ ব্যাধি, পাপ অসুস্থাবস্থা, পাপ দৌর্বল্য, পাপ পাপ করিবার সম্ভাবনা। আমি পাপকে পাপ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকি নাই, পাপের সম্ভাবনাকে ভয়ংকর দেখিয়াছি।

আভিধানিক অর্থ নিজে করি নাই; যখন বিবেকের আলো হৃদয়ে পড়িল— দেখি শতাধিক সহস্রাধিক ছোটো ছোটো বস্তু রহিয়াছে। স্থূল সূক্ষ্ম অনেক বস্তু আছে। জড়তা, দৌর্বল্য, আসক্তি কতই হৃদয়ের ভিতরে। আত্মার মধ্যে সব এমনই প্রচ্ছন্নভাবে ছিল যে, বিবেকের আলো না জ্বলিলে কিছুই দেখা যাইত না। এক-এক দিন যেমন মন্দিরে গ্যাসের আলো ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, বিবেকের আলো তেমনি করিয়া হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। দেখি—

কেবলই পাপ। শরীর যখন আছে, কাম-ক্রোধাদির মূলও আছে। এ কথা বলিতেছি বটে, কিন্তু সে মত মানি না, যে মতে পাপই মানুষের জন্ম নির্দেশ করে। পাপের সম্ভাবনায় জন্ম, ইহা মানি। শারীরিক প্রবৃত্তি যখন আছে, তখন পাপের মূল সেইখানে। আমি পাপ করিতে পারি ; কী করিতে পারি ? মিথ্যা কথা বলিতে পারি ; চুরি করিতে পারি। চুরি করিতে পারি ? সে কিরূপ ? যদি কাহারো ঐশ্বর্য দেখিয়া লইতে ইচ্ছা হইল, কি 'আমার হয়, তাহার না থাকে', এক মিনিটের জন্যও এরূপ ভাব আসিল— তবেই চুরি হইল। মিথ্যা কথা বলিতে পারি, কিরূপ ? যদি কখনো প্রাণের দায়ে পড়ি, নিশ্চয় যদি না হয়, হয়তো মিথ্যা বলিতে পারি। মিথ্যাও যদি না বলিতে পারি, হয়তো এমন কথা বলিতে পারি, যাহা স্পষ্ট মিথ্যা না হোক, শ্রোতার মনে মিথ্যা ভাব উৎপন্ন করিতে পারে। মিথ্যা বলিতে পারি, কিরূপ ? কথায় নয়, মনেতে। তবে কি আমি চোর ? হাতে নয়, হৃদয়েতে।

এইরূপ আমি যাহা আছি, তার চেয়ে যদি আপনাকে বড়ো মনে করি, তবেই অহংকার-পাপ হইল। তুমি লেখাপড়া কম জান, আমি জানি বেশি— এইরূপ মনে হইলেই পাপ। মনের ভিতর আপনাকে যদি অধিক ভালোবাসি, অন্যের প্রতি ভালোবাসা যদি কম হয়, আত্মসুখের প্রতি যদি অধিক দৃষ্টি পড়ে, তবেই স্বার্থপরতার পাপে পাপী হইলাম। ভিতরে এত লম্বা লম্বা, দীর্ঘ দীর্ঘ পাপাকৃতি দেখি, ঠিক যেন নরকের কীট কিলবিল করিতেছে। এখনো জানি, প্রত্যহ এক শত পাপের কম করি না। গণনা যদি করি, এ জীবনে কত পাপ করিয়াছি, এই ৪৪ বৎসরে দশ লক্ষ পাপ করিয়াছি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মনে পাপবোধ এত ভয়ানক যে, ছোটো ছোটো পাপও ধাঁ করিয়া মন ধরিয়া ফেলে। সেই পাপবোধ কষ্ট দেয়। পরের পাপ গণনা করিবার জন্য যেন কেহ আমার মনকে নিযুক্ত করিয়াছে, মন এমনই সাক্ষ্য দিতেছে। সকাল হইতে

অপরাহ্ণ পর্যন্ত কেবলই পাপ গণনা করিতেছে। এই স্বার্থপরতা হইল, তার পর এই অভিমান হইল, তার পর পরদ্রব্যে আসক্তি হইল, তার পর মিথ্যা বলিবার ইচ্ছা হইল, তার পর টাকার প্রতি মত্ততা হইল, তার পর অন্য দশ জনের অপেক্ষা নিজের সুখ-চেষ্টা অধিক হইল— এই গনিতে গনিতে সন্ধ্যা হইল, রজনী হইল। শেষ আর হইল না।

এই পাপ-গণনা বুদ্ধিগত নয়, হৃদয়ের গণনা। ইহাতে জ্বালা হয়। অন্তরে বুদ্ধি কেবল যে বলে এত অহংকার ভালো নয়, এত স্বার্থপরতা অন্যায়— তাহা নয়। যুক্তিবাদীদের কথা আমার কাছে দুর্বল। সরল কথা কী? যেমনই পাপবোধ— অমনি কষ্ট জ্বালা। যেমন মাকড়সার প্রকাণ্ড জালে মাছি কোথাও পড়িলেই মাকড়সা অনুভব করিয়া অমনি ধরে— তেমনই আত্মিক স্নায়ু বলিয়া যদি পদার্থ থাকে, তাহার জালে পাপ পড়িলেই মন অনুভব করিয়া ধরিতে পারে। জীবনের কোথায় কী একটা ভাবনা হইতেছে, কোথায় কী একটা কর্তব্য করা হয় নাই, কী করা উচিত ছিল, অথচ অকৃত আছে, কোথায় ধর্মকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, জীবনের কোন্ স্থানে দুর্বলতা— চৈতন্যশীল মন ধাঁ করিয়া দেখিতে পায়। দেখিয়াই বলে, 'কি রে! অন্ধকারে এই-সব রহিয়াছে? তবে তো ডাকাত হইতে পারি। দশ হাজার টাকা দেখিয়া লোভ? পরদ্রব্যে এত লালসা?' এই পাপের গণনা আরো কতদূর বিস্তৃত করিতে পারি? গঙ্গার মতন, সমুদ্রের মতন, মহাসমুদ্রের মতন। অধিক কী বলিব, এমন পাপ নাই, যাহা করিতে পারি না।

যদি অসাধুতার সম্ভাবনা না যায়, তবেই পাপ রহিল। এইজন্য আমি অন্যকে শীঘ্র সাধু মনে করিতে পারি না। আর এইজন্যই আজ পর্যন্ত আমাকে কেহ পাপী বলিয়া লজ্জিত করিতে পারে নাই; কখনো যে পারিবে তাহার সম্ভাবনাও অল্প। ভিতরে যে পঞ্চাশ হাজার পাপ নিজে গণনা করিল, যে নাম ধরিয়া সেই-সকল পাপ বলিতে পারে—

তাহাকে কিরূপে লজ্জিত করিবে? যে ডাকাতি করিয়া আসিল, তাহাকে একটি পয়সা চুরির দুর্নাম দিলে কী হইবে? ডাকাতকে একটি পয়সা চুরির দোষ দাও; সে বলিবে, 'কি সামান্য পাপের কথা বলিল!' যার পাপবোধ জীবনের সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে পাপ দেখিতেছে, তাহাকে পাপী বলা কঠোর বা তীক্ষ্ণ দুর্বাক্য নয়। আমাকে যদি পাপী বল, তাহা শিক্ষার জন্য হইতে পারে।

বিবেক আমার বড়ো শক্ত। ভয়ানক ইহার কাটিবার শক্তি। তীক্ষ্ণরূপে পাপ বুঝিতে পারে; বুঝিয়াই কাটিতে যায়। এই একটি পাপ হইল, অমনিই বিবেক তাহাকে ধরিল। কাহারো উপর দয়া করিতে গিয়া, একচুল ন্যায়-ধর্ম যদি অতিক্রম করি, দিবসে রজনীতে আর শান্তি পাই না। ন্যায়পরতা ষোলো আনা জাগিয়া বসিয়া আছে। ভৃত্যকে একদিন যদি বেতন দিতে বিলম্ব হয়, অমনিই বিবেক বলে—'ওরে পাপী! অন্যায় ব্যবহার?' যদি বলি, আজ হইল না, কাল দিব, বিবেক বলে— 'তুমি আজ খাইলে কিরূপে? আপনি ধনী হইয়া মুখে অন্ন তুলিতেছ, আর গরিব ভৃত্যকে বেতন দাও নাই? কতদূর অন্যায়!' কলিকাতা ছাড়িয়া বেলঘরিয়া যাই, স্থল ছাড়িয়া নৌকায় বেড়াই, বিবেক কিছুতেই ছাড়ে না। জবাব দিতে হইবে, জবাব দিতে পারি না। ছোটো আদালত হৃদয়ের মধ্যে খোলাই রহিয়াছে।

পাপের জন্য আমি গুরুভারাক্রান্ত। তোমরা বলিতে পার, এত পাপ কর? নববিধানবাদী হইয়াও হৃদয়ের ভিতরে এত পাপ? দেখ, 'এই লোককে তোমরা শ্রদ্ধা কর। ইহা তোমরা দেখ না, জান না। এই তো জ্বালা ও কষ্ট। ধন্য ঈশ্বরকে যে পৃথিবীর মধ্যে এমন সুখীও অল্প দেখিতে পাই। নরকের কীট কিল্‌বিল্‌ করিতেছে, রসনায় পাপ, কানে পাপ, চক্ষে পাপ দেখিতেছি; কিন্তু হইতেছে কী? হইতেছে উপকার। পাপ-বোধ যদি না হইত, এখানে থাকিতাম না, এখানে আসিতে পারিতাম না। আমার জাগ্রত নরক, জাগ্রত স্বর্গের কারণ।

অসুস্থ শরীরে কোথায় কী রোগ, কোথায় কী বেদনা, জ্বালা, সহজে অনুভব হয় না, সহজে ব্যাধি জানা যায় না; কিন্তু সুস্থ শরীরে কোথাও কিছু হইলেই তৎক্ষণাৎ অনুভব হয়। ইহা মঙ্গলেরই চিহ্ন। কেননা, এই অনুভব হইবামাত্রই প্রার্থনা হয়, যোগ করিবার ইচ্ছা হয়। কেবল দশটি যদি পাপের সম্ভাবনা থাকিত, দশটি যদি পাপের কারণ থাকিত, সেইগুলি অতিক্রম করিলেই আমার ন্যায় জগতে সাধু নাই ভাবিতাম। মনে করিতাম, আমি সাধু হইয়াছি। আমার সমস্ত শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু প্রতি মাসে, প্রতি দিনে বিবেক আমার উন্নতির নূতন পথ দেখাইয়া দেয়; কেবলই পাপবোধ উৎপন্ন করিয়া দেয়। শরীরের জ্বালায় কোন লোক যদি কেবল গোলদিঘি হইতে লালদিঘি, লালদিঘি হইতে গোলদিঘিতে ছুটিতে থাকে, তাহাতে তার যে অবস্থা, এ লোকের অবস্থাও সেইরূপ। রোজ রোজ জ্বালায় এইরূপ ছট্‌ফট্ করিতে হয়। একে পাপ, তার উপর আবার অবিশ্বাস। ভগবান কি এখানে? ঈশা কি আছেন? চৈতন্যের মুখ কি দেখিতে পাইব? যাই এ কথা মনে হইল অমনিই কে বলিল— 'ওরে অপরাধি! চৈতন্যের মুখ দেখিবি না? যিনি নাচিতেছেন গৌরাঙ্গ হইয়া, তাঁহাকে দেখিবি না? ঈশা নাই?' দোষীর তাহাতেই কষ্ট হইতে লাগিল। ঈশ্বর ছাড়িলেন না। এ শহর হইতে ও শহর, ও শহর হইতে এ শহর, দেখিতে দেখিতে শান্তিপুরে গিয়া শান্তি-ঘরে শান্ত হইলাম। বলিলাম— জ্বালার শান্তি হইল। রোগী না হইলে কি সুস্থতার মর্যাদা কেহ বুঝিতে পারে? দুঃখী না হইলে ধনলাভের যে কী সুখ, তাহা কি কেহ জানিতে পারে? কী সুখ হয় জ্বালা নিবৃত্ত হইলে, তাহা আমি দেখিলাম।

ঘড়ির কাঁটা বার বার বাজে, আর বার বার কে বলে— 'তোর কিছু হয় নাই, তোর কিছু হয় নাই, কিছুমাত্র হয় নাই।' ঘোড়াকে যেমন চাবুক মারে, তেমনি এই ভিতরের কথা আমাকে চাবুক

মারিতে থাকে। আশ্চর্য এই, আমি কাঁদি আবার হাসি। যত কাঁদি, তত হাসি। খুব কাঁদি, খুব হাসি। ঔষধ খাইলে যদি শরীর সুস্থ হয়, তবে সে ঔষধ কে না খায়? এইজন্যই আমি বন্ধুদিগকে কেবল বলি, ওগো তুমি পাপী, তুমি পাপী, তুমি অলস, তুমি অপরাধী। কিন্তু আমি যেন নামতা পড়িতেছি, কেহই আমার কথা গ্রাহ্য করে না। তোমরা কী জান না যে তোমরা পাপী? আমি বলি, ভয়ানক পাপ; তোমরা বল, পাপ। আমি বলি, মহাপাপ; তোমরা বল, দোষ। আমি বলি, দোষ; তোমরা বল, অযৌক্তিক কার্য। আমি মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি যে পাপের জ্বালা নাই। যার জ্বালা আছে, তার নিষ্কৃতির ভাব হইতে পারে না। সে নিশ্চেষ্ট থাকিবে কিরূপে? তোমাদের মনে হয়, পাপী ছিলাম, পাপী নাই, এখন সাধু হইয়াছি। নববিধানের দিকে দৃষ্টি নাই। যেমন খৃস্টবাদীর কাছে, বুদ্ধবাদীর কাছে, অনেকের কাছে পরিত্রাণ তাহাই হইতেছে। আমি দেখিতেছি, হরিপদে আমার সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ হইল না। ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠ পাপী এই পাতকী, এই বেদীস্থিত ব্যক্তি। অলংকার নয়, পদ্য নয়, যথার্থ কথা। নিজের মন ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। পৃথিবীতে অল্প অপরাধী আছে এমন।

আমার কেবলই পাপ। অন্যের যাহা পাপ, আমার নিকট তাহা পাঁচটা পাপ। অন্যের কাছে যাহা পাপ নয়, আমার কাছে তাহা পাপ। অন্যে বিচারিত হইবে যদ্দারা, আমার বিচার তদ্দারা নয়। এইজন্য বিচারপতির কথা মনে হইলে, আমার সর্বশরীর কাঁপিতে থাকে। যদি কথা একটু মিষ্ট না হয়, অমনিই হৃদয়ের ভিতর বিচারপতি বলেন, তোর কথা কেন মিষ্ট হইল না? কেন সকলকে অমৃত কথা বললি না? যদি কোনো কথা একটু মিষ্টতাশূন্য বলিয়া থাকি, অমনি কষ্ট হইতে থাকে। রাত্রিতে কষ্ট হয়, দুই পাঁচ দশ দিন ধরিয়া কষ্ট হয়। কেবল সত্যবাদী হইবার জন্য তো অনুরুদ্ধ নই, অমৃতভাষী হইবার জন্যও অনুরুদ্ধ। একটু যদি কাহারো উপর

অসন্তোষ দৃষ্টি করিয়া থাকি, অমনিই কষ্ট আরম্ভ হয়। নয়নের উপর একটু তাকাইয়াছি বলিয়াও দোষ? নববিধানবাদীর ইহা ভয়ানক দোষ। নববিধানে যাহারা উচ্চপদধারী, তাহাদিগকে বলি যে তোমরা দোষ খণ্ডন করিয়া লও। তুমি বল, ব্যভিচার পাপ; কিন্তু যদি কেহ স্ত্রীজাতির প্রতি একটু আসক্তি দেখায়, স্ত্রীজাতির নিকট অধিক থাকিতে চায়— আমি বলি, কী ভয়ানক! তুমি বল, চুরি পাপ; আমি বলি, এ তো মুশার সময়ের কথা। তুমি অধিক টাকা-কড়ির বিষয় ভাব? কী ভয়ানক। তুমি এখনো কাজ কর? এ যে ভয়ানক ভাবনা, তুমি এই ভাবিতেছ? ধ্যানের সময় পাঁচ মিনিটের মধ্যেও সময় চুরি করিয়া তুমি ভাবিতেছ— ছেলে কী খাবে? টাকা কিরূপে হবে? ব্যাকুল হইতেছ? কন্যাকার জন্য চিন্তা করিতেছ? পাপের বোধ আমাদিগের মধ্যে খুব বর্ধিত হউক। পাপ অপেক্ষা পুণ্য যে উৎকৃষ্ট বস্তু, ইহা তো জান। পাপের বোধ হইলে দুঃখ হয়, কষ্ট হয়, জ্বালা হয়, তাহা হউক। আমাদিগের মা এমনি দয়াবতী যে তিনি কষ্টের পর সুখ রাখিয়াছেন। হাতে যদি কুইনাইন থাকে, ঔষধ থাকে, জ্বর হয় হউক। পাপের বোধে যদি কষ্ট হয়, তাহাই সুখের কারণ হইবে। তখন কী কষ্ট, যখন যোগেশ্বরকে জানি, যোগানন্দ জানি? দুঃখে আর কী ভয়, যখন সুখ পাইব? এইজন্য হরি বড়ো কি যম বড়ো, এ কথা আমি আর জিজ্ঞাসা করি না। লক্ষ পাপ হাতে, কোটি ঔষধও হাতে। লক্ষ লক্ষ শয়তানকে এখনই নষ্ট করিব। যে মাকে প্রাণ দিয়াছে সে কি পাপকে ভয় করে? শয়তানের বল কই? বন্ধু, যেমন অন্ধকারের কথা বলিলাম, তেমনি আলোকের কথাও বলিলাম। যদি পাপ করিয়া থাক, তোমার প্রাণ ছট্‌ফট্ করুক; যেমনই ছট্‌ফট্ করিবে, অমনিই শান্তিদেবী নিকটে আসিয়া তোমাকে শান্তি দান করিবেন।

[রবিবার, ১৫ শ্রাবণ ১৮০৪ শক; ৩০ জুলাই ১৮১২ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত]

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা

জীবন-ভাগবতের তৃতীয় পরিচ্ছেদ, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা। যদি জিজ্ঞাসা করি, হে আত্মন্! ধর্মজীবনের বাল্যকালে কী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলে? আত্মা উত্তর দেয়— অগ্নিমন্ত্রে। বাল্য-কালাবধি আমি অগ্নিমন্ত্রেরই উপাসক, অগ্নিমন্ত্রেরই পক্ষপাতী। অগ্নির অবস্থাকে পরিত্রাণের অবস্থা জ্ঞান করি। অগ্নিমন্ত্র কী, শীতলতা কী? বুঝিতে হইলে, উত্তাপ বুঝিতে হয়। শৈত্যমন্ত্র জানিতে হইলে, অগ্নিমন্ত্র জানিতে হয়। আমি দেখিয়াছি, অনেক জীবনে শীতলতা থাকে, অগ্নি থাকে না; অনেক জীবনে অগ্নি থাকে, শীতলতা থাকে না। অনেকের শীতল স্বভাব, মনের ভিতরে শান্তি; তাঁহারা কার্যবিহীন, তাঁহাদের কার্যে অত্যন্ত ঠাণ্ডা ভাব। গতি মৃদু, কথা অগ্নিবিহীন, হৃদয়ে তেজ অল্প, চক্ষু কোমল— এই-সকল ব্যাপার দেখিলে, শৈত্যপ্রধান জীবন নির্ধারণ করি। পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছেন, তাঁহারা শীতলতা ব্রত বলিয়া সাধন করেন; তাঁহারা চলেন শীতল ভাবে, কার্য করেন শীতল ভাবে; সাধন যদি শেষ করিতে হয়, শেষ করেন শীতল ভাবে। তাঁহারা শীতল প্রদেশেরই অন্বেষণ করেন; বাস করেন শীতল প্রদেশ লইয়া। তাঁহারা শীতল-যোগ সাধন করিতে চান; শীতল-মুক্তি পাইবার অভিলাষী হন। স্বর্গে গিয়া সেখানেও শীতল স্থানে শীতলভাবে থাকিবার আশা করেন। যদি পৃথিবীতে তাঁহাদের সম্মুখে অগ্নি ও জল স্থাপন করা হয়, তাঁহারা অগ্নি ছাড়িয়া জলে প্রবেশ করেন। স্বর্গীয় অগ্নি ও জল যদি তাঁহাদিগকে দেওয়া হয়, আশা ও ভক্তির সহিত তাঁহারা জলের দিকে দৃষ্টি করেন। কবে সেই জল পাইবেন, কেবল এই আশা করেন।

শীতলতা যদি প্রধান ভাব হয়, তবে তাহা নিস্তেজ করে মানুষের স্বভাবকে; শিথিল করে স্বভাবের বন্ধনকে। তেজ যদি থাকে, তাহা নিস্তেজ হয়; শক্তি শক্তিহীন হয়; বীর্য উদ্যম অবসন্ন হইয়া

পড়ে। জল আসিয়া সমস্ত অগ্নিকে নির্বাণ করে, ভীরুতা আসিয়া সাহসকে গ্রাস করে; সহিষ্ণুতা, ধৈর্য আসিয়া উদ্যম উৎসাহ বলিয়া যা-কিছু উত্তেজক ভাব আছে, এক-এক করিয়া সমুদয়কে নির্বাসিত করে। ধর্ম-ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া শয্যাশায়ী হইবার উদ্যোগ করে তাহারা, যাহারা শীতলতা ভিন্ন আর কিছুই চায় না। নিষ্ক্রিয় উপাসনা ও বিশ্রামের পক্ষপাতী হইয়া শৈত্যপ্রধান জীবন ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইতে থাকে। দুঃখ যে দিকে, সে দিকে তাহারা যাইবে না; যেখানে শান্তি, নির্ভয়, সেইখানে গিয়া লুকাইয়া থাকিবে। এ সমুদয়ের বিপরীত দিকে যা-কিছু দেখিতে পাও, তৎসমুদয় অগ্নি। এই-সকলের বিপরীত ভাব অগ্নিপ্রধান জীবনে দেখিতে পাইবে। এই ব্যক্তির জীবনে, গোড়া হইতে এ পর্যন্ত, এই উৎসাহ উদ্যমের অগ্নি ক্রমাগত জ্বলিতেছে। ইহা যে সাময়িক বীরত্বের ভাবে দেখা দিতেছে, তাহা নয়। কখনো কখনো দেখা যাইতেছে, তা নয়। ধর্মের অভিধানে লেখা আছে, উত্তাপের অর্থই জীবন; উত্তাপের বিপরীত মৃত্যু। শরীর যদি সম্পূর্ণরূপ শীতল হইয়া পড়ে, চিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত করিবেন, মৃত্যু। কিছুমাত্র অগ্নি নাই, একটুও উত্তাপ নাই, দেখিলে বলিবেন, প্রাণ-অগ্নি নির্বাণ হইয়াছে। ধর্মজীবনেও উত্তাপ না থাকিলে মৃত্যু। এইজন্যই বাল্যকাল হইতে আমি অগ্নির পক্ষপাতী; অগ্নিমন্ত্রেই আমার দীক্ষা। একটু ঠাণ্ডা-ভাব দেখিলেই মন তুড়্‌তুড়্ করে।

শরীরে হাত দিলেই ভিতরে জীবন কি মৃত্যু, বুঝা যায়; আত্মাকেও দেখিবা মাত্র তেমনই জীবিত কি মৃত, জানিতে পারা যায়। আমি পাপী কি না বুঝিতে বরং সময় লাগে; কিন্তু জীবন আছে কি না অতি সহজেই জানা যায়। কিসে? উত্তপ্ত কি শীতল দেখিলেই ইহা নির্ধারণ করা যায়। এই কারণেই প্রার্থনা করি, সাধন করি— কিসে আত্মা উত্তাপযুক্ত সতেজ থাকে। অগ্নির ভিতরে জীবন থাকে বলিয়াই অগ্নিকে আমি বরণ করি, আলিঙ্গন

করি ও অত্যন্ত ভালোবাসিয়া থাকি। উত্তাপ দেখিলেই ভরসা হয়, আনন্দ হয়, উৎসাহ হয়। যদি দেখি, অগ্নির তেজ কমিতেছে—বুঝি, এবার এ লোক জলে ঝাঁপ দিয়া মরিবে। যদি দেখি, পাঁচ বৎসরের উৎসাহের পর কেহ ঠাণ্ডা হইতেছে—বুঝিয়া লই, এ লোক এবার পাপ করিতে চলিল, এবার মৃত্যু আসিয়া ইহার ঘাড় ধরিবে। এই-জন্যই উত্তাপবিহীন অবস্থাকে অপবিত্র অবস্থা মনে করিতাম। যে দিন প্রাতঃকালে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত না হইয়া শয্যা হইতে উঠিতাম—মৃত্যু ভাবিতাম। নরক ও শীতল ভাব, আমি একই মনে করিতাম। কি মনের চারি দিকে, কি সামাজিক অবস্থার চারি দিকে—সততই উৎসাহের অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতাম। এক দলের কাছে সেবা করিলাম, আর-একটি দল কবে হইবে; দশটি দল প্রস্তুত করিলাম, আর-দশটি দল কবে প্রস্তুত করিব, ইহারই জন্য ব্যগ্র থাকিতাম। এক বিভাগে কাজ করিলাম, আর-এক বিভাগে কবে কাজ করিব; কতকগুলি লোকের সঙ্গে আলাপ করিলাম, আর কতকগুলি লোকের সঙ্গে কিসে আলাপ করিতে পাইব; কতকগুলি শাস্ত্র সংকলন করিয়া সত্য সংগ্রহ করিলাম, পাছে সেই সত্যগুলি লইয়া থাকিলে সেগুলি পুরাতন হইয়া পড়ে, এইজন্য কিরূপে অপর কতকগুলি পড়িয়া সত্য সংগ্রহ করিব, কেবল এই চেষ্টাই ছিল। ইহাই উত্তাপের অবস্থা।

ক্রমাগত নূতন ভাব লইবার, নূতন পাইবার, নূতন সম্ভোগ করিবার ইচ্ছা হইতেছে। এ লোক ক্রমাগত নূতন দিকেই দৌড়িতেছে। নূতন মাত্রই উত্তাপবিশিষ্ট; পুরাতনের অর্থই শীতল। কত ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্ম দেখিলাম; চাকরি পুরাতন হইল, পাঠ অধ্যয়ন পুরাতন হইল, বড়ো বড়ো যুবার মৃত্যু হইল। কত উৎসাহী পুরুষ ছিলেন, পাপ করিলেন না, নরহত্যা করিলেন না, অবশেষে জলে ডুবিয়া মরিলেন। কত ব্রাহ্ম অনেক দিন বৈরাগ্য সাধন করিলেন, অবশেষে তাঁহাদের জীবন যাই শীতল হইয়া আসিল,

সংসার তাঁহাদের নিকট হইতে সুদ শুদ্ধ আসক্তি আদায় করিল; টাকার লোভে শেষটা মরিতে হইল। অনেক উৎসাহী যুবা দেখিয়াছিলাম, তাঁহারা এ বিভাগে কি ও বিভাগে, এ দলে কি ও দলে এ গ্রামে কি ও গ্রামে, কোথায় যে লুকাইয়া রহিলেন, দেখা যায় না। এক সময়ে কেমন উৎসাহী বীরের ন্যায় ছিলেন; এখন এমন ঠাণ্ডা যে কাছে বসিলেও উত্তাপ বোধ হয় না। এমনই ঠাণ্ডা যে আপনারা কেবল মরিতেছেন, তাহা নয়; তাঁহাদের জীবন হইতে অপরের জীবনে জল প্রবিষ্ট হইতেছে। কত লোকই তাহাতে মরিতেছে। পাছে হস্ত পদ শীতল হয়, পাছে চক্ষু ঠাণ্ডা হয়, পাছে হৃদয় উদ্যমবিহীন হয়, ইহার জন্য আমি সর্বদা সাবধান। একটু ঠাণ্ডা ভাব, পুরাতন ভাব দেখিলাম, মনে হইল, করি কী? কাজকর্ম যে পুরাতন হইতেছে, উপাসনা যে পুরাতন হইতেছে; বলিলাম—'দয়াময়, এ বিপদ হইতে সন্তানকে বাঁচাও।' এই বলিয়া মাত্র হোমের আয়োজন করিলাম, ঘি ঢালিতে লাগিলাম। ঈশ্বর যিনি অগ্নিস্বরূপ, তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে দেখি, সমুদ্র, নদীর উপরে আগুন ভাসিতেছে; পর্বতে আগুন জ্বলিতেছে; জীব-শরীরে পর্যন্ত আগুন রহিয়াছে। নব নব সত্য অমনিই এদিক হইতে, ওদিক হইতে প্রকাশিত হইল।

যদি মিথ্যা কথা কহি, তাহা হইলেই কি পাপী? তা নয়। যদি উপাসনাতে ঠাণ্ডা ভাব হয়, যদি আমার কথায় শ্রোতারা ভীরু হয়, উৎসাহহীন হয়, তাহা হইলেও আমি ঘোর পাপী। কেননা, পৃথিবীতে ঠাণ্ডা বিষ ঢালিতে আমি আসি নাই। অত্যন্ত নিশ্চিন্ত নিশ্চেষ্ট যদি হই, কেবল আমার সর্বনাশ হইবে না, আর দশ জনেরও সর্বনাশ হইবে। সর্বদা উত্তাপ না থাকিলে সর্বনাশ হইতে পারে, এইজন্য আশাগুলিকে সতেজ করিয়া, বিশ্বাসকে সতেজ করিয়া, সতেজ উদ্যম লইয়া থাকিব। যখনই মনে হইবে, শীতল ভাব আসিতেছে, বুঝিব—কাম, ধূর্ত ব্যবহার, কপটতা সব সঙ্গে সঙ্গে

আসিতেছে। মনে করিব, পাপের শয্যায় শয়ন করিয়াছি। উপাসনার ঘরে গিয়া যদি দেখি, কেবল জল, বুঝিব— অন্ধকার উপাসনা মারিবে। ধ্যান করিতে ইচ্ছা নাই; শব্দ এক-একটি বলিতেছি, মনের ভিতর দেখিতেছি, তেজের সহিত বলিতেছি না; —বুঝিব, উত্তাপ নাই, মৃত্যুর ব্যাপার। কার্যালয়ে বসিয়া কার্য করিতেছি, অথচ উত্তাপ নাই— বুঝিতে হইবে, প্রভুর কার্য করিতেছি না, মরণের কার্য করিতেছি। সেইজন্যই আমি প্রথম হইতে অগ্নিমন্ত্রের আদর করিতেছি। বিশ্বাসী দলের মধ্যে শান্তভাব আছে, জানি; কিন্তু দোষ হউক, আর গুণ হউক, আমি চিরদিনই উত্তাপপ্রিয়। নিষ্ক্রিয় হওয়া আমার পক্ষে সহজ নহে; দল ছাড়িয়া এক স্থানে লুকাইয়া থাকা এক প্রকার অসম্ভব। অগ্নিতে মস্তক হইতে পা পর্যন্ত পূর্ণ করিয়াছি। এই ভাব লইয়া সেবা করিলাম, পরিশ্রম করিলাম, ধ্যান, সাধন করিলাম, নির্জনে ব্রহ্মদর্শন কেমন, তাহাও অনুভব করিলাম, সমুদয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলাম; কিন্তু শীতলতার কূপে পড়িয়া প্রাণ হারাইলাম না। এই সৌভাগ্য মনে মনে বোধ করিতেছি।

শীতল যাহারা, তাহারা ভীরু হয়; পাঁচ দশ বৎসর সাধন করিয়া পলায়ন করে। শীতলতা এমনই যে, অগ্নিকে একেবারে নিবাইয়া ফেলে। গরম, কি নরম? দেখিবে, ক্রিয়া আছে কি না? উদ্যম আছে কি না? যদি দেখ, আর বড়ো চেষ্টা করিতে ইচ্ছা হয় না, আর কার্য করিতে কোনো আমোদ হয় না, আর দশ জনে মিলিয়া সংকীর্তন করিতে উৎসাহ হয় না, অমনিই চিকিৎসক ডাকো, তোমরা মরিতে বসিয়াছ। তোমরা ব্রহ্মভক্তগণ, তোমাদের ধ্যানে উদ্যম উৎসাহ থাকিবে না? ধর্মকার্যে উত্তাপ থাকিবে না? কখনোই ইহা হইবে না। নিরাশার ঠাণ্ডা কথা তোমরা মুখে আনিয়ো না। হাত পা যেমন গরম থাকিলে শরীরে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তেমনই কার্য, চিন্তা, আশা, বিশ্বাস, কথা, ব্রত এ সমুদয়ে উত্তাপ

থাকিলে ধর্মজীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। তোমার অঙ্গুলিতে এমনই উত্তাপ থাকিবে যে, স্পর্শমাত্র তোমার অঙ্গুলি হইতে আমার অঙ্গুলিতে তাপ সঞ্চালিত হইয়া আসিবে। আশী বৎসরের বৃদ্ধের এমনই তেজ যে রসনা হইতে কথা বাহির হইতেছে, অমনিই লক্ষ লক্ষ লোক উত্তেজিত হইতেছে। কাছে আসিলেই লোক বলিবে, আশী বৎসর বয়স হইল, উৎসাহ এখনো কমিল না! এইরূপ তেজ, উৎসাহ, উত্তাপ, অগ্নি প্রত্যেকের রাখিতে হইবে। উৎসাহদাতা, প্রাণদাতা যিনি, তাঁহাকেই ডাকি, উৎসাহের সহিত অগ্নিস্বরূপকে ডাকি। অগ্নি, অগ্নি, অগ্নি, রসনা ইহাই কেবল উচ্চারণ করুক, হৃদয় সর্বদা এই মন্ত্র সাধন করুক।

হে দয়াসিন্ধু! হে অগ্নিস্বরূপ ব্রহ্ম! এই পৃথিবীতে সংসার অনেক কূপ নির্মাণ করিয়া বসিয়া আছে। সুযোগ পাইলেই মানুষকে ধরিয়া নিক্ষেপ করে, বিনাশ করে। জননি! যতক্ষণ উত্তাপ থাকে আত্মাতে, ততক্ষণ আমরা তোমার। সংসার যদি কূপের জলে ফেলিয়া দেয়, আর উত্তাপ থাকে না, আর ধর্ম সাধন করিতে পারি না, শৈত্য আসিয়া নষ্ট করিতে থাকে। হে প্রেমময়! আরো বাক্যে, কার্যে, চিন্তায় তেজ দাও, যেন অকালে শীতলতারূপ মৃত্যুগ্রাসে না পড়ি। এই পরম সৌভাগ্য যে, মা বলিয়া এখনো ডাকিতেছি; এখনো দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। সেই বাল্যকালে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি বলিয়া, রোগ, সন্তাপ, বিপদ, আপদের মধ্যে তোমার পবিত্র চরণ পূজা করিতেছি; এখনো বন্ধু-বান্ধব লইয়া নাচিতেছি, তোমার নামের গীত গান করিতেছি। কত লোক আসিয়াছিলেন, কত ভাব দেখাইয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই পলায়ন করিলেন। অগ্নিমন্ত্রে যদি আমাকে দীক্ষিত না করিতে, তোমাকে পুরাতন বলিতাম, নববিধান বলিতাম না। তুমি উৎসাহ দিয়া বাঁচাইলে। দেখিলে যখন সব পুরাতন হইয়া আসিতেছে, তখন প্রকাণ্ড নববিধানকে পাঠাইয়া দিলে। নির্বাণপ্রায় হইতেছিল

যখন সমস্ত দীপালোক, তখন প্রকাণ্ড গ্যাসের আলো জ্বালিলে। ধন্য, ধন্য তুমি, বলিয়া উঠিল সমস্ত সাধকগণ। তাহারা আরো একশত বৎসর অধিক আয়ু লাভ করিল, সমস্ত নিরাশা, ভয় চলিয়া গেল। একটা বাদ্যের পরিবর্তে একশত বাদ্য স্থাপন করিয়া, বিধানের শ্রীহরি, তোমার নাম গান করিতে লাগিলাম। এই দেশের পথ-ঘাট শান্ত হইয়া আসিতেছিল, যুবকসম্প্রদায় নিস্তেজ," নিরুদ্যম ও নিস্তব্ধ হইয়া পড়িতেছিল, কত ব্রাহ্ম ভ্রাতা, ব্রাহ্মিকা ভগ্নী উৎসাহহারা হইয়া ধর্মের পথ ছাড়িয়া সংসারে ঢুকিতেছিলেন; হে করুণাসিন্ধু উৎসাহদাতা! তোমার ধর্মকে রক্ষা করিবার মানস করিয়া, সকল দুরবস্থার মধ্যে তুমি পথ-ঘাট সমস্ত অগ্নিময় করিয়া দিলে। নিস্তব্ধ রসনাকে এমনই উত্তেজিত করিলে যে, সেই অবসন্ন রসনা আগুনের মতো কথা কহিতে লাগিল। বৃক্ষলতায় আবার তোমায় দেখিলাম, সংসারে আবার তোমায় দেখিলাম, জলের মধ্যে পুনরায় তোমাকে দর্শন করিলাম, আর আগুনের ভিতর তো কথাই নাই। গেলাম, গেলাম করিয়া আবার বাঁচিলাম। পুরাতন হইতে তুমি দিলে না। নবীন উদ্যম উত্তাপ পাইয়া রহিয়া গেলাম। পাপ না করিলেও মরিতাম; নিতান্ত মিথ্যাবাদী শঠ না হইলেও, কেবল সংসারের হাতে পড়িয়া মরিতাম। আজও সেখানে নগরকীর্তন হইতেছে, কী প্রমত্ত বৈরাগীদের মত্ততাই দেখিতেছি! ধন্য, ধন্য তুমি! এমনই চির-নবীন ধর্ম দিয়াছ যে, কাহারো উৎসাহ আর কমিতে চায় না। আর যে কেহ কোনো কালে ইহা লইয়া বলহীন, উৎসাহহীন হইয়া মরিতে পারে, এ কথা বিশ্বাস করি না। নববিধানে মরণ তো নাই। আমার গুণে নয়, ভাইদের গুণে নয়, তোমার গুণে। উৎসাহ আর কমিবে না; এমন নৃত্য করিব যে, আর থামিবে না। যে মা বলিয়া ডাকিতেছি, এ মা বলা আর শেষ হইবে না। শরীর পুড়িয়া যায় শ্মশানে, আগুন নিবিয়া যায়, মনের আগুন তো কোনো মতেই নিবিবে না। যদি

ব্রহ্মাগ্নিতে কেহ শরীর-মন পূর্ণ করিতে পারে— দেখিবে, এ অগ্নি নিবিবার নয়। কী অগ্নিই জ্বালিলে! ভক্তির আগুন, বিশ্বাসের আগুন, প্রেমের আগুন জ্বালিয়াছ। এ আগুনে তো কেউ মরিবে না। এই অগ্নি লইয়াই থাকি, এই সুখেই জীবন কাটাই, আশীর্বাদ করো। অক্ষয় ব্রত দাও, অক্ষয় উৎসাহ দাও, যাহা কোনোক্রমেই নির্বাণ না হয়। অগ্নির ভাবে উৎসাহিত করো, সেই ভাবে নৃত্য করি যেন। যে নৃত্য থামে না, সেই নৃত্যে নাচাও। যে অগ্নি নির্বাণ হয় না, সেই অগ্নি জ্বালো। তোমার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি— দয়াময়, আমাদিগকে এই ভিক্ষা দাও।

[রবিবার, ২২ শ্রাবণ, ১৮০৪ শক : ৬ অগস্ট, ১৮৮২ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত]

অরণ্যবাস ও বৈরাগ্য

সংসারে প্রবেশ করিবার কাল আমার পক্ষে শ্মশানে প্রবেশ করিবার সময়। ঈশ্বর স্থির করিয়াছিলেন, সুখ উদ্যানের পথ আমার পক্ষে মৃত্যু, তাহাই ঘটিল। যিনি আমার চরিত্রচ্ছবি আঁকিলেন, সেই স্বর্গীয় সুনিপুণ চিত্রকর প্রথমত ঘোর কালো রঙ দিয়া চারি দিক ঘোরতর কালো করিলেন, খুব কালো রঙ হইল, তাহার উপর নানা প্রকার উজ্জ্বল বর্ণের ছবি আঁকিতে লাগিলেন; আজও সেইরূপে আঁকিতেছেন। কালো ভূমির উপর ছবির শোভা প্রকাশ পাইয়া আরো উজ্জ্বল হইয়াছে। শোক, সন্তাপ, বৈরাগ্যে আমার ধর্মজীবন আরম্ভ হইল। বিধাতা জানেন, প্রথম হইতেই বৈরাগ্যের মেঘ দেখা দিয়াছিল। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে অল্প অল্প ধর্মজীবনের সঞ্চার হয়, কিন্তু চতুর্দশ বৎসরেই মৎস্য-ভক্ষণ পরিত্যাগ করিলাম। কে মতি দিল? কে বলিল, আমিষ-ভক্ষণ নিষিদ্ধ? এক গুরু জানিতাম, তাহাকেই মানিতাম; তাঁহাকে বিবেক বলিতাম। সেই বিবেক একটি বাণী বালককে বলিলেন, বালক পরিত্যাগ করিল। চতুর্দশ বৎসরেই বৈরাগ্যের প্রথম সঞ্চার হইল। যখন ধর্মভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল, উপাসনা আরম্ভ হইল, ঈশ্বরের পদতলে আশ্রয় পাইলাম, ধর্মোত্তাপ উদ্দীপ্ত হইয়া আসিল, প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, তখন পূর্বকার মেঘ, যাহা অঙ্গুলির মতো জীবনাকাশে দেখা দিয়াছিল, যাহা কেবল মৎস্য-বর্জনেই পরিব্যাপ্ত ও পরিসমাপ্ত ছিল, সেই মেঘ ঘনীভূত হইল। এত ঘনীভূত হইল যে, মুখ মলিন হইয়া পড়িল, হৃদয় বিষাদপূর্ণ হইল; এমনই হইল যে, দিবসে শান্তি পাওয়া যায় না, রাত্রিতে শয্যাও শান্তিকর হয় না।

যত প্রকার সুখভোগ যৌবনে হয় তৎসমুদয় বিষবৎ ত্যাগ

করিলাম। আমোদকে বলিলাম— 'তুই শয়তান, তুই পাপ।' বিলাসকে বলিলাম— 'তুই নরক; যে তোর আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই মৃত্যুগ্রাসে পড়ে।' শরীরকে বলিলাম— 'তুই নরকের পথ, তোকে আমি শাসন করিব, তুই মৃত্যুমুখে ফেলিবি।' তখন ধর্ম জানিতাম না— জানিতাম সংসারী হওয়া পাপ, স্ত্রৈণ হওয়া পাপ। পৃথিবীতে যাহারা মরিয়াছে, তাহাদের বিষয় মনে হইল। সংসারের বিলাসেই অনেক লোক মরিয়াছে। ভিতর হইতে তাই শব্দ হইল— 'ওরে তুই সংসারী হোস্ না, সংসারের নিকট মাথা বিক্রয় করিস না; কলঙ্ক, পাপ এ সকল ভারি কথা, আপাতত আমোদ ছাড়; আমোদের সূত্র ধরিয়াই অনেকে নরকে যায়।' সংসারের কথা মনে হইত, ভাবিতাম— যেন নরকের দূত আসিল। সংসারের রূপকে ভীষণ দেখিতাম; স্ত্রী বলিয়া যে পদার্থ, তাহাকে ভয় হইত। সংসারকে ঠিক বিষপাত্র বোধ হইত। বাহিরে দেখিতে সুন্দর, ভিতরে ভয়ানক। সর্বদা ভয় হইত, আশঙ্কা হইত; যেখানে পা পড়িবে, সেইখানেই কাঁটা আছে, দানব আছে, ভয়ানক জ্বররোগ লুক্কায়িত আছে— এই মনে হইত। সহাস্য বদন বিমর্ষ হইল। মন বলিল— 'তুমি যদি হাস, পাপী হইবে; হাসিলে পাপ হইবে।' হাস্য আমার নিকট হইতে বিদায় লইল। বন্ধুরা কেহ কেহ দেখিলেন, বুঝিতে পারিলেন না। যাহাতে হাস্য হয়, তাহা চাহিব না; যে পুস্তক পড়িলে, কি যে বন্ধুর কাছে গেলে, হাস্যের উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা, সে পুস্তক, সে বন্ধু হইতে দূরে থাকিব— হৃদয়ের এই সংকল্প হইল।

ক্রমে মৌনী হইলাম, অল্পভাষী হইলাম। সুখ সম্পদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতাম না। বন ছিল না, বনে গেলাম না। গৈরিক বস্ত্রের ভাব ছিল না, তাহাও পরিলাম না। কোনো প্রকারে শরীরকে কষ্ট দিতে অস্বাভাবিক উপায়ও অবলম্বন করিলাম না; করিবার ইচ্ছাও হয় নাই। কোনো প্রকার বাহ্য লক্ষণের কথা

মনেও হয় নাই। যে বাড়িতে ছিলাম সেই বাড়িকে, যে ঘরে ছিলাম সেই ঘরকে শ্মশানের মতো, বনের মতো করিলাম। বাড়ির লোকদিগের কোলাহলকেই মনে করিলাম যেন বাঘ ডাকিতেছে। যেখানে মন্দ আচার ব্যবহার দেখিতাম, মনে করিতাম, সেইখানেই মৃত্যু লম্ফ ঝম্ফ করিতেছে। আমার বন— সত্য বন ছিল না বটে, কিন্তু সংসারই আমার বন হইল। সংসারের টাকাকড়ির মধ্যে থাকিয়াও আমি সামান্য বস্ত্র পরিয়াই সময় কাটাইতাম। কাঁদিতাম না, কিন্তু হাস্যবিহীন মুখে অবস্থান করিতাম। এই ভাবে সকালে শয্যা হইতে উঠিতাম, এই ভাবে রাত্রিতে শয্যায় গমন করিতাম। সূর্য হাসাইতে পারিত না, চন্দ্রও হাসাইতে পারিত না। তখনকার প্রধান বন্ধু কে জান? ইংরাজ কবিদিগের মধ্যে যিনি এই ভাব ভালো চিত্র করিতে পারিতেন— তিনি। তাঁহারই 'রাত্রিচিন্তা' পাঠ করিতাম। কোনো আমোদ যদি তখন পাইয়া থাকি তাহা সেই পুস্তক পড়িয়াই পাইয়াছি।

যাহাতে কষ্ট হয়, গাম্ভীর্য বৃদ্ধি হয়, কুচিন্তার দিকে মন না যায়— এমন-সকল বিষয়েই নিযুক্ত হইতাম। এই-সকল হইল কখন? আঠার, উনিশ, কুড়ি বৎসরে। যখন বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিব, সংসারের বাড়ি যেখানে করিব, দেখি, এই জায়গাই তো শ্মশান। সংসারের বিষয় বিশেষ বুঝিতাম না, কিন্তু সংসারের ভয় জানিতাম। স্ত্রী আসিতেছেন, সংসার আরম্ভ করিতে হইবে। 'সংসার-বিলাসে তুমি সুখ লাভ করিবে? স্ত্রীর কাছে তুমি বসিয়া থাকিবে? সংসারের কথা লইয়া তুমি আলাপ করিবে? এ-সকল বিষয় তোমাকে সুখী করিবে?' ঠিক আমার মনের ভিতর এই সকল কথা কে বলিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম, উচ্চ পদার্থ জীবাত্মা, একে আমি স্ত্রীর অধীন করিব? সংসারের অধীন করিব? প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ জীবনে স্ত্রৈণ হইব না; কেননা, স্ত্রীর অধীন হইয়াই অনেককে মরিতে দেখিয়াছি। সংসারের

বজ্রাঘাতে অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। তাই সংসারকে বলি—এ লোককে স্পর্শ করিয়ো না। তাই সেই দিন অবধি ভয়ে ভয়ে সংসার করি। কবে সংসারের আসক্তিতে মৃত্যুগ্রাসে পড়িব, কবে টাকা ছুঁয়ে মরিব, এ ভয় বড়ো করি। যেমন কাম ক্রোধকে ভয়ানক বোধ করি, তেমনই স্ত্রী পুত্র সংসারকেও বিপদ জ্ঞান করি। পাছে ঈশ্বর অপেক্ষা এই-সকলকে ভালোবাসি, পাছে সংসারকে অধিক প্রিয় বোধ করি, এই আশঙ্কায় সংসারকে ভীষণ দৈত্য মনে হইত। পাছে ভক্তি না হয়, এই ভয়ে অমাবস্যা ভালোবাসিতাম। বাগানে গিয়া আমোদ করিবার ইচ্ছা হইত না, হৃদয়ে স্ফূর্তি পাইতাম না, অন্ধকার স্থানে চুপ করিয়া জড়ের মতন থাকিতাম। কেবল দুই-একটি মনের কথা ঈশ্বরকে জানাইতাম। আর কাহাকেই বা জানাইব? এইরূপে জীবনের মূলে বৈরাগ্য হইল। জীবন-বৃক্ষের আকার প্রকার সকলই বৈরাগ্য দ্বারা হইল। বৈরাগ্যমূলক জীবনে যাহা হওয়া আবশ্যক, তাহাই হইল। দেবাসুরের যুদ্ধে দেবের জয় হইল। বিবেক ও বৈরাগ্য দুই ভাই মিলিয়া পাপ জীবনকে শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরে দেখি, সংসার কাছে আসিতে পারিল না।

আত্মপীড়ন ও ভার্যাপীড়নের দ্বারা ধর্মজীবন আরম্ভ হইল। অবশেষে যাহারা ভয়ের কারণ ছিল, তাহারাই বন্ধু হইল; যে শ্মশানে বাড়ি আরম্ভ করা হইয়াছিল, সেই শ্মশান ফলফুল শোভিত উদ্যানে পরিণত হইল। মধ্যস্থলে হরির পথ হইল। শ্মশান যে কোনো কালে ছিল এমন আর বোধ হয় না। আরম্ভ দুঃখে, সুখ শেষে। যাঁহারা হাসিতে হাসিতে ধর্মজীবন আরম্ভ করেন, যাঁহারা আরম্ভ হইতে সৌভাগ্যশালী, তাঁহাদের দলে আমাকে শ্রেণীভুক্ত করিতে পারি না। মাথার উপর দিয়া আমার কত বিপদই গিয়াছে। শব করিয়া না ফেলিলে দেবত্ব পাইবে না, এই বিধি ঈশ্বর আমার উপর খাটাইয়াছেন। কাঁদিতে কাঁদিতে আমি

শস্য বপন করিয়াছিলাম, এখন হাসিতে হাসিতে শস্য সঞ্চয় করিতেছি। প্রথম কত কাঁপিয়াছি, এখন হরির শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া হাসিতেছি। এ বিধি সকলের বিধি হইতে পারে না। যাঁর পক্ষে যাহা বিধি, তাঁহাকে তদনুসারে চলিতে হইবে। কিন্তু এ জীবনের একটি কথা সকলের পক্ষেই খাটিতে পারে। যদি কোনো সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, যদি কোনো কীর্তি রাখিতে হয়, যদি মহদ্‌ব্যাপার প্রসব করিতে হয়, তাহা হইলে এই গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করিতেই হইবে। কেহ কোনো কীর্তি রাখিতে চাও, কেহ প্রচারক হইবে মনে কর, কেহ ব্রত লইয়া লোকের মঙ্গল করিবে, এরূপ যদি মনে করিয়া থাক, কিছুদিনের জন্য একবার বনে যাইতেই হইবে। দ্বিজ হইতে যদি চাও, একবার দণ্ডধারী হইয়া অন্তত কয়েক পদ ঘুরিয়া আসিতেই হইবে।—এই যে উপনয়ন-সংস্কারের ব্যবস্থা হিন্দুরা করিয়া রাখিয়াছেন, ইহার উপকার আমাদিগকে লইতে হইবে। যদি দ্বিজ হইবার বাসনা কর, ঈশ্বরের হাতে যদি আপনাকে দেখিতে চাও, অন্তরের ভিতর যে জন্তু আছে, তাহাকে মারিতে হইবে, কু-প্রবৃত্তি সকলকে তাড়াইতে হইবে। কিছুদিন শোকের অশ্রু পড়িবে, মড় মড় করিয়া তোমার হৃদয়ের হাড় ভাঙিবে, অবশেষে চমৎকার ভাগবতী তনু লাভ হইবে। বাঁচিতে যদি প্রয়াস কর, একবার মরো। ঈশার ন্যায়, বুদ্ধের ন্যায়, শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে গিয়া ফিরিয়া আইস।

যদি কেবল সামান্য কার্য করিতে চাও, তাহা হইলে তদনুযায়ী হিন্দুর মতন, মুসলমানের মতন, খৃস্টবাদীর মতন কয়েকদিন বৈরাগ্য সাধন করো। কষ্ট সহ্য না করিয়া, বৈরাগ্য সাধন না করিয়া সংসারে যাইয়ো না। গিয়াছ কি সংসারে? যদি গিয়া থাক, দ্বিতীয় বার সংসার করিবার সময় বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়ো। ইহলোকে যদি না কর, পরলোকে করিতে হইবে। একবার না কাঁদিলে যথার্থ হাসি হইতে পারে না। অমাবস্যার অন্ধকারে না পড়িলে পূর্ণিমার

আলোক ও শোভা বুঝিবে না। ধন্য দয়াময়! এ জীবন-উদ্যানে এখন ভক্তির আনন্দ-ফুল ফুটিয়াছে। এ জীবনে দুঃখ কষ্ট হইতে বুঝিয়াছি— শোকে মুহ্যমান হওয়া উচিত নয়। 'সুখ আসিতেছে', এই সংবাদের দূত হইয়া বিষাদ সমাগত হয়। সুখ হইবে বলিয়া বৈরাগ্য স্বাভাবিক। মর্কট বৈরাগ্য আমি চাই না; যে বৈরাগ্য চেষ্টা করিয়া করিতে হয়, আমি তাহার প্রয়াসী নই। আমি শরীরে ভস্ম লেপন করিয়া বৈরাগ্য সাধন করি নাই; সহজে যাহা ইচ্ছা হইল, তাহাই করিয়াছিলাম। সহজ স্বাভাবিক বৈরাগ্যই আমি অবলম্বন করি। সেই বৈরাগ্য হইতেই আমার মঙ্গল হয়। কালো রঙের মেঘোদয় হইলেই জানা যায়— বৃষ্টি বর্ষণ হইবে। জীবনে বৈরাগ্যের মেঘ দেখা দিলেই এই বিজ্ঞানসংগত সত্যের পরিচয় পাই— হয় একটি নববিধান আসিবে, হয় একটি নবতত্ত্ব প্রকাশিত হইবে; না হয় একটি নব সাধন-প্রণালী আবিষ্কৃত হইবে। যখন এইরূপ হয়, তখনই বৈরাগ্যের ভাব হৃদয়কে অগ্রে অধিকার করে। এই যে প্রসববেদনা হয়, ইহা হইতে বুঝিতে হইবে— একটি সুসন্তান হইবেই হইবে।

আদেশ হইল— নিজে রন্ধন করো, কি বিনামা পরিত্যাগ করো, অথবা দুই দিনের জন্য কোনো বিশেষ স্থানে বাস করো, এ-সকল শরীর দগ্ধ করিবার জন্য নয়। শরীর দগ্ধ করিলে উপকার কী? প্রকৃত বৈরাগ্য কী? যেখানে বৃষ্টি নাই, সেখানে বৈরাগ্যের মেঘও নাই। লোক দেখাইবার জন্য যে বৈরাগ্য তাহা পরিত্যাগ করো! ভিতরে বৈরাগ্য রাখিয়া বাহিরে সমস্ত বজায় রাখিলে, সভ্যেরা যদি বলেন, ইহাতে কপটতা হইল, জন্মসন্ন্যাসী যাহারা আমার ন্যায়, তাহারা ইহাতে প্রশ্রয় দেয়। ঈশ্বরাদেশে ধর্ম-প্রচারার্থ ভদ্রতার অনুরোধে আমি ভদ্র লোকদিগের মধ্যে আছি। মন বৈরাগীদের সঙ্গে এক গোত্রের হইয়া গিয়াছে। সেই বংশের পিতা পিতামহ আম পাইয়াছি। আমাদের মধ্যে যে বৈরাগ্য সে কষ্টের জন্য নয়,

তাহা আপনা আপনি হইয়া যাইতেছে। যেটুকু ভদ্র ভাব, বাহ্য শোভা রহিয়াছে, এইটুকুই ভদ্রতার অনুরোধে, ব্রতের অনুরোধে রক্ষিত হইয়াছে। নব বিধানের আদেশে মন ব্যাঘ্রচর্ম পরিয়াছে। বাহিরে ব্যাঘ্রচর্মের প্রয়োজন হয় নাই; বাহিরে না করিলেই ভালো হয়। হৃদয় যেন, হে ভ্রাতৃগণ, বৈরাগ্যকে ধারণ করে। ধর্মের জন্য বৈরাগ্যকে খুব আদর করিবে। এই বৈরাগ্য দ্বারা অনেকে উপকৃত হইয়াছে। নববিধানে বৈরাগ্যের অনেক সাধন প্রকাশিত ও অবলম্বিত হইয়াছে। এই বৈরাগ্যে আত্মা নবজীবনের শোভা ধারণ করে। কষ্ট যদি প্রথমে হয়, সুখ হইলে আর তাহা কাঁদিবে না। আজ যত কাঁদিলাম— দেখিব, কাল তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে সুখ হইয়াছে। অগ্রে ম্লানমুখ হইলে, শেষে হাস্য আসিয়া বৈরাগ্যকে মহিমান্বিত করিবেই করিবে।

হে দীনবন্ধু, কাঙালশরণ, যার সম্বন্ধে যে বিধি করিয়াছ, তাহাকে সেই বিধিই ধরিতে হইবে। এই সংসার আরম্ভের সময়ে যখন বৈরাগ্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইলাম, তখনই বুঝিলাম— এ জীবন হাসিবার জন্য নয়; সময়ে সময়ে বিপদে পড়িতে হইবে। কিন্তু তুমি নিগ্রহ করিলে না, নিগ্রহের জন্য ভাঙা যষ্টিকে ভাঙিলে না; রুগ্ণ শরীর-মনকে মারিয়া ফেলিলে না। তিক্ত ঔষধ খাওয়াও কেবল বাঁচাইবার জন্য। মেঘ উঠে, আকাশকে চিরান্ধকারে আচ্ছন্ন করিবার জন্য নয়। বৈরাগ্যের অন্ধকারের পরই আকাশ নৃত্য করিতে থাকে, পৃথিবীও নাচিতে থাকে; ফুলে ফলে-শস্যে মেদিনী পূর্ণ হয়। দেখিয়াছি, এ জীবনে যখন যখন মন ভার হয় অমনিই সুফল ফলিতে থাকে। রাত্রির অন্ধকার সকালের দূত হইয়া আসে। গরীবের ঈশ্বর, যা কর তুমি, সেই মঙ্গল বিধি। এত দুঃখ কষ্ট কিছুই তো স্থায়ী হইল না, বিষণ্ণতা তো রহিল না; দিন দিন সুস্থতা, পুণ্য ও ধর্মের আস্বাদন বুঝিতেছি। দর্শনের আনন্দ অনুভব করিয়াছি। এ জীবনে যেন, নাথ, বৈরাগ্যের কষ্ট লইতে কখনো কুণ্ঠিত না হই।

ইহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়, ইহাতে ইন্দ্রিয় দমন হয়, হৃদয় ব্রতধারী হয়, জীবন ভালো হয়। এসো দীননাথ, বৈরাগীদের মধ্যে প্রধান বৈরাগী, তুমি আপনিই সর্বত্যাগী; আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব। অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসী হইয়া বৈরাগী-প্রধান যিনি, তাঁহার অনুসরণ করিব। বৈরাগ্যকে দুঃখের জন্য আর কিরূপে বলিব? যত বৈরাগ্য দিয়াছিলে, ততই এখন নৃত্যের আধিক্য দিয়াছ। যত আগে কাঁদিয়াছিলাম, ততই আজ বন্ধুদের গলা ধরাধরি করিয়া হাসিতেছি, আনন্দ করিতেছি। স্ত্রী পুত্রকে আগে ভয়ানক ভাবিয়াছিলাম, এখন তাহাদিগকে চারি ধারে বসাইয়া তোমার আনন্দে কত আনন্দ করিতেছি। মনে হয়, এই তো পৃথিবীতে স্বর্গ দেখিতেছি। এই যে সংসার, ইহা তো সংসার নয়। সংসারে প্রবেশ করিতে হইল না। আগে একা মনের বিষাদে বসিয়া থাকিতাম, তাই আজ মন্দিরগৃহ বন্ধুপূর্ণ পাইয়াছি। কত ব্রহ্মপরায়ণ বন্ধুই দিয়াছ। এখনি যদি নৃত্য আরম্ভ হয়, দুবাহু তুলিয়া কতই নৃত্য করিবেন। আপনার সুখ অন্যকে দিতেছি, অন্যের সুখ সকল আপনি লইতেছি। আগে স্বপ্নেও জানিতাম না, আমার স্ত্রী, আত্মীয়, বন্ধু, সকলে আমার সহায় হইবেন। শ্মশানে বাড়ি করিয়াছিলাম; সেই বাড়ি যে এত স্বর্গীয় সাধুদের সঙ্গে সম্মেলনের স্থল হইবে, ইহা কি জানিতাম? কত সুখ আসিয়াছে, আরো কত সুখ আসিবে। বৈরাগ্যকে নমস্কার করি। সন্ন্যাসধর্মের প্রবর্তক, তোমাকে নমস্কার করি। প্রকৃত বৈরাগ্যের পথে লইয়া গিয়া তুমি আমাদিগকে সুখী করো— এই তোমার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

[রবিবার, ২৯ শ্রাবণ, ১৮০৩ শক : ১৩ অগস্ট, ১৮৮২ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত]

স্বাধীনতা

আমার ইষ্টদেবতা যখন আমাকে মন্ত্র দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বাধীনতা-মহামন্ত্র নিবিষ্ট ছিল। বৎস! কখনো কাহারো অধীন হইয়ো না— এই প্রধান সৎপরামর্শ। প্রথম অবধি কায়মনোবাক্যে সাধ্যানুসারে এই মন্ত্র পালন করিয়া আসিতেছি। অধীনতা এই পৃথিবীতে বিষ; অধীনতা রাশি রাশি নরক-যন্ত্রণার হেতু। অধীনতার প্রতি প্রথম হইতেই কেন এত বিরক্ত হইয়াছিলাম, জানি না। মানুষ কাম ক্রোধ তাড়াইবার জন্য, রিপু দমন করিবার জন্য চেষ্টা করে, উৎসাহের সহিত প্রভাবিত হয়; কিন্তু অধীন হইব না, অধীন হইব না— এ কথা বলিয়া কেহ পাগল হয় না। অবশ্য বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায় ছিল, এইজন্য জীবনের মূলে এই মন্ত্র নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। অধীনতার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। অধীনতাকে পাপ মনে করিতাম; কী ফল ফলিবে, ভাবিতাম না। অধীনতা পাপ, অধীনতা অনিষ্টের হেতু, অধীনতা ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা। ফল না দেখিয়াই এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম; কেননা, মন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রথম হইতেই স্বীকার করিতে হয়। এইজন্যই আজ পর্যন্ত কাহারো নিকট মস্তক হেঁট করিতে পারিলাম না। ইহার জন্য কষ্টও পাইতে হইয়াছে, তথাপি মন্ত্র ছাড়ি নাই। পাহাড়ের ন্যায় অটল স্বাধীনতাকে আমি জড়াইয়া ধরিয়া আছি। দেখিয়াছি— এ মন্ত্র সহজ মন্ত্র নয়।

'অধীন হইয়ো না' এই যে মন্ত্র, ইহার ভিতরে পরম অর্থ আছে। নববিধান পরে আসিবে, সকল প্রকার ভ্রম কুসংস্কার দূর করিতে হইবে, স্বাধীনভাবে সত্যের মহিমা মহীয়ান্ করিতে হইবে— এই-সকলের জন্যই স্বাধীনতার ভাব আদি হইতে বর্তমান ছিল। স্বাধীনতাই হইল আদি শব্দ। অধীন হইব না, এই সংকল্প ব্যতীত,

এ ভাব হইতে আর কী ফল ফলিতে পারে? এই স্বাধীনতা হইতেই অনেক গুরুতর কার্য প্রসূত হইয়াছে। অধীনতার শৃঙ্খলে শরীর মনকে বদ্ধ হইতে দেওয়া হইবে না; দাসত্ব স্বীকার করা হইবে না; কাহারো পদতলে পড়া হইবে না; গুরুজনের নিকটে আত্মবিক্রয় করা হইবে না; পুস্তক বিশেষেরও কিংকর হইয়া বন্দনা করা হইবে না; কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়িয়া দিবারাত্র তাহারই যশ ঘোষণা করা হইবে না। এ দিকে যেমন এই-সকল প্রতিজ্ঞা, অপর দিকের প্রতিজ্ঞা তেমনিই— স্বেচ্ছাচারের অধীন হওয়া হইবে না; অহংকারের অধীন হওয়া হইবে না; ঈশ্বরের নিকট যে ব্রত লওয়া উচিত, তাহাও পরিত্যাগ করা হইবে না। যতই স্বাধীনতার ভাব বৃদ্ধি হইল, দেখিলাম পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ প্রভৃতি প্রভুত্ব করিতেছে; দেখিবামাত্রই তৎসমুদয়ের শৃঙ্খল ছেদন করিবার জন্য যত্ন হইল। শতাব্দীর পর শতাব্দী দেশকে পৌত্তলিকতাদির দাস করিয়া রাখিয়াছিল, তৎসমুদয়কে কাটিবার জন্য খড়্গহস্ত হইলাম। যাই দেখিলাম, ভ্রম, কুসংস্কার পিতা পিতামহকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, পাড়াতে উপদ্রব করিতেছে, অমনিই অস্ত্র বাহির করিলাম।

আমি দাসত্ব সহ্য করিতে পারিতাম না; এখনো পারি না। কাহাকেও বাসনার বশবর্তী, কি রিপুর বশবর্তী দেখিলে অন্যায় বোধ করিতাম, কোনোক্রমেই সহিষ্ণু হইতে পারিতাম না। আমার অস্ত্র অধীনতা কাটিবার জন্য সততই চক্‌মক্ করিত। কত অনিষ্ট ফল অধীনতা দ্বারা ফলিয়াছে, ভাবিয়া ঠিক করি নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া যে অস্ত্র-হস্তে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহা নয়। অবশেষে এই মহামন্ত্র, গুরুমন্ত্রের আশ্চর্য প্রভাব দর্শন করিলাম। এই পৃথিবীতে কত ভাই-ভগিনীকে দাস দাসী করিয়া রাখিয়াছে; তৎসমুদয়ের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে হইবে বলিয়া ইষ্টদেবতা এমন শিক্ষা দিলেন যে, অধীনতা দেখিলেই আমি উত্তেজিত হইয়া উঠিতাম। রাগের দাস হইতে কাহাকেও দেখিলে, রাগের উপরেই রাগ হইত।

পিতার দাস, কি সন্তানের দাস হওয়াও সহ্য হইত না ; ধনের দাস, মানের দাস অথবা কোনো সম্প্রদায়ের দাস হইতে যখনই কাহাকেও দেখিতাম, রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত। মানুষকে ঈশ্বর স্বাধীনতা দিলেন আর সেই মানুষ পৃথিবীর বাজারে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া, পৃথিবীর পাপের নিকট পরাস্ত হইয়া চীৎকার করিতেছে। রকম রকম লোক রকম রকম লোকের কাছে পদানত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করে। ক্রীতদাস হইবার এত ইচ্ছা! পাঁচ দশ বৎসর দাসত্বই করিতেছে! এক এক বিশেষ-বিশেষ নারীর দাসত্ব করাকে কী বলে? ব্যভিচার বলে। মানুষের দাসত্ব করাকে কী বলে? দাসদলের মধ্যে গণ্য করে। ধনের দাস হইলে লোভী বলে। এ সমস্তই পাপ ; দাস হওয়াই পাপ।

আসক্তি সংসারের রাজা হইলে মজিতে হয়। যে গ্রামে যাই, যে বাড়িতে যাই, রাগ বলে— দেখো, আমার কত দাস-দাসী ; লোভ বলে— দেখো, কত আমার চাকর, আমি কত বড়ো রাজাকে পর্যন্ত মারিতেছি। দাসত্ব-বিধি সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একেবারে পোড়াইয়া মারিতেছে। হা বিধাতঃ! স্বাধীনতা যে মুক্তি, অধীনতা যে নরক। স্বাধীনতার জয়-পতাকা উড়াইয়া অধীনতার দুর্গকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে হইবে। কোনোপ্রকারে সাম্প্রদায়িকতায় পড়া হইবে না। কেহ বলেন, গুরুকে মানিয়ো ; মন বলে, ভয় করে। পিতামাতাকে মানিয়ো ; আশঙ্কা হয়। বন্ধু-বান্ধব যাঁহারা, ধর্মেতে যাঁহাদের সহিত মিলন হইয়াছে, তাঁহাদিগকে মানিয়ো ; আত্মা বলে, বড়ো ভয় করে। খুব যাঁহারা বিশেষ অনুগত, ধর্মে সৎকর্মে অনুকূল, আদরের সহিত তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিয়ো ; মন বলিল— অধীন হইতে আমি ভীত হই। কোনো বন্ধুর বিশেষ মায়াতে আমি বদ্ধ হইব না। খুব বড়ো বন্ধু দেখিলেন যে, আমি ভালোবাসি বটে কিন্তু মায়াতে বদ্ধ হইলাম না। এইজন্য আমার বন্ধুরা বলিলেন —খুব যে আমাদের ভালোবাসে তা নয়, ভিতরে এ ব্যক্তি আবার

নিজের বুদ্ধিকে দাঁড় করায়; আমরা যা বলি, তা করে না। বন্ধুরা বলেন, এইটি করো; আমি তাহা করি না। অন্যের ভালো কথায় ভালো কাজ করিব না, ঈশ্বরের কথায় করিব। অন্যের কথায় যাহা করিলাম না, ঈশ্বরের কথায় তাহা আগ্রহের সহিত করিব। যতক্ষণ না ঈশ্বরের কথা শুনিব, ততক্ষণ আমি কাজ আরম্ভ করিব না। এ প্রকার প্রতিজ্ঞায় অন্যের বিপদ হইতে পারে, কিন্তু আমি সৌভাগ্যশালী, আমার ইহাতে বিপদ না হইয়া লাভই হইয়াছে।

বন্ধুদিগকে কষ্ট দিয়াছি, কিন্তু স্ত্রীর অধীন হই নাই; সন্তানাদির মায়াতে, কি দেশের মায়াতেও আবদ্ধ হই নাই, হইবও না। কেহ প্রমাণ করিতে পারিবেন না যে, জীবিত কি মৃত কোনো লোক আছেন, যাঁহার নিকট আমি অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছি, অথবা যাঁহার মায়াতে আবদ্ধ আছি। স্বাধীনতাই আমার চিরকালের আদরণীয়, কিন্তু ভক্তিবিহীন স্বাধীনতা আদরণীয় ছিল না। পৃথিবীর বাজারে অহংকারমূলক স্বেচ্ছাচার আমি টাকা দিয়া ক্রয় করি নাই। বড়ো হইবার জন্য, উচ্চপদ লাভের জন্য স্বাধীনতা কিনি নাই, সে-প্রকার স্বাধীনতা নরকের স্বেচ্ছাচার; আমি তাহাকে স্বাধীনতা বলি না। আমি ভালোবাসিলাম, কিন্তু মায়াবদ্ধ হইলাম না— ইহাই যথার্থ ভালোবাসা। তোমাদের ভালোবাসিলাম, কিন্তু অধীন হইলাম না। অধীন হইয়া যদি লোক ডাকিতাম, আজ আমার দলে শত-সহস্র লোক থাকিত। মায়া দ্বারা যদি সকলকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতাম, দাসদলভুক্ত করিবার যদি আশা থাকিত, আমার দল লোকে পূর্ণ হইত। স্বাধীনতাকে দলপতি করিলাম। এইজন্য আমার সঙ্গে যাঁহারা অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে আমি বন্ধু বলি, আমাকে তাঁহাদের গুরু বলি না। স্বাধীনতারই জয় হইবে। এই-জন্যই বলি— সত্যের জয়, সত্যের জয়, সত্যের জয়। স্বাধীনতা মানুষকে ডাকিবে। ইহাতে লোক আসে আসুক; গুরুগিরি কখনো করিব না। অধীন হওয়াকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি।

আমাতে যাহা ঘৃণা করি, অন্যেতে তাহা ঘৃণা করি না? দলের সামান্য কাহাকেও আমি অধীন দেখিতে পারি না। কেহ যে অন্যের অধীন হইবে তাহা দেখিতে পারি না; আমার অধীন যদি কেহ হয়, তাহাও আমার অত্যন্ত অসহ্য। অন্য একজন মনুষ্য আমার অধীন হইবে? পিতার নিকট আমি কী উত্তর দিব? আমার মত আর-একজনের ঘাড়ে আমি চাপাইব? আমার শাসনে অপরকে শাসিত করিব? মায়ার মোহিনী মূর্তি দেখাইয়া দলে আনিবার চেষ্টা করিব? অপরকে আমি আমার অধীন করিয়া রাখিব? ইহাতে নরক আমাকে হাঁ করিয়া গিলিবে; স্বর্গও লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিবে। আমার যদি দল না হয়, একজনও যদি কাছে না থাকে, নিজে যখন দাস নই, তখন অপরকেও দাস করিব না।

আমি কখনো দাসত্ব করিয়াছি, তোমরা কি কেহ ইহা জান? আমি যখন কাহারো দাসত্ব করি নাই, তোমরা কেন দাসত্ব করিবে? যে আপনাকে কখনো কাহারো দাস করে নাই, সে যদি অপরকে দাস করিবার চেষ্টা করে, অথবা দাস দেখিয়া হাস্য করে, তার মতো পাপী কপট আর কে আছে? গুরু আমি নই; অপরকে দাস করিবার চেষ্টা করি নাই। চিরকাল শিখিয়াছি, অর্থাৎ আমি শিক্ষার্থী; চিরদিনই শিক্ষা করিতে প্রস্তুত। আমার দলে যদি পঞ্চাশ জন লোক থাকেন, তবে পঞ্চাশ প্রকার; সত্য সাক্ষী, চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী, অধীনতা এখানে নাই। একশত জন লোক যদি এখানে আসিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা স্ব-স্ব প্রধান। প্রত্যেককেই আমার সমক্ষে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে; আমি চলিয়া গেলেও এ কথা প্রত্যেকে স্বীকার করিবেন। দলের কেহই অধীনতায় জীবিত নহেন, কিন্তু স্বাধীনতায়। আমি কাহাকেও জাঁতায় পেষণ করিতে মানস করি না—প্রত্যেককে স্বাধীন দেখিতে চাই। কাহাকেও গুরু অথবা শাসনকর্তা বলিতে বলি না; ঈশ্বরকেই কেবল গুরু ও শাসনকর্তা বলিয়া জানি। অধীনতাপ্রিয় কেহ যদি

ঠক হইয়া এখানে ঢুকিয়া থাকেন, সে ঠককে বাহির করিয়া দিব—দিবই দিব। অধীনের দল এখানে নয়। যার উপর দলের ভার আছে, সে নিজেই যখন অধীন নয়, সে নিজেই যখন অধীনতাকে ঘৃণা করে, তখন এ দলের কেহই অধীন হইবেন না।

প্রত্যেকেরই এক-একটি গুরুতর ভার আছে, ব্রত আছে। একটি ভালো মতেরও অন্ধ হইয়া অনুসরণ করিতে চাই না। আমি অন্ধ হইয়া অন্ধ চালিত করিব না। স্বাধীনতা মহামন্ত্র। এতদূর যদি স্বাধীনতা হয়, এ যে স্বেচ্ছাচারের কাছে গেল। স্বাধীনতা পূর্ণ হইবে, স্বেচ্ছাচার হইবে না; কেননা, এক পিতামাতাকে মানি বলিয়াই পিতামাতার অধীন হইলাম না। সেইজন্য এত দূর করিলাম যে, ধর্মেতেও স্বাধীনতার ব্রত লইলাম। সংসারের মায়া কাটাইয়া আবার অনেকে ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুবর্গের দাসত্ব করিল। পৃথিবীর কীট হইল না; কিন্তু হয়তো ধর্মসমাজে আসিয়া এই বইখানিকে অভ্রান্ত ভাবিয়া তাহারই সম্পূর্ণ দাস হইল। আমি আপনাকে এ-সকলের মায়া হইতে দূরে রাখিয়াছি। কোনো এক পুস্তককে কেন অভ্রান্ত ভাবিব? কেন একটি মানুষকে অবলম্বন করিব? মহামান্য ঈশা মহীয়ান্ হউন, শ্রীগৌরাঙ্গকেও যথেষ্ট ভক্তি করি; কিন্তু তাঁহাদিগকে জীবনের আদর্শ করি না। অহংকারী বলিতে চাও, বলো। দুরাচার বলিবে, তাহাও বলো। কিন্তু কোনো মানুষকে জীবনের আদর্শ কখনো মনে করি নাই, করিবও না। পূর্ণ আদর্শ মানুষ হইতে পারে না। যেখানে ঈশার আলোক পৌঁছিতে পারে না, ঈশ্বর আদর্শ হইয়া নিজ আলোকে সে স্থান প্রকাশ করেন। কোনো পুস্তক নাই, যাহাতে পূর্ণ জ্ঞান পাইতে পারি, এইজন্য বইকে আদর্শ করিয়া লই নাই। ঈশ্বরের পুত্র সকলকে আমি যেমন ভালোবাসি, কে এমন ভালোবাসিয়া থাকে? অথচ আমিই বলি, তাঁহাদিগকে জীবনের আদর্শ ভাবিয়া পিতার অপমান করিব না। আমি বাইবেল, পুরাণকে ভালোবাসিতে গিয়া পিতার

অপমান করিব না। ঈশ্বরের কাছেই আমি থাকিব। স্বর্গে কি পৃথিবীতে, কাহারো দাস হইব না।

ব্যাঘ্রচর্ম আমার প্রিয়, একতারা আমার প্রিয়। এই দুইয়ের প্রতি যদি আমি আসক্ত হই, ইহারাই আমার নিকট দেবতার স্থান প্রাপ্ত হইবে। আজিকার জন্যেই ইহাদিগকে আজ লই, আবার কাল ছাড়ি। আজ উপাসনার সময় ব্যাঘ্রচর্মকে আদর করিলাম, দুই ঘণ্টা পরে তাহাকে ছাড়িলাম, আর যত্ন করিলাম না। বাহ্যিক ব্রত সাধনাদিরও দাস হইবে না। কেহ কি বলিতে পারেন না, কত লোক টাকার মায়া ছাড়িয়া ব্যাঘ্রচর্মের মায়ায় আবদ্ধ হইয়াছে? এইজন্য আত্মা সতত সাবধান; অধীন আসক্ত কখনো কোনো বস্তুর হইবে না, ফুলে আসক্ত হইবে না, গৈরিক বস্ত্রে আসক্ত হইবে না, ব্যাঘ্রচর্মে আসক্ত হইবে না। আমার যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, আমি তদ্দারা প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লইব; তার পর বলিব—বিদায় দাও মৃদঙ্গ, বিদায় দাও গৈরিক বস্ত্র, বিদায় দাও ব্যাঘ্রচর্ম। আমার কার্য হইয়া গেল, আর তাহা লইয়া থাকিব কেন? সে কিছুতে আমাকে দাস করিবার জন্য আসে নাই। আমার দরকার, তার নয়। অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইব; সিদ্ধ হইলে আর তাহা থাকিবে না। যদি কিছুরও প্রতি আসক্তি থাকে, ব্রতাদির প্রতি যদি একটুকুও আসক্তি থাকে, তবে যে পরিমাণে আসক্তি, সেই পরিমাণে নরকের অগ্নি জ্বলিতেছে।

নববিধানে প্রত্যেকের স্বাধীনতা। কে গুরু? কে ব্রাহ্মসমাজ? কে আমার ব্রাহ্মদল? কোনো বিষয়ের উপরেই আসক্তি নাই। বস্তু যাহা তাহা রাখিব। নাম পর্যন্তও আবশ্যক হইলে পরিত্যাগ করিতে পারি, বস্তু কোনো মতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না; আর সকলই পারি। এজন্য কাহারো সঙ্গে মিল হইল না। দুঃখ পাইলাম, সুখও অনেক পাইলাম। গুরুগিরি যদি করি, লোক-সংখ্যা বাড়াইতে পারি; কিন্তু তাহা করিতে পারি না।

পরমেশ্বর আশীর্বাদ করুন, আমার ও আমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে স্বাধীনতাকে যেন সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারি। ইহাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। যাহা হইবার, ইহাতেই হইবে। স্বর্গ হইতে স্বাধীন জীবগণের উপরে পুষ্পবর্ষণ হইতে থাকিবে, পিতার কাছে সকলে থাকিবে, স্বেচ্ছাচারী হইবে না। একদিকে যত পাপকে, ভ্রম কুসংস্কারকে দাঁড় করাও; অপর দিকে যত প্রকার ভয়ানক স্বেচ্ছাচার, দম্ভ অহংকার আছে, তৎসমুদয়কে দাঁড় করাও। অবশেষে এই দুইয়ের বিরুদ্ধেই স্বাধীনতার অস্ত্র নিক্ষেপ করো। আমরা ঈশ্বরের অধীন, এই জন্যইসম্পূর্ণ স্বাধীন।

হে দয়াময়, হে স্বাধীন পুরুষ! মহামন্ত্র স্বাধীনতা কী আশ্চর্য মন্ত্র। দয়া করিয়া যদি আমাকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিলে, তবে আমার ও ভাই-ভগিনীর মঙ্গলের জন্য, আমাদিগের সকলের মধ্যে স্বাধীনতার ভাব বৃদ্ধি করিয়া দাও। গেলাম যে পাপের জ্বালায়; তার উপর দেশাচার, কুরুচি, ভ্রম তোমার সন্তানকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। তার উপর আবার নানা-প্রকার আসক্তি ঘাড়ে চাপিয়াছে। হে ঈশ্বর, ঐ ওরা আমাকে কিনিয়া লইবে, ক্রীতদাস করিয়া রাখিবে— এই বলিয়া কাঁদিতেছি। মা, কোথায় তোমার দাসত্ব করিব — না, কার কাছে রহিয়াছি, সংসারের প্রভুর সেবা করিয়া মরিতেছি। স্কন্ধের উপর, মনের উপর, অসহ্য দাসত্ব-ভার রহিয়াছে। অধীনতা মানুষকে মারিয়া ফেলিতেছে। স্বাধীনতা-প্রদাতা, কোথায় রহিলে আজ? মানুষ কেন এত কষ্ট পাইতেছে? অধীনতার ভাবের সঙ্গে একবার যুদ্ধ আরম্ভ হউক। মা শক্তিস্বরূপা, হুংকারে শত্রুদল তাড়াও। আর পরের দাসত্ব করিব না। মা আনন্দময়ি, আর পাপের দিকে যাইব না; রিপুপরতন্ত্র আর হইব না। যাহা করিতে বলিবে, তাহাই করিব; যেখানে যাইতে বলিবে, সেইখানে যাইব; যাহা খাইতে বলিবে, তাহাই খাইব; যাহা নিষেধ করিবে, তাহা কখনোই করিব না। কোনো প্রকার কু-অভ্যাসের দাসত্ব

করিব না। বড়ো কষ্ট হয় সে অবস্থায়, বিবেক যখন মনকে বলে, এমন যিনি ভালোবাসেন, সেই মার আদেশ পালন করলি না? তাঁর কথা অগ্রাহ্য করলি? তাঁকে অপমান করিতেছিস? বুঝিতেছি, মা— অধীনতা, দাসত্ব ভয়ানক নরক। তোমার পাতকী সন্তানকে উদ্ধার করো। লোহার শিকল ছিঁড়ে দাও, ভাই-বন্ধুদের লইয়া স্বাধীন পাখি হইয়া উড়িয়া বেড়াই, স্বর্গের বাগানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করি; স্বর্গের ফল ভক্ষণ করি। আর যেন অধীনতা-পিঞ্জরে না থাকি। আকাশ-বিহারী স্বাধীন পক্ষী আকাশে উড়ুক। দয়াময়, দয়া করো, আশীর্বাদ করো, তোমার দেওয়া স্বাধীনতার সদ্‌ব্যবহার করিয়া যেন সুখী হই। পিতা, তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা।

(রবিবার, ৫ ভাদ্র, ১৮০৪ শক: ২০ অগস্ট, ১৮৮২ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত)

অন্তরে যদি কেহ কথা কয়, সাধারণ লোকে তাহাকে ভূত বলিয়া মানে। যে ব্যক্তি প্রেতগ্রস্ত হইয়াছে, সেই ভিতরে এবং বাহিরে বাণী শ্রবণ করে। ধর্মজীবনের আরম্ভ অবধি অনেক সময় এই প্রকার বাণী, এই প্রকার কথা, ভিতরে এবং বাহিরে শ্রবণ করিয়াছি, অথচ তাহাকে প্রেতবাণী বলিয়া মনে করি নাই এবং কখনো করিবও না— এই জীবনের এই আর-একটি বিশেষ কথা।

এক জনের ভিতরে আর-এক জন থাকে, এক জিহ্বার মধ্যে দুইটি জিহ্বা থাকে, দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্পষ্ট স্বর শ্রবণ দ্বারা আয়ত্ত করা যায়, এ অনেকবার অনেক ঘটনায় দেখা গিয়াছে। মানুষ কথা কয়, বিচার করে, বিচার করিয়া ধর্মজ্ঞান লাভ করে। আমি ভাবিয়া ধর্মপথে আসি নাই, এ কথা বার বার স্বীকার করিয়া আসিতেছি ; কিন্তু 'আমি'র মধ্যে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করে, যাহা আমি নই, এমন একজনকে স্পষ্ট অনুভব করি ; তাহার কথা শুনিয়াই ধর্মকার্য করিতে চাই। একজন যে ভিতরে কথা কয়, এই পরীক্ষিত সত্য বার বার অনুভূত হইয়াছে। কেহ কেহ ভিতরের এই বাণী শ্রবণ করেন না, তাহা জানি। ইহা শুনিতে শুনিতে কুসংস্কার হয়— ইহা প্রেতবাণী, ইহা শুনিলে অকল্যাণ হয়, অনেকে এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। এইরূপ বাণী যাহারা শ্রবণ করে, তাহাদিগকে পাগলের শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিতে হয়, এ সংস্কার কাহারো কাহারো আছে। কেবল এ দেশে নয়, সকল দেশেই লোকের এরূপ সংস্কার দেখা যায়। আমি ছাড়া আর-এক জন আমার ভিতরে আছে— এ কথা যদি কেহ বলে, দশ জনে সভা করিয়া তাহাকে উন্মত্তশ্রেণীভুক্ত করে। ইহা যদি উন্মাদের ব্যাপার হয়, তবে আমি এ প্রকার উন্মাদগ্রস্ত হইতে অভিলাষ করি। ইহা ধর্মের উন্মত্ততা, পরিত্রাণের

উন্মত্ততা। কেননা, আমি ইহাকে ভূতের বাণী বলি না— ব্রহ্মবাণী বলি।

এই বাণীর প্রতি আমি এক চুলও অবিশ্বাস করিতে পারি না। যখনই এই শব্দ শুনিয়াছি, যতবার এই অদৃশ্য প্রাণবিশিষ্ট পুরুষের কথা— স্পষ্ট স্বর— শ্রুতিগোচর হইয়াছে ততবারই বুঝিয়াছি এ শব্দ বন্ধুর নয়, পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্রের নয়, আমার নিজেরও নয়, পুস্তকের শিক্ষিত সত্য নয়, পূর্বকালের কথা স্মরণপথে সমুদিত হইল, এরূপও নহে ; কল্পনাদেবী ভালো ভালো রঙ দিয়া মনের মধ্যে চিত্র করিলেন, তাহাও নয়। কোনো পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য, কি কোনো সদনুষ্ঠান আরম্ভ করিবার জন্য তিনিই বলিতেছেন। কোনো নূতন কার্যের সূচনা করিতে, কি কোনো নূতন স্থানে যাইতে তিনিই আদেশ করিতেছেন। তিনিই বলিতেছেন, কোনো পাপ বিনাশ করো, কোনো কুরীতির প্রতি খড়্গহস্ত হও। আমি এ-সব বিষয় ভাবিয়া ঠিক করিতেছি, কি নিজে এই-সকল কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, ইহা একবারও মনে হয় না। যিনি স্বভাবকে এই প্রকার স্বভাব দিয়াছেন, তিনি বলিতে পারেন, আপনার ভিতরে এই প্রকার শব্দ শুনিলে লোকের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়। বুদ্ধি চেষ্টা করিয়া, কত উপায় অবলম্বন করিয়াও এই বাণীকে তাড়াইতে পারে নাই। আমি একজন প্রধান ব্যক্তি, আমি জানিতেছি, আমি করিতেছি, আমি বুঝিতেছি, কষ্টের পথ আমি ছাড়িতেছি, আমার সৎকীর্তি দশ সহস্র লোকের কাছে থাকিয়া যাইবে— এ প্রকার আশা ও চিন্তা অনেকেরই হৃদয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু আপনার বিদ্যা-বুদ্ধি অনুসারে অনেক কার্য করিয়াছি, এই কার্যগুলি আমার কার্য নয়, এ ভাব আমার ভাব নয়, কারণ মনের ভিতর আর-এক জন কথা কন, ইহা আমি অনুভব করিয়াছি, এরূপ কথাও অনেকে স্বীকার করেন।

আমার যেমন ভাব ও প্রকৃতি আছে, তাঁরও তেমনি আছে। আমার যেমন সিদ্ধান্ত আছে, তাঁরও তেমনিই সিদ্ধান্ত আছে। এক

জীবাত্মা, আর এক পরমাত্মা। দুই স্বতন্ত্র; বিশেষ্য একটি, বিশেষণ দুইটি; আত্মা পদার্থে দুই বিশেষণ মিলিত। এক জীব, আর এক পরম। জীব কথা কয় আত্মার ভিতর; পরম যিনি, তিনিও কথা কন আত্মার ভিতর। দুই জনেরই রসনা রসাস্বাদন করে। দুই ব্যক্তি অনুভব করা অনেকের পক্ষে সাধনের ব্যাপার। এই যে ভালো কথাগুলি, এ-সব ঈশ্বরের; আর মন্দ কথা, কুবুদ্ধি, অসৎ পরামর্শ, অবিদ্যা সমস্তই আমার। বার বার যদি ভাবা যায়, কল্যাণ যত সব ভগবানের, অমঙ্গল সমস্তই আমার; সুখ ও সুস্থতা তাঁর, অসুখ ও দৌর্বল্য আমার। মনোবিজ্ঞানে প্রণালী সহকারে যদি ঐরূপ ভাবি ও সাধন করি, তাহা হইলে অসৎকার্যের জন্য নিজে লজ্জিত হইব, আর ভালো কার্যের জন্য সুখ্যাতি, গৌরব ঈশ্বরকে দিব। কাহারো পক্ষে ইহা উপার্জিত জ্ঞান; কাহারো পক্ষে এরূপ উপার্জিত ভাব, প্রকৃতিস্বাভাবিক।

দুইটি পাখি সর্বদাই গাছের ডালে বসিয়া আছে। পাখি দুইটির গায়ের রঙ অনেক পরিমাণে এক; গলার স্বরও অনেকাংশে এক। সাদৃশ্যও আছে, বিভিন্নতাও আছে। স্বভাবত যাঁহাদের এই ভাব মনে হয়, যাঁহাদের এই স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান— তাঁহাদের মনে সততই দৈববাণী শোনা যায়। এখন যেমন বজ্রধ্বনি হইতেছে, এমনিই শব্দ করিয়া ব্রহ্মবাণী হৃদয়কে তোলপাড় করে। অনেকের মনে দুর্বল বুদ্ধির সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়। কখনো মনে করে— এই সত্য প্রার্থনার পর লাভ করিলাম; কখনো মনে করে— বই পড়িয়া বুদ্ধি খাটাইয়া উপার্জন করিলাম। কখনো মনে হয়— প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাই ভগবান জ্ঞান দিলেন; আর কখনো মনে হয়— ভগবানের ধার আমরা ধারি না। যখন সাধনা দ্বারা বিনয়-সম্পন্ন হয়, তখন উচ্চ উচ্চ সত্য সকল যে বুদ্ধির উপার্জিত নয়, উচ্চ উচ্চ ভাব-সকল যে কল্পনার ফল নয়, তাহা অনুভব করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। যেখানে বিশ্বাস উজ্জ্বল, যেখানে পুরুষদ্বয়ের স্বর স্পষ্ট অনুভূত হয়— সেইখানেই শুভ লাভ করা যায়। স্পষ্ট জানিতেছি—

এই ওঁর, এই আমার। আমার রুচি বলিতেছে— তুই মদ্যপান কর্, বিলাসসুখ অনুভব করিতে থাক্ ; আর-এক বাণী বলিতেছে— আমার পথ অবলম্বন করো, ইহাতে ছিন্ন বস্ত্রও পরিতে হইতে পারে, সর্বত্যাগী হইয়া থাকিতে হইতেও পারে ; কিন্তু আমি বলিতেছি ইহাতেই তোমার মঙ্গল। আমার যুক্তি বলিতেছে, খাওয়ার কষ্ট বৈরাগ্যে ; আর-এক যুক্তি বলিতেছে, তোমার যুক্তিতে চলিলে হইবে না। আমি যখন বলিতেছি, তখন অন্ধকারের পথই ভালো। সহস্র যমদূত থাকিলেও সেই পথে যাইতে হইবে।

এই অধমের জীবনে এমন পরীক্ষার ব্যাপার অনেক হইয়াছে। যেখানে আপনার বুদ্ধি দেখাইতেছে দৈন্য, অসুস্থতা, গঞ্জনা ও অপমান, সেইখানে অপর দিকে কেবল একটি লোক বলিতেছে— 'কুছ্ পরওয়া নেই'। মন আর কোনো কথা শুনিল না। কিরূপে মনুষ্যের বুদ্ধি ভবিষ্যতে অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া বলিবে, এই আমার ভালো পথ ? এখনই দেখিতেছি, যন্ত্রণার আরম্ভ। হয়তো চল্লিশ বৎসর আরো বাঁচিতে হইবে, দেখিয়া শুনিয়া অন্ধকারের পথে প্রেতের কথা শুনিয়া চলিব ? এরূপ একটু সন্দেহও আমি করিতে পারি নাই। একজনের কথা এমন মিষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য বোধ হইল যে, তাহারই অনুসরণ করিলাম। আমার কথাকে কুমন্ত্রণা বুঝিলাম, ভালো ভালো বন্ধুদের কথাকেও অযুক্তি মনে করিলাম। ভিতরে চুপি চুপি কথার উপর বিশ্বাস করিয়া বলিলাম— 'থাকে প্রাণ, যায় প্রাণ, তোমার ঐ পদাশ্রয় লইব'। বার বার ইহারই জন্য আত্মীয়-কুটুম্বকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে ; বহু কষ্টের মুখে পড়িতে হইয়াছে, আপনার লোককে ছাড়িতেও হইয়াছে। একবার আলো হয়, আবার ঈশ্বর বলেন, অন্ধকারে যা। যখনই ভূতের কথা বলিবে তখনই তোমার মৃত্যু— ভগবান এই ভয় দেখাইয়াছিলেন, তাই বিশ্বাস করিলাম ; প্রেতের কথা নয়, অদৃশ্য ভগবানের কথা। যিনি জীবাত্মায় মিশিয়া আছেন— তাঁহারই কথা।

যতই যোগ সাধন করিলাম, মনোবিজ্ঞান আলোচনা করিলাম, মনের ভিতর ততই বুঝিলাম— জীবরূপ বাড়ি দোতলা ; নীচে জীব, উপরে ব্রহ্ম। জীব-বৃক্ষে দুইটি পাখি ; এক ছোটো পাখি— জীবাত্মা ; আর-এক বড়ো পাখি— পরমাত্মা। বুঝিলাম, ছেলেবেলা হইতে যাহা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলাম তাহা অযৌক্তিক নয় ; জীবের জিভ যাহাকে বলি, তাহা কাটিলে দুই অংশ দেখিতে পাই। একটি বেদ-বেদান্ত বলে, আর একটি মরণের কথা বলে। এক স্থূল রসনা অসার কথা বলে, আর এক সূক্ষ্ম রসনা 'হরি হরি' বলে। কান বধির হইলে 'হরি হরি' শোনা যায় না— 'টাকা টাকা' শোনা যায়। চেষ্টা করো, সূক্ষ্ম রসনার মিষ্টবাণী শুনিবে। যে শোনে নাই, তার বিশ্বাস কতদূর বলিতে পারি না। যাঁহারা এ পথে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের কষ্ট দূর হইবে— আমার এ বিশ্বাস এখন যে কেহ হাসিয়া উড়াইবে, তাহা পারিবে না ; বিশ বৎসরের বিশ্বাস নড়াইবার ক্ষমতা যে কাহারো আছে, মনে করি না। দুইটি পুরুষের স্বর মন হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া যায় না।

লেখাপড়া করি আমি, টাকা আনি আমি, ধর্মসিদ্ধান্ত করি আমি— এইরূপ ভাবিয়া প্রধান হইতে কার না ইচ্ছা হয় ? কিন্তু আর-এক জন ভিতরে আছেন, তাঁর কাছে গেলেই আমি হই দাস, ভৃত্য। একটি মহাসাগরের কাছে আমি হই ছোটো ডোবার মতো, খানার মতো ; প্রকাণ্ড সূর্যের কাছে আমি হই একটি ক্ষুদ্র দীপ ; একটি সুবিস্তৃত অট্টালিকার কাছে আমি হই একটি ছোটো ঘর— আমি প্রধান, কিরূপে বলিব ? এই আমি বলিলাম— যাই, আমি টাকা আনি ; অমনিই আর-এক জন বলিলেন— 'খবরদার, যাস্ না'। সহস্র লোক বলিতেছে— এ কার্য করিয়ো না, ভালো লোকে পর্যন্ত তোমাকে পরিত্যাগ করিবে, অপমানের সীমা থাকিবে না ; কিন্তু ভিতরের চুপি চুপি কথা গুর্ গুর্ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে লাগিল। মোহ-জাল চারি দিক হইতে অপর সকলে

ছড়াইতে লাগিল, কুপরামর্শের পাথর চাপাইতে লাগিল; কিন্তু তাহাতেও গুর্ গুর্ শব্দ থামে না। দিনের বেলায় সেই শব্দ শোনা যাইতে লাগিল; রাত্রিতেও সেই শব্দ উত্তেজিত করিতে লাগিল। ভিতরের গম্ভীর ভাব আরো বাড়িতে লাগিল! বড়োই কষ্টের ব্যাপার হইল। আমি বলি— বামে যাই; সে বলে— দক্ষিণে যাও। আমি বলি— সুখ সম্পদ; সে বলে— 'না'। আমি বলি— আলো; সে বলে— অন্ধকার। বার বার ভিতরের পুরুষ কথা কয়। আপিলের আদালত খোলাই রহিয়াছে; একটু ছুটি নাই।

ভগবান বলিতেছেন— ভিতরে ইহাই ভাবিতে হয়, নতুবা সাত শত ভূতের জ্বালায় আপনাকে জ্বালাতন বোধ করিতে হয়। মনে হয়, সুখ শান্তি আমি আর পাইব না; এদিকে ওদিকে ভূতে ছিঁড়িয়া খাইতেছে, এমনই কষ্ট হয়। এত বিদ্বান হইয়া ভিতরের এই একজনের মতে চলিব? এত শাস্ত্রকারের কথা ছাড়িয়া এর কথা শুনিব? অত বড়ো পণ্ডিত যে সক্রেটিস, তিনিও এই ভূতের কথা শুনিতেন। তাঁর মতো সুবিদ্বান আপনার কথা ছাড়িয়া ইহার কথায় চলিতেন। দৈববাণীকে আপনার বুদ্ধির কথা বলিতে পারা যায় না। যদি কেহ বল— ঠকিবে। এ বিষয়ে আমার বিচার-নিষ্পত্তি অন্য প্রকার হইয়াছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যদি রসাতলে যায়— এ বিশ্বাস আমি ছাড়িব না। ফলাফল বিচার করিয়া বিশ্বাস করি নাই; ফলাফলের উপর বিশ্বাস নির্ভর করে না। দশ জনে এ প্রকার পথ ধরিয়া মন্দ পথে গিয়াছে বলিয়া ইহা ছাড়িব না। দশ জনে জাল করিয়াছে, অতএব আমি টাকা ছাড়িব— ইহা হইতেই পারে না। অর্থের অন্বেষণ যাহারা করে, তাহারা করিবেই করিবে। কেহ মরিল বলিয়া যারা বাঁচিতেছে, তারা আর বাঁচিবে না?

দুইটি পুরুষ যখন দেখিতেছি, আমি আর ভগবান; এক জনের কথায় অবিদ্যা ও দুর্নীতি, আর-এক জনের কথায় যত শাস্ত্র; তখন দুই জনকে কেন একজন মনে করিব? ঈশ্বরের প্রশংসা কেন নিজে

হরণ করিব? নিজের দোষ কেন ঈশ্বরের স্কন্ধে আরোপ করিব? তুমি বলিতে পার ইহাতে মানুষ আপনার কথা ঈশ্বরের বলিয়া প্রচার করিতে পারে। হে জীব, তুমি বলিতে পার— 'তোমার যদি ভালো খাইবার সাধ যায়, তুমি ঈশ্বরের মুখ হইতে তদনুযায়ী কথা বাহির হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিবে। নিজের দুষ্কর্ম ও কামনার মতো বাণী-সকল ঈশ্বরের মুখ হইতে বাহির করিবে।' কিন্তু কেহ প্রবঞ্চক হইতে পারে বলিয়া আমি ধর্ম ছাড়িতে পারি না; এই বিশ বৎসরে কতবার কথা শুনিলাম, কত কথাই শুনিলাম— একবারও আমি প্রতারিত হইলাম না। এই বিশ বৎসরের মধ্যে একটি বারের জন্যও এ বিষয়ে আমাকে অনুতাপ করিতে হয় নাই। আমি দেখিতেছি— জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক বাটিতে গোলা। আমি মনে করি না, একজন স্রষ্টা আকাশে, আর আমি একাকী পৃথিবীতে পড়িয়া আছি। আমার হাতের ভিতরে তাঁর হাত, আমার রসনার ভিতরে তাঁর রসনা, আমার প্রাণের মধ্যে অনন্ত প্রাণবায়ু। বিশ্বাস যখন করি, জিহ্বা যখন নড়ে, তখন দেখি, দুই জিভ একত্র নড়িতেছে কি না? পাপীর জিভ যদি নড়ে, কাটিতে ইচ্ছা করি। বলি, ভগবানের রসনা, তুমি কী বলিবে বলো। তাদের কথা মানি না— যাহারা ইহাকে অনুমান বলে। সন্দেহ আমার একটুও নাই: একটু সন্দেহ থাকিলে বেদী হইতে বলিতাম না। দুইটি জিভ যখন স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, সে অবস্থায় তুমি কী বলিবে? তুমি কি বলিবে, জীবই ব্রহ্ম? দুই আদালত স্পষ্ট রহিয়াছে। এক আদালতের নিষ্পত্তি বারবার অপর আদালতে চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। তুমি যেখানে ছোটো আদালতের কথা কহিতেছ, সেইখানেই বড়ো আদালতের নিষ্পত্তি তোমার কথাকে চূর্ণ করিতেছে। অতএব, আমি দ্বৈতবাদী; দুই বিচারপতি দেখিতেছি। এক আত্মা; আ -একজন আত্মাকে চালাইতেছেন। যখন আমি বলি, আমার কথা আত্মিকভাবে উচ্চারিত হয়— জিহ্বা মাংসখণ্ডে নয়; তেমনই যখন তিনি বলেন,

তাঁরও কথা আত্মিকভাবে উচ্চারিত হয়— জিহ্বা মাংসখণ্ডে নয়। আত্মার কথা লোহার তার কি পিতলের তারের শব্দের ন্যায় নয়, নদীর তর্ তর্ শব্দ, কি পাখির সুস্বরের ন্যায় নয়, অথচ তাহা আশ্চর্যকর ও অত্যন্ত সুস্বর। সেই কর্ণ তাহা চেনে যে কর্ণকে ঈশ্বর ক্ষমতা দান করেন। আমি যেন আরো ব্রহ্মবাণীতে বিশ্বাস লাভ করি; তোমরাও যেন এই বিশ্বাসের পথ ধরিয়া আপন আপন কল্যাণ সাধন কর।

হে দীনবন্ধু, হে অন্তরাত্মা! আমার জীবনের কোন্ অংশে তুমি লুকাইয়া আছ— জানি না। কর্ণ শুনিতেছে— ভিতরে একখানা বেদ পাঠ হইতেছে, একখানা নূতন শাস্ত্র পাঠ হইতেছে। কে পড়িতেছে— জানি না। একজন বিচারপতি সর্বপ্রধান হইয়া বিচার করিতেছেন; কোথায় তাঁর বিচারালয়— জানি না। আমার অস্থির ভিতরে থাকিয়া কেবল স্বর দ্বারা পরিচয় দিতেছে। আমার অন্ধকার আত্মার ভিতরে থাকিয়া তুমি শব্দ করিতেছ। পোড়ো বাড়িতে শব্দ শুনিলে লোকে যেমন ভীত হয়, অনেক সময় প্রাণের মধ্যে তোমার শব্দ শুনিয়া তেমনই ভীত হইতে হয়। হৃদয়ের এক অন্ধকার গলির ভিতরে শব্দ শুনিলাম; যেমন শুনিলাম— ভাবিলাম, এ কে? কে আমাকে কুচির পথে যাইতে নিষেধ করিতেছে? বলিলাম— ভগবান, আর কেহ নয়। আমার ঈশ্বর। তুমি গাছের ভিতর, চন্দ্র-সূর্যের ভিতর দেখা দিলে, আবার নীতিবিজ্ঞানের মধ্যে দেখা দিলে। সে মনোবিজ্ঞান আমি মানি— যাহাতে বলে তুমি জগতের কৌশলে একজন রহিয়াছে, নীতিবিধির মধ্যে তুমি একজন থাকিয়া মনুষ্যকে জাগাইয়া রাখিয়াছ। পৃথিবীতে না দেখিয়া যদি কখনো উদাসীন হই, অন্তরের বাণী কখনোই নিদ্রা যাইতে দেয় না। একটি অন্যায় কর্মে প্রবৃত্ত হব হব মনে করিতেছি, অমনই ধাক্কা মারে। ঘরে থাকি, বাগানে যাই, বাহিরে যাই, দৈববাণী যেন কানে লাগিয়াই আছে। কান যদি ছিঁড়িয়া ফেলা হয়, তবু যে ঐ শব্দ শোনা যায়। তনু যদি ভস্মসাৎ হয়, তবু ঐ আগুন জ্বলিতে

থাকে। এমনই তোমার বাণী, যেন সহস্র নদীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধারা এক ধারায় মিলিয়া পাহাড়ের উপর পড়িতেছে। কোনো মতেই ও শব্দ ভুলিতে পারি না। তোমার কথা, আমার কথা, উভয়কে এক বলিতে কোনো মতেই পারি না। বাক্য তোমার এমনই মিষ্ট যে, তোমার কথা শুনিয়া আমি কখনোই কষ্ট পাইলাম না। কখনো কুমন্ত্রণা দিয়া দাসকে মন্দ কার্য করাইয়াছ— ইহা কোনো মতেই বলিতে পারি না। যত বাণী ধরিতে পারিয়াছি, প্রত্যেকটিই অভ্রান্ত সত্য দৈববাণী। কখনো দেখিলাম না— ব্রহ্মবাণী কল্পনা করিয়া ভ্রম হইল। একদিনের জন্যও অনুতাপ হইল না। যখনই ধরিয়াছি, ঠিক ধরিয়াছি ; ব্রাহ্ম হইয়া যখন তোমাকে পাইয়াছি, তখন তব দর্শনে কী ভয় লোকভয়ে? কী ভয় কল্পনাভয়ে? বিশ বৎসর এ ব্যবসায় চালাইতেছি, এ দাস কখনোই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই ; প্রতিবারই লাভ হইয়াছে। শুভক্ষণে ব্রহ্মবাণী মানিয়াছি, তাই এত দিনে এত সঞ্চয় করিয়াছি। হে মাতা, যত লোকে তোমার আশ্রয় লইয়াছে, সবাই যেন ব্রহ্মবাণী আশ্রয় করিতে পারে— এই আশীর্বাদ করো। সবাই ছাড়িলেও তোমার কথা শুনিয়া যে কী সুখ হয়, কেমন শান্তিধারা বক্ষের উপর পড়ে, তাহা জানিয়াছি। হাত জোড় করিয়া তাই এই প্রার্থনা করিতেছি— আপনার কুভাব, পরের কুমন্ত্রণা ছাড়িয়া, মা! তুমি কী বলিতেছ তাই যেন শুনি। জননী, তুমি কী বলিতেছ, এই যেন কেবল সকলে জিজ্ঞাসা করে। পৃথিবীর বেদী নিস্তব্ধ হউক ; মা, আমার বাহিরে ভিতরে বাস করিয়া চুপি চুপি কথা কও। তোমার কথা আমার মিষ্ট সুধা লাগে ; অন্যের কথা বিষ বোধ হয়। বার বার কথা কও ; কৃপাময়ি, তোমার কথা শুনিয়া পাপকে বধ করি, পুণ্য শান্তি সঞ্চয় করি, কাঙাল বলিয়া একবার তুমি আমাদিগকে এই আশীর্বাদ করো।

[রবিবার, ১৯ ভাদ্র, ১৮০৪ শক ; ৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত]

ভক্তিসঞ্চার

হে পাঠক, এই জীবনবেদ আশার বেদ। হে শ্রোতা, এই জীবনের অনেক কথা আশাপ্রদ এবং উৎসাহ-উত্তেজক। কেননা, সকলই লইয়া তো একেবারে পৃথিবীতে আসি নাই, সাধনোপার্জিত সত্যের বিষয় শুনিলে, হরিনামের গুণে আয়াসলব্ধ সত্য সম্বন্ধে পরীক্ষিত ব্যাপার জানিলে কাহার না হৃদয়ে আশা উদ্দীপ্ত হয়? এ জীবনের দুর্বল বিভাগ, অভাব ও অন্ধকারের বিভাগও আছে; তাহা জানিলে নিরাশ ব্যক্তির অন্তঃকরণেও আশার সঞ্চার হইবে। যত্নপূর্বক এই বিষয় শ্রবণ করো। এই জীবনে প্রথমে ভক্তি ছিল না, প্রেমের ভাবও অধিক ছিল না, অল্প অনুরাগ ছিল; ছিল বিশ্বাস, ছিল বিবেক, ছিল বৈরাগ্য। তিনেরই প্রথম অক্ষর 'ব' স্মরণের পক্ষে সুযোগ। তিন লইয়া এই সাধক ধর্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল, ক্রমে আর যাহা যাহা প্রয়োজনীয় সমস্তই দেখা দিল। যখন সময় হইল, আনন্দের সহিত শস্য সংগ্রহ করা হইল। বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য— তিনই শুষ্ক ও কঠোর। তিনই ভালো পদার্থ বটে, ধর্মের বাজারে তিনেরই দাম কম নয়, অবস্থাবিশেষে এ-সকলও দুষ্প্রাপ্য। সৌভাগ্যক্রমে এই তিনটি আমার প্রথমে ছিল। ভালো হইব, দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিব, কঠোর হইয়া ইন্দ্রিয় দমন করিব, ঈশ্বরের জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিব— এই-সকল ভাবই মনের মধ্যে উঠিত। বিবেক বৈরাগ্য খুব সহায় ছিল। 'বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে'— প্রথম হইতে বুঝিয়াছিলাম।

এত কঠোর যে-জীবনের আরম্ভ সেখানে ভক্তিরস কিরূপে দেখা যাইবে? তাহার প্রত্যাশাও তখন করিতে পারা যায় নাই; ভক্তি অতিশয় আবশ্যক, ইহাও তখন মনে হয় নাই। মাতৃচরণকমল কী, তাহা বুঝিতাম না। বিবেকের রাজার কাছে প্রার্থনা করিতাম।

অপরাধী, বন্দী, বৈরাগী, তপস্বীদের ঈশ্বরের কাছে থাকিব— এই অভিপ্রায় ছিল। একজন বিশ্বাসী পরব্রহ্মের উপর নির্ভর স্থাপন করিল— এই খেলাই দেখিতাম; ভক্তের খেলা দেখি নাই। তখন আকাশে সূর্যের কিরণ, চন্দ্রের জ্যোৎস্না পাই নাই। বিবেক হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে, খুব আলোকিত করিতেছে— ইহাই অনুভব করিতাম। পাপকে বলিতাম— আসুক দেখি, কেমন পাপ! হৃদয়ের মধ্যে কেবলই জ্বলন্ত অগ্নি প্রকাশ পাইত; প্রলোভনকেও অগ্রাহ্য করিতাম। কিন্তু যে আনন্দ ভক্তিতে উৎপন্ন হয়, সে আনন্দ হৃদয়ে ছিল না। পুণ্যবান হইলে, জিতেন্দ্রিয় হইলে যাহা হয়— তাহা ছিল। সে সন্তোষ, সে তৃপ্তি— আনন্দ সে নয়। আনন্দময়ীর পূজা ব্যতীত আনন্দ হয় না। বিবেকের রাজাকে ভয়ে ভয়ে প্রণাম করিলে সন্তোষ হয়; আনন্দ হয় ভক্তির সহিত আনন্দময়ী জননীর পূজাতে। এরূপ অবস্থা যদি কাহারো হয়, আশার সহিত তাহাকে বলি— ভ্রাতঃ, নিরাশ হইয়ো না, নিরাশ হইয়ো না। ধর্ম যদি ভয়ে আরম্ভ হয়, পরিণত হইবে ভক্তিতে ও আনন্দে। আজ যদি কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবন ভালো কর, কাল দেখিবে সেখানে ভক্তি-কুসুম ফুটিয়াছে।

আনন্দবাদীদের মধ্যে আমার যে প্রবেশ হইবে— এরূপ আশা ছিল না। যদিও কোনো কোনো স্থলে মাননীয় বন্ধুদের নিকট 'ব্রহ্মানন্দ' নাম পাইয়াছিলাম; কিন্তু আমার অন্তর তাহাতে সায় দিত না। অন্তর বলিত— তুমি ইহার উপযুক্ত নও। কঠোর ভাবের মধ্যে পড়িয়া আমি কেবল আপনাকে আপনি বলিতাম— এ ছাড়ো, ও ছাড়ো, ছাড়ো ছাড়ো; কেবল ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করো, কেবল পরাক্রম প্রকাশ করো, অপৌত্তলিক ধর্ম প্রচার করো। শান্তিরস, কি ভক্তিরসের আশা হয় নাই; মা'র পানে তাকাইব কেমন করিয়া জানিতাম না। কেবল পিতাকে ডাকিতাম; মা'র অন্তঃপুরের দ্বার তখন খোলা হয় নাই। কেহ বলিয়াও দেয় নাই, কোন্ পথে গেলে মাকে দেখা যায়।

'জননী সমান করেন পালন' শুনিতাম কেবল রূপকজ্ঞানে। ভক্তির উচ্ছ্বাস হয় নাই; মা বলিবা মাত্র তখন প্রাণ একেবারে মাতিয়া উঠিত না; অল্পই কাঁদিতাম। হৃদয়ে তখন কবিত্বের অভাব ছিল। অবশেষে মাতৃমন্দির স্থাপন করিলাম কিরূপে, আশ্চর্য। তখন বিবেক-প্রধানই ছিলাম; সেকালে ব্রাহ্মদের সকলেই প্রায় বিবেক-প্রধান ছিলেন। এক চরিত্র পুনরুৎপন্ন হইয়া অপরের চরিত্রে প্রকাশিত হইল। পাঁচ জন, দশ জন, একশত জন যুবার মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। শ্রীমৃদঙ্গের নাম শোনা যায় নাই; শ্রীহরিকে ডাকিতে শিখি নাই; শ্রীমতী আনন্দময়ীকে দেখা হয় নাই। শ্রীনাথ, শ্রীপতি প্রভৃতি নাম তখনো ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরকে দেন নাই। তখন পিতা ব্রহ্ম ছিলেন, আনন্দময়ীর মন্দির হয় নাই। খোল বাজে নাই; একটি সংকীর্তন প্রস্তুত হয় নাই। ভিতরে যেমন এই অভাব ছিল, বাহিরেও ইহার সায় পাই নাই। অন্তরে বাহিরে কেবল বিবেকসাধন, বিশ্বাস, বৈরাগ্যসাধন— অল্প পরিমাণেই প্রেম ছিল।

মরুভূমির বালি উড়িতে লাগিল; কতদিন এরূপে চলিবে? তখন বুঝিলাম — এ তো ঠিক নয়, অনেক দিন এইরূপে কাটানো গেল, আর চলে না। মনে হইল— খোল কিনিতে হইবে। যতদিন অন্তরে তত বৈষ্ণব ভাব ছিল না, ঈশ্বর ততদিন কেবল বিবেকের ভিতর দিয়া দেখা দিতেন। ভক্তির ভাব দেখা যাইতে না যাইতে, কিরূপে ও কেমন গুপ্তভাবে একজন ভিতর হইতে রসনাকে ভক্তের ঠাকুরের দিকে টানিলেন। পরিবর্তন হইল, বুঝিলাম— যাহা না থাকে, তাহাও পাওয়া যায়। এখন এমনই ভক্তি আসিয়াছে— এখন আর বলিতে পারি না ভক্তি অধিক কি বিবেক অধিক; আনন্দ অধিক কি তপস্যা অধিক; সুখ অধিক কি কঠোর ধর্মসাধন অধিক। আমি ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া আপনাকে কঠোর শুষ্ক করিলাম না; শান্তি, আনন্দ লইয়া বিবেকের পার্শ্বে রাখিলাম। এখন তারতম্য নির্ণয় করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এখন এরূপ

ভক্তি লাভ করিয়াছি যে, মনে হয় যেন ভক্তি আমার স্বাভাবিক। প্রথমে শুষ্কভাবে কেবল পুণ্যসাধনই আরম্ভ করিয়াছিলাম। ভাবিতাম— কিসে সচ্চরিত্র হইব, কিসে ভালো ভাবে চলিব, কিসে সব ছাড়িয়া ফকিরের মতো থাকিব। ভগবানকে লইয়া আমোদ করিবার ইচ্ছা হইত না। ইতিপূর্বে ইহাও বলা হইয়াছে যে, মৌনাবলম্বন করিয়াও থাকিতে হইয়াছিল। যাহা স্বভাবে থাকে, তাহাই হয়; যাহা না থাকে, তাহা হইবার নহে— অনেক পণ্ডিতের এই প্রকার মত। উপার্জিত ধর্ম কথার কথা। যার ভক্তি নাই, তার ভক্তি হয় না; যার বিশ্বাস নাই, তার বিশ্বাস হয় না; যার ভক্তি স্বাভাবিক, তারই ভক্তির উৎকর্ষ হয়; যার ধর্মের আরম্ভ ভয়েতে, ভয়েতেই তাহার ধর্মের শেষ হয়— অনেকে এই প্রকার মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার সম্বন্ধে যদি বলিতে হয়, বলিব— আমি কাঁপিতে কাঁপিতে ধর্ম আরম্ভ করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি আনন্দে মগ্ন হইয়াছি।

আমার যেমন হইয়াছে এমন সকলেরই হয়। প্রথমে ব্রহ্মকে বিশ্বাস করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী নাম পাইয়াছিলাম; এক্ষণে ভিতরে সুখভোগ করিতেছি। প্রথমে কঠোর, পরে সুকোমল; প্রথমে পিতা, পরে মাতা। ব্রহ্মের প্রস্ফুটিত ভাব জীবনে দেখিলাম। আমার জীবনের সঙ্গে ব্রহ্ম খেলা করিতে লাগিলেন। আগে 'ব্রহ্ম' নাম একটি নাম ছিল, বস্তুটি রূপান্তর হইয়া কত নামই ধরিল। আমি যেমন আমার ব্রহ্মকে দেখিলাম— ইচ্ছা হয়, তেমনই করিয়া সকলেই দর্শন করেন। কেননা, যদি একজনের সম্বন্ধে অসাধ্য সাধন হইয়া থাকে তবে সকলের সম্বন্ধেই হইবে। শুষ্ক কঠোর ভাবের মধ্যে পড়িয়া যে কাঁদিতেছিল, সে হাসিতেছে— এ সংবাদ সকলের জানা উচিত। ঈশ্বর-জ্ঞান অল্প ছিল, বাড়িল; হাত জোড় করিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতেছিলাম— পরে দেখি, তিনিই আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। মা বলিতে শিখিলাম। মা নামের

মধ্যেও কত রূপ দেখিলাম। কত ভাবেই মাকে ডাকিলাম। কখনো শক্তির সহিত আনন্দ সংযুক্ত দেখিলাম; কখনো জ্ঞানের সহিত প্রেমের যোগ নিরীক্ষণ করিলাম। মার রূপ নানাভাবে মা দেখাইয়াছেন। আরো কতভাবের রূপই সম্মুখে আসিতেছে। কেহ যেন না বলেন, মার সব রূপ দেখিয়াছি। এই ভক্তিশাস্ত্র সম্প্রতি আমরা দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। যত ভক্ত হইব, ততই আনন্দময়ীর রূপ দেখিতে পাইব; আমাদিগের স্বাভাবিক দুর্বলতা সত্ত্বেও নানারূপ দেখিতে সক্ষম হইব। এখন উপার্জনের দিন। যাহা আমাদের ছিল, তাহার উৎকর্ষ হইয়াছে; যাহা নাই, এ সময় তাহাই আনিতে হইবে। অদ্যকার উপদেশ যেন এই বিষয়েই ফলপ্রদ হয়।

আমার যাহা ছিল না, তাহা হইয়াছে। এক সময়ে ভক্তিভাব ছিল না। গান করা আমার পক্ষে এক সময়ে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। দশজনের সমক্ষে যে আমি গান করিতে পারিব, ইহা আমার মনেই হইত না; কখনো যে ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকিব, জানিতাম না। এখন মনে হইতেছে— মাকে দেখিয়া বুঝি একেবারে পাগল হইয়া যাই। যে আমার মাকে মা বলিয়া ডাকিতে পারে নাই, তার ব্রহ্মদর্শন ভালো হয় নাই। যে আমার মাকে না দেখিয়াছে, তার যে কিছুই হয় নাই। সকলের বাড়িতেই এই মা যাবেন। এখন জোর করিয়া বলিতে পারি, ভারতে লক্ষ লক্ষ লোক আছে, এই সকল লোকের বাড়িতে মা নিশ্চয়ই গমন করিবেন। এক স্থানে যাহা ঘটিয়াছে, অপর স্থানে তাহা ঘটিবেই। প্রেম নাই? ইংরাজি পুস্তক পড়িয়া সকলের মন শুষ্ক হইয়াছে? প্রেম হইবে না? তা তো নয়; আমার যখন দুর্দিন গিয়াছে, তখন তোমাদেরও যাইবে। সুদিন আসিবেই আসিবে; অভক্তেরও আশা আছে। আমার আশা ভক্তি আরো বাড়ুক। আমি অল্প পাগল হইয়াছি, আরো পাগল হই। এমন পাগলের ভাব, ভক্তির ভাব আমার হউক, যাহাতে পৃথিবী আরো গালাগালি দেয়, এমন সকল আশ্চর্য ভাব শীঘ্র বর্ধিত

হউক। সেই সমস্ত লইয়া জীবনটা কাটাইয়া যাইতে পারিলে বাঁচি।

এত শুষ্কতার পর এত ভক্তি আসিল? এমন মাকে আমি দেখিলাম? এমন ভক্ত আছেন, যখন আমার মনে ভক্তি হয় নাই, তখন তাঁদের মনে ভক্তি দেখা দিয়াছিল। তাঁরা কেন মৃদঙ্গ আনিলেন না? তাঁরা কেন সংকীর্তন প্রথম করিলেন না? মার মন্দির তাঁরা কেন প্রকাশ করিলেন না? যদি একজন অভক্ত মাকে দেখিয়া নাচে, কীর্তন করে, তাহা হইলে চড়াৎ করিয়া লোকের হৃদয়ে শুভ-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা আসিবে। লোকে বলিবে – "কী! এ লোক ভক্তির কথা বলে! এ যে বিবেক লইয়া দেশে দেশে বেড়াইত; এ তো ভক্তিমার্গ ধরে নাই। এ কেন বাজাইতেছে? তবে বুঝি, হরি আসিতেছেন। 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং' এই কথা বুঝি প্রমাণিত হইবে।" এই বলিয়া সবাই ভক্তির পথ ধরিবে বলিয়াই ইহা হইল। আমি ভক্তিতে ডুবিয়া বুঝিলাম— ঈশ্বরের খেলা। প্রাচীন ভক্তেরা তো একটু ইশারা করিতেও পারিতেন; আমাকে কেহ কিছু বলিলেন না। 'হে ঈশ্বর, রক্ষা করো, রক্ষা করো: হে ভগবান্, বাঁচাও'— এই বলিয়া বলিয়া দিন যাইতেছে; শীঘ্র ভক্তির পথ আনো, এ কথা তো কেহই বলিলেন না। কেবল একজন বলিলেন; যাঁর বলিবার, তিনি বলিলেন। সাহারার মধ্যে কমল ফুটিল। পাথরের উপর প্রেমফুল প্রস্ফুটিত হইল। সকলই হইতে পারে প্রার্থনার বলে। যা কিছু অভাব, সকলই মোচন হয়। এখন জল স্থল আমার উভয়ই আছে। বিশ্বাস-হিমালয় আছে, ভক্তি-সরোবর আছে। যেমন বৈরাগ্য, তেমনই প্রেম। মা আমার এক হাতে বৈরাগ্য খাওয়ান, অপর হাতে প্রেম খাওয়ান; দুই হাতে কেবলই খাওয়াইতেছেন। শ্রীহরি মহীয়ান্ হইলেন; ভক্তি-সরোবর বৃদ্ধি করিয়া দিয়া সুখ ও আনন্দ বৃদ্ধি করিলেন।

হে দীনশরণ, হে কৃপাসিন্ধু! অপার তোমার প্রেম; অদ্ভুত তোমার করুণার লীলা! কী রূপেই আমি প্রথমে তোমাকে

দেখিয়াছিলাম। কী ভয়ানক রূপ দেখিয়াছিলাম, আর কী সুখের কুসুম হৃদয়-সরোবরে এখন ভাসিতেছে। কেমন করিয়া তুমি এমন সুন্দর রূপ দেখাইলে? কোথায় ছিল এরূপ লুকাইয়া? কোন্ পথ দিয়া এলে? ভাইদের কাছে আশার সংবাদ দিলাম; এখন যাহাতে তাঁহারা এই আনন্দ লাভ করিতে পারেন— তাহাই করো। কোন্ পথ ধরিয়া শুষ্ক বালুকার মধ্য দিয়া, কোন্ পাহাড়ের ধার দিয়া এই ভক্তি-সরোবরের তীরে আসিলাম, দিক্ নির্ণয় করিয়া আসি নাই; গ্রামের পরিচয় লই নাই। তাই কাহাকেও বলিতে পারিতেছি না— এই পথে চলো, ভক্তি হইবে; মৃদঙ্গ বাজাও, কি ঐ পথ ধরো, নৃত্য করিতে পারিবে। কিছুই স্মরণ নাই, বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই। কেবল স্মরণ আছে, এক সময়ে ছিল না, এখন হইয়াছে। এক সময়ে তোমায় মা বলিতে পারিতাম না, এখন বলি, এমন মা কোথায় তুমি লুকাইয়াছিলে? মা, তোমার ভক্তদের যদি কেহ অসুখী থাকেন, সে এইজন্য— আমার মা যে তুমি, তোমাকে দেখেন নাই। তোমাকে দেখিলে দুঃখের রজনী শেষ হইবে। কে কে আমার আনন্দময়ী মাকে দেখিয়াছেন? যিনি দেখিয়াছেন, তাঁকে আমি আমার সখা বলি, আলিঙ্গন করি; তিনি আমার বন্ধু হন; তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মা, এমন বন্ধু কাছে আনিয়া দাও। ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া ভান করিলে কী হইবে? এখন তিন জনে মিলে না; পাঁচ জনে মিল হয় না। এমন মাকে যদি সকলে গ্রহণ করেন, গভীর প্রেমের মিলন হইবে। আর সম্প্রদায়-ভেদ, বর্ণভেদ, থাকিবে না। এক মাকে দেখিলে কখনোই বিবাদ হইবে না; কখনোই বিচ্ছেদ হইবে না। আমি যাঁকে মা বলি, আর-একজন তাঁকে মা বলেন না; আমি যাঁকে পরিত্রাতা বলি, আর-একজন তাঁর নিকট পরিত্রাণ অন্বেষণ করেন না— এইজন্য এত বিবাদ, এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা। হরি হে! তুমি কখনো বিবাদ কর না। নৃত্যকারীদের ভিতর বিবাদ হয় না। মা থাকিতে কি বিবাদ হয়? করুণাময়ী, সে রাজ্যে কি বিবাদ হয়, যে রাজ্যে নৃত্য? কবে

সে নৃত্যের দিন আসিবে? আশার কথা বলিলাম; বন্ধুগণ শুনিয়া সাধন করিবেন কি না, বলিতে পারি না। যতদিন না মা, তোমার দেখা হয়, ততদিন চার, ছয়, দশ সম্প্রদায় হইবেই হইবে। কিন্তু জানি, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে এমন দিন আসিবে, যে দিন আর সম্প্রদায় থাকিতে পারিবে না। কঠোর চিন্তা; ততদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। গতিহীনকে দয়া করিয়া এই বর দিবে না কি, যে কয়টি ভাই-ভগ্নী নববিধানে আমরা তোমার পূজা করিতে উদ্যোগ করিয়াছি, মা আনন্দময়ী, আমরা যেন তোমারই পূজা করি, আর কাহারো না। আমি যে শুকনো পাতা কুড়াইয়ে মরিতাম, আমার কী হইল! আহা! মা! ভক্তিতে মাতিলাম। খুব মাতাও; ভারত মাতিবে, পৃথিবী মাতিবে। ভক্তিতে দেশ টল্‌মল্ করিতেছে দেখিয়া মরিব। পৌত্তলিকতা যাইতেছে কি ব্রহ্মজ্ঞানী দল বাড়িতেছে, এ দেখিয়া তত সুখ হয় না। 'ঐ মাকে ডাকছে' — এই কথা শুনিলে বড়ো সুখ হয়। আশা হয়, মাকে ডাকিয়া নবনৃত্যে সকলে যোগ দিবে। আমরা কয়টি ভাই কী ছিলাম, কী হইলাম! লোকলজ্জা বিসর্জন দিলাম; চঞ্চলা ভক্তি, প্রগল্‌ভা ভক্তি, জঙ্গুলে ভক্তি, মাতানে ভক্তি আজ হইয়াছে। কাল কী হইবে, তাহা জানি না। যেমন নৃত্য, তেমনই নাটক। পরে কী হইবে, কেহই বলিতে পারে না। মা, একজনের দিকে সকলের দৃষ্টি হোক। পাঁচটি হরি চাই না। সাতরো হাজার ঈশ্বর, চল্লিশ হাজার ব্রহ্ম পূজা করিলে জগতের সুখ হইবে না। একটি জননী তুমি মাঝখানে দাঁড়াও। সমস্ত ভারত তোমার চারি দিকে নাচুক। দয়াসিন্ধু, যেন আমরা প্রগল্‌ভা ভক্তিতে নাচিয়া নাচিয়া প্রমত্ত হই; অনাথনাথ, একবার দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ করো।

(রবিবার, ২৬ ভাদ্র, ১৮০৪ শক; ১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত।)

লজ্জা ও ভয়

যদি দুর্বলতার পরিচয় দিলাম, তবে জীবনের পরস্পর-বিরোধী ভাবের কথাও বলা উচিত। এ জীবনে কী অভাব ছিল, জানাইলাম; সে অভাব তিরোহিত হইল হরি-প্রসাদে, তাহাও শুনিলে। এই জীবনে দুইটি ভাবের বিরোধ দেখিলাম, শ্রবণ করো। সেই বিরোধের সামঞ্জস্য শান্তি যথাসময়ে জীবনে সম্ভোগ করিতেছি জানিবে। এই জীবনে লজ্জা ও ভয়ের দাস হইয়া অনেক দিন থাকিতে হইয়াছে। যেমন অন্যান্য রিপু, তেমনই লজ্জা ও ভয় উপদ্রব করিতেছে, এখনো সে উপদ্রব চলিয়া যায় নাই। ইচ্ছা করিয়া, আদর করিয়া লজ্জা ও ভয়কে প্রভু বলিয়া স্বীকার করি না। সাধু সজ্জনদিগের শত্রু লজ্জা ও ভয়। যেমন সকল পাশ ছিন্ন হয়, তেমনই এ পাশও ছিন্ন হয়। সাধন অভাবে হউক, অথবা স্বাভাবিক দুর্বলতা বশতই হউক, এখনো লজ্জা ও লোকভয় আছে। চেষ্টা করিলেও এ দুই ছাড়িতে পারি না। পদে পদে এই দুয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, ইহাদের অধিকারে পড়িয়া আছি, মনে হয়। লজ্জা ভয়ের ক্ষেত্র আছে। হরি ধর্মভূমি হইতে আমার লজ্জা ও ভয়কে বিদায় করিয়া সংসারে রাখিয়াছেন। ক্রমে ধর্ম যত প্রতাপ বিস্তার করিলেন, বিবেক যতই প্রবল হইল, উপাসনা ও প্রার্থনা দ্বারা হরিভক্তি যতই বৃদ্ধি হইল—বিশ্বাস তেজ ততই বাড়িল; মনে হইল, ধর্মরাজ্যে এমন দল নাই, যাহাকে ভয় করিতে পারি। ঈশ্বর-প্রসাদে জীবনের প্রাতঃকালেই বুঝিলাম— মানুষ অসার।

যে পরিমাণে বিশ্বাস বাড়িল, ধর্ম সম্বন্ধে লজ্জা ও ভয় সেই পরিমাণে কমিল। জীবনে এখনো লজ্জা ও ভয় আছে, কিন্তু তাহা

পৃথিবীর ভূমিতে। যেখানে ঈশ্বরের আদেশ শুনিতে পাই না, কর্তব্যের হুকুম অনুভব করিতে পারি না, সেইখানে পুরাতন দুই প্রভু জীবনকে আপনাদের কাছে টানিয়া লইয়া যায়। সেইরূপ স্থলে পড়িলে সমস্ত মুখের ভাব-ভঙ্গির পরিবর্তন হয়; লোকসমাজে যাইতে বা কথা কহিতে লজ্জা বোধ হয়, ভয় হয়। এই মস্তক অনেক সময়ে সাহসে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরের নাম কীর্তন করে, কিন্তু ইহাই আবার সামান্য সামান্য মনুষ্যের কাছে নত হইয়া থাকে। বুঝি স্বাভাবিক দৌর্বল্য, লাজুক স্বভাব লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছি। যতবার লজ্জা ও ভয় দেখা দেয়, ততবারই মনে মনে কষ্ট হয়। ভয় হয় কাহাদের কাছে? রাস্তার মুটে, হীন, মূর্খ যাহাদিগকে বলে, তাহাদের কাছেও ভয় হয়। বড়ো বড়ো বিদ্বান্ দেখিলে দলে প্রবেশ করিতে সাহস হয় না; মন বলে, এত বড়ো দরবারে বিদ্বজ্জনেরা সম্মান পাইতেছেন, এমন স্থলে তুমি আসিতে পার না। জ্ঞানের বিক্রম এখানে। অন্ধকার এ স্থলে আসিবে না— ভিতরে এরূপ কোনো আদেশ শুনি না; কিন্তু স্বভাব এমনই হইয়াছে যে, বিদ্বানের সভাতে পশ্চাতে থাকিতে আপনা আপনি ইচ্ছা করে। ধনাঢ্য যাঁহারা, লোকসমাজে খুব আদর পাইয়াছেন যাঁহারা, সম্পদের শিখরে বাস করেন যাঁহারা— তাঁহাদের দলের মধ্যে পড়িলেও ঠিক এইরূপ হয়। ধন, মানের উজ্জ্বল পরিচ্ছদ দেখি যেখানে, সেখানে স্বভাব আপনা আপনি সংকুচিত হয়। এ সকল লোকদের কাছে দেখা করিতে ইচ্ছা হয় না।

ধনী, মানী ও বিদ্বান্ এই তিন প্রকার লোকের কাছে মন সহজে যাইতে পারে না, সহজে যাইতে চায় না। কর্তব্য বলে, যাও— তাই যাই; কর্তব্য বলে, বক্তৃতা করো— তাই করি। ধর্ম আদেশ করেন— তাই করিতে পারি। সে আদেশ যেখানে শুনি না, সেখানে কত আলোচনা করি, হাত অবশ হয়, পা নিস্তেজ হয়, চক্ষু আপনাকে আপনি বন্ধ করে। ঐরূপ দলের মধ্যে পড়িলে বোধ হয়, যেন এ

দলে থাকিবার জন্য আমি হই নাই। এ কোথায় আসিলাম? কথা কহিতে গেল মনে হয় যেন ব্যাকরণের ভুল হইবে। শক্তি নাই, যাই কিরূপে? শরীরের কান্তি চলিয়া যায়, মুখ মলিন হয়, মস্তক হেঁট হয়। কেবল মনে হয়— কখন সভা শেষ হইবে, কখন গরীব বন্ধুদের কাছে যাইব, কখন আপনার পরিচিত দলে গিয়া মিশিব, কখন নিজগৃহে যাইয়া স্বভাবের স্বচ্ছন্দতা পাইব। লজ্জা কষ্ট দেয়। ভাবি— এরাও মানুষ, আমিও মানুষ; যদি ভুল হইল— ধন, মান, বিদ্যা আছে বলিয়া কি ক্ষমা করিবেন না? প্রাণবধ করিতে কি পারেন? অপমান কি করিবেন? গলায় হাত দিয়া কেহ কি তাড়াইয়া দিবেন? কেহ হয়তো তাড়াইয়া দিতেও পারেন। যদি বিদ্বানেরা বলে— তোমার পড়াশুনা তেমন হয় নাই, বিদ্বান্ সহবাসের তুমি উপযুক্ত নও; তুমি ধর্মের উপদেশ দিতে পার কিন্তু যেখানে জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুর আদর নাই সেখানে আসিতে তোমার অধিকার নাই। এমন সকল স্থানে যাই নাই, অথবা কম গিয়াছি— তাহা নয়। পাঁচবার গিয়াছি, পাঁচবারই সম্ভ্রম পাইয়াছি; এবার হয়তো ভুল হইবে। বড়ো লজ্জা, ভারি ভয়। এত ভয়, যেন জীবন সংশয় বোধ হয়।

যদি লোক সঙ্গে না থাকে, একাকী বাড়িতে বসিয়া থাকিতে সাহস হয় না। একলা দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইব, এরূপ চিন্তা করা উচিত মনে হয় না। কোনো কাজ করিতে গেলে পাঁচজনের সঙ্গে করিতে চাই। কোথাও যাইতে হইলে দশজনের সঙ্গে যাইতে চাই। সংসারে একাকী যাইয়ো না, ধনী, মানীদের দলে একলা যাইয়ো না— কে এই কথা বলে? কে বলে?— ব্রহ্মবাণী? না, স্বভাব বলে। স্বভাব বলে, এরূপ প্রকৃতির লোক একাকী কোথাও যাইবে না; একাকী কোথাও যাওয়া এ প্রকার লোকের উচিত নয়। স্বভাব তো ইহা চায় না; যেখানে আপনার লোক, সেইখানেই থাকিতে চায়। বিদেশে কি স্বদেশে একাকী পড়িলে আপনাকে অসহায় নিরাশ্রয়

মনে হয়। বন্ধু-বান্ধবদের অবস্থা দেখিয়াছি, কত স্থানে একাকী যান, অন্ধকারের মধ্যেও গমন করেন; কিন্তু এই ব্যক্তি ধর্মসাহস এত পাইয়াও কোনো বিপদের মধ্যে পড়িলে ভয় করে, একাকী যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে বিশ্বাস করে, তার কী ভয়? এখানে যে পৃথিবীর শূন্য ভূমি, এ-সকল স্থানে ব্যাঘ্রের সম্মুখে ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় ভীত হইতে হয়। এখানে যে আক্রমণকারী শত্রু চারি দিকে। মন তাই ভীত। যেখানকার বিষয়ে ধর্মকথা নাই, ধর্মসংস্রব নাই—সেখানেই লজ্জা, সেখানেই ভয়। উপাসনার সহিত যেখানকার সংস্রব আছে, সেখানে দশগুণ অধিক ভয়ের কারণ থাকিলেও ভয় চলিয়া যায়; কিন্তু অন্যত্র 'দূর হও লজ্জা', 'দূর হও ভয়' বলিলেও যায় না।

পাঁচজন লোক আসিতেছেন, দেখিলেই পলায়ন করিতে ইচ্ছা হয়। কেমন আছেন, বলিতে পারি না; চক্ষুর দিকে তাকাইতেও পারি না। তাঁহারা যদি প্রথমে কথা না বলেন, আরো বিপদ হয়। ইচ্ছা হয় এখনই পলাই; পাহাড়ে গিয়া লুকাইয়া থাকি। বিষয়ী বড়ো বড়ো লোক কত আসেন; ভাবি, এখান হইতে কি চলিয়া যাইতে পারি না? ভাইয়েরা বাড়িতে আসিলেও অভ্যর্থনা করিতে পারি না। কেহ কেহ অহংকারী বলিয়া চলিয়া যায়, ধর্ম হইয়াছে বলিয়া অভিমানে স্ফীত বলে; কটূক্তি করিতেও বিলম্ব করে না। যুক্তি দিলে বুঝি, অন্যায় হইতেছে; কিন্তু স্বভাব ধৌত করিলেও কিছু হয় না। এ স্বাভাবিক দৌর্বল্য বোধ হয় যাইবে না। কিছু যদি কমে, একেবারে যাইবে, বোধ হয় না। সময়ে সময়ে মনে হয়, গেলেই বা কী হইবে? বিষয়ীদের সঙ্গে তো থাকিতে পারিব না, যোগ তো হইবে না। ধর্মসম্বন্ধ ভিন্ন সম্বন্ধ চাই না। গর্বিত, দাম্ভিক, অহংকারী নাম পাইয়া বসিয়া আছি। কী করিব? চেহারা যদি দেখ, দশজনের মধ্যে যখন বসিয়া আছি, বুঝিবে—এ লোকের পলায়ন করিবার ইচ্ছা হইতেছে। বাজারের নাম

হইলেই পলাইতে ইচ্ছা হয়। সংসার আমার মুখের দিকে তাকাইলে গালের রঙ পরিবর্তিত হইয়া যায়। তাকাও সংসার, আর ভিতরের রঙ বদলাইয়া যাইবে। পাঁচটি কথা বল, আর আমি নাই; কেবল শরীর হইতে ঘর্ম নির্গত হইবে; শরীর অবসন্ন হইয়া আসিবে, বুঝি এমন হইলে আমি মারা যাইব। এমন অবস্থায়ও পড়িয়াছি—যখন মনে হইয়াছে, উপস্থিত লোকেরা চলিয়া যায় না কেন? বলিতেও পারি না। সময়ে সময়ে লোকে কত শক্ত কথাও বলিয়াছে, আমি বালকের ন্যায় বসিয়া আছি।

পাঁচজন সাহেব বা বাঙালীর সঙ্গে কথা কহিতে হইলে সঙ্গী থাকিলে ভালো হয়। লজ্জা ও ভয় যার এত, সে পৃথিবীতে পথে একাকী বেড়াইবে না। এইজন্য বিশ্বস্ত বন্ধুর সর্বদা প্রয়োজন; এ ব্যক্তি খুব বুঝিয়াছে— ধর্মরাজ্যে ঈশ্বরক্রোড়ে এবং সংসারে ধাত্রী বা বন্ধুর ক্রোড়ে না থাকিলে চলিবে না। আমার হইয়া সংসারে বন্ধু কথা কহেন, এমনই ইচ্ছা হয়। একদিকে এই লজ্জা, আর এই ভয়; কিন্তু যেখানে ধর্ম সেখানে সিংহের ন্যায় তর্জন-গর্জন। সেখানে মনুষ্যকে কোনো ভয় করি না। কখনো কোনো মনুষ্যের খাতির রাখি নাই; রাখিতে পারিবও না। আমায় ধর্ম যেখানে নির্লজ্জ হইতে বলিতেছেন সেখানে নৃত্য করিতে পারি; পৃথিবীতে করিতে গেলে, বোধ হয় দশ বৎসরের চেষ্টাতেও পারিব না। যেখানে ঈশ্বর, সেখানে এমনই নাচিব যে দশজনে হীন ছোটো লোক বলিবে; বলুক, তার জন্য প্রস্তুত। অনেক কার্য করিয়াছি, যাহাতে খুব নির্লজ্জতা প্রকাশ পাইয়াছে। একটির পর একটি করিয়া অনেক করা হইয়াছে; রাস্তা-ঘাটে সকল স্থানেই করা হইয়াছে। মা যখন বলিয়াছেন, তখন লজ্জা ও ভয় কী? এখানে লজ্জা ও ভয়কে শত্রু বলিয়া খণ্ড খণ্ড করা উচিত। দশজনের কাছে বিরুদ্ধ সত্য মত প্রচার করিতে হইলে নির্লজ্জ হইব, ভয় ত্যাগ করিব। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজা, বড়োলোক হইলেও সত্য প্রচার করিব। কিন্তু অন্যত্র

কেন ভয় হয়, জানি না। এক স্থানে সিংহ যে— অন্য স্থানে মেষ-শিশু সে। সময় বিশেষে, স্থান বিশেষে ভয়ানক লজ্জা, অত্যন্ত ভয়; সময় বিশেষে, স্থান বিশেষে ভয়ানক নির্লজ্জতা, অতিশয় সাহস।

হে দীনবন্ধু, হে অপার করুণাসিন্ধু, তুমি যাহাকে লইয়া খেলা কর তাহার চরিত্র অন্যে বুঝিতে পারে না— সে আপনিও বুঝিতে পারে না। আমি লজ্জা ও ভয়ের মধ্যে পড়িয়া একবার এদিক, একবার ওদিক দেখি। আমি পৃথিবীতে কেন এত ভয় করি? কত লোকে যে নিন্দা করিতেছে, দোষারোপ করিতেছে। এ লোকটা যে লোকের কাছে ভয়ানক অহংকারী বলিয়া পরিগণিত হইল। তোমার আশ্রিতের মান-সম্ভ্রম কি রাখিবে না? তোমাকে যে বিশ্বাস করে, সে অহংকারী হইল? তুমি জানিতেছ— অহংকার অভিমান নয়, লজ্জাশীলতা। পৃথিবীর লোকের মধ্যে পড়িয়া আমি কী নাকাল হই, জান। কী যে জড়ভাব হৃদয়ে হয় তুমি জান। সে অবস্থা বর্ণনাতীত! কিছুতে কথা কহিতে পারি না; লজ্জা ভয় আসিয়া উৎপীড়ন করে। এ জীবনে এই দুইটি দুর্বলতা আছে— জানিলেন ভাই, বন্ধু। আমি পক্ষ সমর্থন করিতে আসি নাই। আমাকে ভালো বলে, বলুক; মন্দ বলে, বলুক। সে দিক লক্ষ করিয়া জীবনবেদ বলিতেছি না। আমার ভয় আছে, লজ্জা আছে। যারা হরিভক্ত, তোমাতে আসক্ত, তাঁদের কাছে লজ্জা হয় না, একটুও ভয় হয় না। যদি হয়, সেখানে তত পরিচয় হয় নাই বলিয়া। আপনার লোকের কাছে আমি সাহসী সিংহের মতো। তাদের সম্মুখে মন খুলিতে ইচ্ছা হয়। যেমন বাহিরের লোক আসে, অমনি জিহ্বা জড়ের মতন হয়। আমার চরিত্র, মা, তুমি জান; আমি সুখ্যাতি প্রশংসা চাই না। এর জন্য আমার অনিষ্ট হইতেছে, বিশ্বাস করি না। পৃথিবী ভয়ানক স্থান; পৃথিবীর বাজারে দোকানে আমি কিরূপে কার্য করিব? কর্তব্য না হইলে সে সব স্থানে যাই না। সংসারের আগুনে আমাকে

ফেলিয়ো না। তোমার পাদপদ্ম লাগে ভালো, আর গুটিকতক তোমার অনুগত বন্ধু-বান্ধব লাগে ভালো। প্রচারক করিয়াছ, হাজার হাজার লোকের সঙ্গে কারবার করিতে হয়। বলিদানের ছাগলের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে আমি যেখানে-সেখানে গমন করি। এ লোক দক্ষ নয়, নিপুণ নয়, তুমি জান। প্রতাপ তোমারই— মহিমা তোমারই। এমন লাজুক লোককে নৃত্যে প্রবৃত্ত করিয়াছ, ধর্মে সাহসী করিয়াছ। স্বভাব যার লাজুক, ভীত, সেও ভীমরবে ব্রহ্মনাম কীর্তন করিতেছে। মা! লজ্জাহীনকে লজ্জা দিতে পার, আর যার লজ্জা আছে, তার লজ্জা দূর করিতে পার; পৃথিবীর বলীকে তুমি দুর্বল করিতে পার, দুর্বলকে বলী করিয়া তার হুংকারে অপরকে ভীত করিতে পার। এ গরীবকে কী করিলে? লাজুকের ধর্মে লজ্জা গেল, এ যে এক আশার কথা। তাই হাত যোড় করিয়া মিনতি করি— সকলের খুব সাহস বাড়ুক। ধর্মের খাতিরে যেন লজ্জা না হয়। ধর্মের জন্য বেহায়া হওয়া চাই। সময় আসিয়াছে, পথে পথে প্রগল্ভ ভক্তির খাতিরে সম্পূর্ণরূপে নির্লজ্জ হইয়া বেড়াইব। আজকাল যে শুভ সময় আসিয়াছে, এখন যদি ভয় করি নববিধান মাটি হইবে। নাচিতে বসিয়াছি, এখন মাথার কাপড় টানিব না। লজ্জার খাতিরে আদেশ পালন করিতে থামিব না। একেবারে মান-অপমানের মধ্যে স্থির থাকিয়া শ্রীপাদপদ্ম সাধন করিব। লোকে নির্লজ্জ বলিবে, হীন বলিয়া ঘৃণা করিবে; যে সুখ পাইতেছি, তাহাতে মানুষের মুখ চাহিয়া ভীত হইব, মনে হয় না। পৃথিবীতে বালকের ন্যায় অসহায় থাকিতে পারি, কিন্তু ধর্মরাজ্যে সিংহের ন্যায় হইব। হে মাতঃ, হে জননি! ধর্মরাজ্যে মুকুট পরাইয়া দাও। থাকে প্রাণ, যায় প্রাণ, তোমার নামকে জয়ী করিতে হইবে। আশীর্বাদ করো, ভক্তিতে নির্লজ্জ হইব; বিশ্বাসে সাহসী হইব। অন্যত্র লজ্জা ভয়ের জন্য তত ভাবি না। করুণাময়ী, করুণা করিয়া এই আশীর্বাদ কর যেন ভক্তিতে বিশ্বাসে

নির্লজ্জ ও সাহসী হইয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই। মা, কৃপা করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ করো।

(রবিবার, ২ আশ্বিন, ১৮০৪ শক, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত।)

যোগের সঞ্চার

ভক্তি যেমন আমার পক্ষে উপার্জিত বস্তু, যোগও তদ্রূপ। ধর্ম-জীবনের আরম্ভকালে যোগী ছিলাম না; যোগের নাম শুনিতাম না; যোগ কথা জানিতাম না; যোগের লক্ষণ নিষ্পন্ন করিতে পারিতাম না; যোগের পথে কখনো যে চলিতে হইবে, এ চিন্তাও করি নাই। খুব পুণ্যবান্ হইব, সচ্চরিত্র হইব, ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য সম্পন্ন করিব— ইহাই ধর্ম বলিয়া জানিতাম, কর্তব্য বলিয়া বুঝিতাম। যোগী হইব কেন? যোগী কে? এ-সকল চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইতাম না; ওদিকেই যাইতাম না। যোগের কথা তখন ব্রাহ্মসমাজে উঠে নাই; যোগ সাধন ব্রাহ্মের কর্তব্য— কোনো পুস্তকে দেখিতে পাই নাই। দশ-পনেরো বৎসর সত্য, প্রেম, বৈরাগ্য সাধন করিতে লাগিলাম; ইহাতেই অনেক সময় অতিবাহিত হইল। ঈশ্বর-প্রসাদে অবশেষে আমার হৃদয়ে ভক্তি সঞ্চার হইল। ক্রমে ভক্তি প্রমত্ততায় পরিণত হইল। ভক্তি যখন বাড়িতে লাগিল তখন বুঝিলাম— ভক্তিকে স্থায়ী করিবার জন্য যোগ আবশ্যক। ক্ষণস্থায়ী প্রমত্ততা জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু যোগ ব্যতীত তাহা চিরকাল থাকিবে না। ঈশ্বরে যদি বিশ্বাস থাকে, তবে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হওয়া আবশ্যক। দুই থাকিবে কেন? হৃদয় যেমন ভক্তের হৃদয়, নয়নটা তেমনই যোগীর নয়ন হইবে। ভক্তি ও যোগ উভয়ের প্রতিই আমার দৃষ্টি পড়িল; সাধনে প্রয়াস জন্মিল। মনে হইল— ভক্তি, যোগ ব্যতীত ব্রাহ্মজীবন কোনো কার্যেরই নয়।

ভক্তির রঙ দেখাইবা মাত্র শত সহস্র লোক সেই রঙে অনু-রঞ্জিত হইল; ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির রঙ বিস্তৃত হইল। ভক্তির লাল রঙ যখন আমার হইল, তখন ভাই-বন্ধুরাও খোল বাজাইয়া, সংকীর্তন করিয়া, প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে ভাবে গদগদ হইলেন।

ভক্তি তাঁহাদের খুব হইল। যোগ তত শীঘ্র হইল না। যোগ কিছু শক্ত, সাধন শক্ত, মন্ত্র শক্ত, নিজে বোঝাও শক্ত; আজ পর্যন্ত ইহাকে দুর্লভ বলা যায়। যাঁহারা এই দুর্লভ যোগ পাইয়াছেন তাঁহারা অপরকে ইহা দিতে পারেন না। ভক্তি এক জনের হইলে আর দশজনের হইবে। যোগ এত শীঘ্র ছড়াইয়া পড়ে না। এক শতাব্দী মধ্যে প্রায় দুই-পাঁচটি যোগীর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। আমি যোগীর পক্ষপাতী হইলাম, কিন্তু সর্বসাধারণ যোগের পক্ষপাতী হইল না। যখন আমার জীবনে অভাব অনুভূত হইল, বুঝিলাম— যদি যোগ না থাকে বিশ্বাস নিষ্ফল, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য কোনো কাজেরই নয়। ব্রহ্মের সঙ্গে এক না হইতে পারিলে মানবজন্মের সফলতা হইবে না— এই সত্য বুঝিয়া যোগের পথে পথিক হইলাম। শাস্ত্র পড়িয়া কি এ পথে আসিলাম? না। পুস্তক পড়িয়া? লোকের উপদেশ শুনিয়া? না, কিছুতেই নয়। কোনো পুস্তকে আমি তখন যোগের কথা পাই নাই।

মৃদঙ্গের আকারে ভক্তির শাস্ত্র যখন আমার নিকট আসিল, তখন মনুষ্যের কথায় ভক্তিতে আমি দীক্ষিত হই নাই। ঈশ্বরের প্রসাদবারি ভক্তির আকারে আসিল। সেইরূপ কোথা হইতে এক বায়ু প্রবাহিত হইয়া যোগকে আমার নিকট আনিল। এক দিকের বায়ু ভক্তি দিল, আর-এক দিকের বায়ু যোগ আনিল। এইরূপে স্বর্গের দুই প্রান্ত হইতে দুই বায়ু প্রবাহিত হইয়া দুই ধন আনিয়া উপস্থিত করিল। হস্তগত হইলে পর বুঝিতে পারিলাম— একে বলে ভক্তি, আর একে বলে যোগ। ভক্তি যোগকে সুমিষ্ট করে; যোগ ভক্তিকে শুদ্ধা ভক্তি করে। একটি ভাই, আর-একটি ভগিনী। একজন পরিচর্যা করিয়া ভক্তিকে বিশ্বাস-ভূমিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিল, আর-একজন পরিচারিকা হইয়া যোগকে সরস করিল। যোগ হয়তো অদ্বৈতবাদে লইয়া ফেলিত; ভক্তি হয়তো কুসংস্কার উৎপন্ন করিত। কিন্তু যোগের পাহাড়ে ভক্তির বাগান হইল। সে

বাগান স্বপ্নের বাগান নয়, কল্পনার বাগান নয়; কেননা, সুদৃঢ় পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। যোগে যোগে মহাযোগ হইল; মহাযোগের ফল হইল। এদেশে আপনাকে সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিলাম; কেননা, অনেকে কঠোর যোগের মধ্যে পড়িয়া ভয়ানক অদ্বৈতবাদ-সাগরে পড়িয়া গিয়াছেন; ভক্তির উচ্ছ্বাসে মাতিয়া অনেকে কুসংস্কারে পতিত হইয়াছেন। আমি দুই দিকই বাঁধিলাম। আমার ভক্তি যোগকে অবলম্বন করিয়া থাকিত।

যোগে নয়ন পরিষ্কৃত হইল; ভক্তিতে হৃদয় উচ্ছলিত হইল। এক চক্ষু যোগের, আর-এক চক্ষু ভক্তির। ঈশ্বর আমাকে সৌভাগ্যশালী করিলেন। দুই চক্ষু একেবারে উন্মীলিত করিয়া এক চক্ষে যোগেশ্বরকে দেখিলাম, আর-এক চক্ষে ভক্তির ঈশ্বরকে দর্শন করিলাম। কাঠের ভিতরে, ফলের ভিতরে, ফুলের ভিতরে, চন্দ্র-সূর্যের মধ্যে, বায়ু-অগ্নির মধ্যে, জলের মধ্যে সার ব্রহ্ম বস্তুকে দেখিলাম; আর-এক চক্ষুতে কাঠ আগুনের ভিতরে যাঁহাকে দেখিয়াছিলাম— তিনিই যে হরি, অতিশয় সুন্দর ঠাকুর তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। যাঁর আরম্ভ সত্য, তিনিই সুন্দর। সত্য শিব সুন্দর যিনি, তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দ হইত, এই দর্শনে জীবনে পবিত্রতার সঞ্চার হইত। দুই একত্র থাকাতে অনেক পাপ অপরাধ হইতে রক্ষা পাইতাম। আগে যেখানে কাঠ মৃত্তিকা দেখিতাম, এখন আর শুদ্ধ তাহা দেখি না। অধিক সাধন করি নাই; চক্ষু খুলিয়া সাধন করিলাম; তাকাইলাম চারি দিকে; দেখিলাম— প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ঈশ্বর বাস করিতেছেন। জলের ভিতরে ব্রহ্ম; পর্বত মধ্যে, পাহাড়ে ব্রহ্ম; জল দেখিলাম— স্পষ্ট ব্রহ্ম ভাসিতেছেন, ডুবিতেছেন, দেখিতে পাই। ফুলের পাপড়ির মধ্যে ব্রহ্ম চুপ করিয়া বসিয়া আছেন; ফুলে ফলে ব্রহ্মকে দেখিতে পাওয়া যায়। ঝোপের দিকে যেমনই তাকাইলাম, গা কাঁপিয়া উঠিল। দেখিলাম- আমার দিকে ব্রহ্ম দেখিতেছেন, আমাকে

ডাকিতেছেন। নিকটে গেলাম; আবার বলিলেন, 'আয়, কাছে আয়।' খুব নিকটস্থ হইলাম; বলিলাম— ব্রহ্ম পাইয়াছি; যোগ হইল।

যোগ কী? অন্তরাত্মার সঙ্গে এমনই সংযোগ যে, প্রতি বস্তু দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তৎসঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের দর্শনলাভ। কাঠ আর কাঠ মনে হইবে না; আকাশ আর আকাশ থাকিবে না। আকাশে চিদাকাশ দেখা যাইবে। সর্বত্র এক জ্ঞান ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, এক ভক্তি টন্‌টন্ করিতেছে— ইহা অনুভব হইবে। জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রভা আকাশময় বিস্তৃত রহিয়াছে; আনন্দ প্রেম ব্যাপ্ত হইয়া চারি দিক শীতল করিতেছে, জীবকে শান্তি দিতেছে। এ-সকল ভাব জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা হয় না। এ কি হুকুমে হয়? সাধনে হয়, ঈশ্বরকৃপায় হয়। এইটি আমার পক্ষে আগে ছিল না। উপাসনা, প্রার্থনা করিতাম। পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য, পাপ-শৃঙ্খল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য পতিতপাবনের শরণাপন্ন হইতাম; যোগ সাধন করিতাম না। জ্বলন্ত আগুনের ন্যায় চারি দিকে ব্রহ্মাগ্নি ফট্‌ফট্ করিতেছে, হুহু করিয়া বাতাসের ন্যায় ব্রহ্ম আসিয়া গায়ে লাগিতেছেন— এ-সকল কখনো মনে হইত না। ক্রমে হইল যখন, তখন আর ছাড়িব কেন? এই যে নিকটে ব্রহ্ম; আরো নিকটে যাই। এক হাত দূরে গিয়া দেখিতে হয়— নিকটে বসিয়া আছি, দেখিব। এইরূপ করিয়া ক্রমে যোগ গাঢ়তর হইল। যোগেরও পরিমাণ আছে। পাঁচ মিনিট যোগ, পলকে যোগ, ঘণ্টায় যোগ, যতবার চাই ততবার যোগ। এই যোগের জন্য গুরু বিনা, উপদেশ বিনা চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ছাড়া হইবে না— চক্ষু যতদিন থাকিবে ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে; যত শব্দ শুনিব তার মধ্যে ব্রহ্মের শব্দ শুনিব; তাহাই হইল। এখন মনে হয়, আগে অযোগী ছিলাম কিরূপে? ব্রহ্ম-বিদ্যুৎ চড়াৎ করিয়া সম্মুখে প্রকাশিত হইতেছে; ভিতরে চিক্‌মিক্ করিতেছে। ইচ্ছা করিলেই ব্রহ্মকে

দেখা যায়। চকমকি ঠুকিলে যেমন আগুন বাহির হয়, তেমনই পলকের মধ্যে শরীরে, হাতে, অঙ্গুলিতে রসনায় ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। ব্রহ্ম এসো, এই হস্তের অঙ্গুলিতে দেখা দাও, অমনিই ব্রহ্ম-জ্যোতি দেখা গেল। এই এখানে এসো, আসিলেন। পরীক্ষা করিয়া কতরূপে ব্রহ্মকে দেখিলাম, ব্রহ্ম উত্তীর্ণ হইয়া দেখা দিলেন।

এই যোগ ভক্তি ছাড়া কি হইতে পারে? ভক্তিপূর্ণ যোগ, মিষ্ট যোগ; ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। একতারা লইয়া সাধন করিলাম, যোগে মগ্ন হইয়া গান করিলাম, সেই গানের ভিতরে ভক্তি প্রবল হইয়া সুখ দিল। সুখে হরিপাদপদ্ম ধরিলাম। বুঝিলাম—কেবল ভক্তির ব্রহ্ম নয়, যোগের ব্রহ্ম, ভক্তির ব্রহ্ম। একেবারে ভক্তি, যোগ মিলাইয়া সাধন করিলাম। জীবনযন্ত্রে এক সুর বাজিতে লাগিল। এইটি ভক্তির সুর, যোগেরও সুর। এই দুই এক হইলে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। দেখ, কী ছিলাম, কী হইলাম! পর্বতে গিয়া গুরু অন্বেষণ করি নাই, এজন্য পুস্তক পড়ি নাই, নিশ্বাস অবরোধ করি নাই। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—যৌবনে যোগী হইব, ভক্ত হইব। ঈশ্বরের প্রতি যে বিশ্বাস ছিল, তাহারই অঙ্কুর হইতে যোগ হইল; যে অল্প প্রেমের ভাব জীবনে ছিল, তাহাই প্রগল্‌ভা ভক্তির আকার ধরিল। আগে শুষ্ক ছিলাম। কর্ম আর নানা অনুষ্ঠান করিয়া দিন কাটাইতাম; ক্রমে যোগতত্ত্ব শিখিলাম। আগে চক্ষু বন্ধ করিলে অন্ধকার দেখিতাম; ক্রমে বুঝিলাম—নির্জনেও সহজ হওয়া যায়, অন্ধকারেও আলো দেখা যায়। কাঠের ভিতর হইতে ব্রহ্মকে বাহির করা যায়, জলে আকাশে তাঁহাকে দেখা যায়। এসো বলিয়া ডাকিয়া প্রার্থনা করিবামাত্র ব্রহ্ম দেখা দিবেন।

শত শত ভক্ত আছেন যাঁহারা হয়তো আমার পূর্বেকার কষ্টের ন্যায় কষ্ট পাইতেছেন। এমন হয়তো অনেকে আছেন যাঁহারা বলেন— জলে আগুনে কেমন করিয়া ব্রহ্মকে দেখিব? এ যে অদ্বৈতবাদ হল। ব্রহ্মকে ইয়ার ভাবিয়া হাফেজের ন্যায়—কি হে,

এত কাছে রহিয়াছ, ফুলের ভিতর রহিয়াছ, বুকের ভিতর রহিয়াছ— এরূপ কথা বলা যায় ? প্রত্যক্ষ দেখা হইয়াছে। এখন আমি আছি কি না, এ বিষয়ে পাঁচজনের সন্দেহ হইতে পারে ? কিন্তু ঈশ্বরবিশ্বাসে সন্দেহ হইতে পারে না। আমার সঙ্গে ঈশ্বর এখন একত্র গাঁথা রহিয়াছেন। ঈশ্বরকে দেখ নাই ? আর প্রমাণ দিতে হইবে না। আমাকে দেখিলেই হইবে। এক পদার্থে দুইটি পদার্থ মিলিয়াছে। একটি অস্বীকার করিয়া আর-একটি স্বীকার করা যায় না। তোমরাও যোগ শিখিবে। আশার সংবাদ দিলাম। ব্রহ্মকে স্পষ্ট বস্তুর ন্যায় দেখিবে। বইয়ের ঈশ্বরকে আমরা ধরি না; চক্ষুতে দেখি, তবে মানি। মানিয়ো না, ভাই, বন্ধু— কল্পনার ঈশ্বরকে ; শূন্যের ঈশ্বরকে মানিয়ো না। যোগী হও, ভক্ত হও— অভাব মোচন হইবে। আমি ছিলাম খুব কর্মী, এখন যোগের পাহাড়ে উঠিয়া বাগানে বেড়াইতেছি। এখন আর বুঝিতে পারি না, আমার জীবনে যোগ অধিক, না কর্ম অধিক ? বিবেকের প্রভাব অধিক, না মৃদঙ্গ বাজাইয়া ভক্তিতে আনন্দ করা অধিক ? ষোলো আনা যদি আমার ভক্তি থাকে, তবে ষোলো আনা যোগ আছে। দুই আনা যদি যোগ থাকে, তবে দুই আনা কর্মও আছে। ভক্ত হইয়াছি বলিয়া যোগসাধনে আলস্য করিতে পারি না। এ জীবনে যোগ ভক্তি একত্র হইল। এত নীচ ভক্ত যোগের শিখরে ভক্তির বাগানে বেড়াইতেছে। হে ভক্তবন্ধুগণ, এত নিকৃষ্ট জীবন তোমাদের নয়। আমি নীচ হইয়া এত ধন পাইলাম, তোমরা ধনাঢ্য হইয়া যোগ ভক্তির আনন্দ লাভ করিবে, তাহা বিচিত্র নয়। আশা দিতেছি, উৎসাহ দিতেছি— ব্রহ্মপাদপদ্ম ধরিয়া যোগী হও, ভক্ত হও।

হে দীনবন্ধু, হে যোগেশ্বর, এ জীবনে দেখিলাম, অভাব থাকে বটে, কিন্তু মোচন হইয়া যায়। কে জানিত, ইংরাজি বিদ্যালয়ে পড়িয়া, ইংরাজি মতো শিখিয়া যোগী হইতে হইবে। কিন্তু নাথ,

তোমার পথে আসিয়া যোগী হইতে হইল। আমি যে স্বপ্নেও যোগ ভাবিতাম না; যোগের কথা জানিতাম না। যখন আসিলাম ব্রাহ্মসমাজে কে ধাক্কা দিয়া বলিল— 'যা', হরির সঙ্গে যোগ সাধন কর্।' হে পরম পিতা, বারবার এইরূপ ধাক্কা খাইয়া, সংসার-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম— কী চমৎকার রাজ্য! যেমন শহর ঘর বাড়ি দেখি বাহিরে, তেমনই অন্তরেও দেখিলাম। এখানেও তো খুব আনন্দ। তবে কেন মানুষ যোগী হয় না? যদি লোকের উপদেশ শুনিতাম, হয়তো নিশ্বাস অবরোধ করিতে বলিত, কৃত্রিম যোগপথ ধরিতাম। কিন্তু মা, তুমি নাকি সুখী করিবে, তাই ভ্রম হইতে বাঁচাইলে। বাঁচিলাম; সহজে যোগের পথ ধরিলাম। নিশ্বাস-যোগ যেমন সহজ, তোমায় দেখা তেমনই বুঝিলাম। প্রকাণ্ড পর্বতে, অসীম সুবিস্তৃত আকাশ-মধ্যে তোমাকে পদার্থের ন্যায় স্পষ্ট দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। বলিলাম— হে চক্ষু, ব্রহ্মকে না দেখিয়া নাস্তিক হইয়ো না; কর্ণ— 'আমি আছি, আমি আছি' এ শব্দ শুনিয়ো, ব্রহ্মের নানা বিচিত্র কথা শুনিয়ো। এইরূপ দেখিয়া সাধন আরম্ভ করিয়াছি। কয়দিনই বা সাধন করিলাম? শীঘ্রই সকল বস্তুতে তোমাকে দেখিয়াছি। ভারতে ইংরাজি শিখিয়া একজন যুবক যোগী হইল বিশ্বাস হয় না। কিন্তু দেখিলাম— সভ্যতার ভিতরে যোগ জন্মিল; প্রেম ভক্তির মধ্যে যোগ হইল। যে হরিকে দেখা যায়— ন্যায়-শাস্ত্রের বিচারে তাঁহাকে সিদ্ধান্ত করিলাম, মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে সেই হরিকে পরীক্ষা করিলাম। হরি, তুমি সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে। আত্মন্, জয়ধ্বনি কর; রসনা জয়ধ্বনি কর; আমার ব্রহ্ম পরীক্ষোত্তীর্ণ। গাছ আকাশ দেখিয়া দেখিয়া আস্তিক যে, সে হয়তো নাস্তিক হইবে; কিন্তু আমার ব্রহ্ম আমাকে বর দিলেন— 'যত প্রকারে আমার পরীক্ষা করিবি কর্। আমি তোরই; তুই আমারই। আমাকে তোর হাতে দিয়াছি, যাচাই কর্, বড়ো বাজারে

লইয়া যা, আগুনে ফেল্, জলে ফেলিয়া রাখ্, পুস্তকের সঙ্গে মিলাইয়া দেখ্, পরীক্ষা কর্।' পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—হরি আমার সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তখন বুঝিলাম—হরি, তুমি কখনোই মিথ্যা নও। বিদ্যুতের ন্যায় চক্‌চক্ করিতেছ, চড়াৎ চড়াৎ করিতেছ। ব্রহ্ম বস্তুকে কে দেখিয়াছে? হিমালয়, তুমি আমার ব্রহ্মের সাক্ষী হও; আকাশ, তুমি পুষ্প বর্ষণ করো। হে সত্য, হে জ্বলন্ত ঈশ্বর! আমি তোমায় দেখিয়াছি—তুমি কথা কও, কথা কও। আমি নাস্তিকের ঈশ্বর মানি না। বাল্যকাল হইতে আমি তোমায় মানিতেছি। পর্বত অপেক্ষাও তুমি সত্য, তোমাকে জড়াইয়া ধরা যায়। তোমাকে অগ্নির মতো দেখা যায়। প্যাসিফিক মহাসাগর পার হওয়া যায়, তোমাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারিবে না। ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ব্রহ্ম — আমি যোগী, আমি তোমাকে দেখিতেছি। এখন প্রাণ আমার তোমাতে ডুবিয়াছে। কথা কও; ধরা দাও প্রত্যেককে। নাস্তিকের ঈশ্বর, দূর হইয়া যা; কল্পনার ঈশ্বর দূর হ; স্বপ্নের ঈশ্বর, দূর হ: তোকে মানি না। কল্পনার ঈশ্বরকে ফুঁ দিলে উড়িয়া যায়। পরীক্ষায় দাঁড়াইতে পারে না। এসো, আমার ঈশ্বর, তুমি এসো। ভগবান্, এসো; জ্বলন্ত আগুন, এসো; ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতে থাকো। পলকের মধ্যে ভারতের কোটি কোটি লোককে বিশ্বাসী করো। ভাই বন্ধুরা কাঁদিতেছেন, দেখা দাও। নিরাকার পূজা যদি ধরাইয়াছ, তবে শীঘ্র দেখা দাও। দেখিয়া সকলে আস্তিক হইবেন। আমি আস্তিককে বড়ো করিব, আস্তিককে ব্রহ্মপুত্র বলিব। যিনি বলিলেন—এই যে আমার ঈশ্বর, তাঁহাকেই আমি সার্থক-জন্ম বলিব। কেমন সহজ ঈশ্বর-দর্শন! এমন বিশ্বাস না হইলে মজা কী? এমন যদি না হইবে, তবে কী করিলাম কুড়ি বৎসর? কী ছার সে সাধন, যাহাতে 'এই ঈশ্বর', 'এই ঈশ্বর' করিয়া পড়া মুখস্থ করার মতো ঈশ্বর নির্ধারণ করিতে হয়। মা বলিয়া সহজে তোমাকে ধরা যায়। ওহে গরীবের ধন!

আমি যে তোমাকে সহজে পাইয়াছি। আমার যে কিছুই ছিল না। ব্রহ্মধন এখন যে আমার ভাণ্ডারে, আমার পুস্তকালয়ে, আমার বক্ষের ভিতরে। রাজা অপেক্ষা আমি বড়ো হইলাম। জমিদার অপেক্ষা বড়ো। তোমার সন্তান হইয়া আমি ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরাধিকারী হইলাম। যোগেতে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র সমস্ত বুকের মধ্যে করিয়াছি। মাকড়সা যেমন জালের পোকাকে ধরে, তেমনই ধরিয়াছি। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্ম— আমার মধ্যে করিয়াছি। আমি ধন্য! আমার পূর্বপুরুষেরা ধন্য! এই-সকল কথা যাঁহারা শুনিতেছেন, তাঁহারা ধন্য! ধন্য, হে ঈশ্বর। তুমি অযোগীকে যোগী করিতে পার। হে কৃপাসিন্ধু, এই আশীর্বাদ করো, সচ্চিদানন্দকে বিশ্বাস করিয়া যোগের সুফল এই জীবনেই যেন আস্বাদন করিতে পারি। জগজ্জননী মুক্তিদায়িনী, কৃপা করিয়া তুমি আমাদিগকে এই আশীর্বাদ করো।

(রবিবার, ৯ আশ্বিন, ১৮০৪ শক; ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত।)

আশ্চর্য গণিত

আমার জীবনের গণিত অতীব আশ্চর্য। যে অঙ্কশাস্ত্র দ্বারা জগৎ পরিচালিত, আমি তাহাতে বিশ্বাস করি নাই। তাহার সঙ্গে আমার অঙ্কশাস্ত্রে বিরোধ দেখিতে পাই। মূল তত্ত্বেই বিবাদ; অথচ আমার গণিত আছে, তাহার শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারা যায়, ভক্তদের বোঝানোও যায়; নিয়মাদি সকলই তাহার ঠিক আছে, সাধারণ মানবমণ্ডলী তাহা মানে না; শতাব্দী যাইবে, তথাপি মানিবে না। যে দেশ হইতে আমি আসিয়াছি সেখানকার রীতি-পদ্ধতির এখানকার সহিত ঐক্য হয় না। যেমন এ অঞ্চলের লোকেরা এখানকার রীতি-নীতির পক্ষপাতী, আমার দেশের লোকেরা সেইরূপ সেখানকার রীতি-নীতির পক্ষপাতী। সকলেরই আপনার দেশের প্রতি, আপনার গৃহের প্রতি অনুরাগ আছে। কে না আপনার দেশকে মহিমান্বিত করিতে চায়? হে মানব-জাতি, তোমরা এ দেশের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার যদি ভালো করিয়া থাক, তবে যেমন তাহা পরকে বুঝাইতে চাও, সেইরূপ করিবার সমান উৎসাহ ও অধিকার লইতে আমাকে দাও। আমি আমাদের দেশের কথা বলি। আমাদের দেশকে আমি ছোটো বলিব না। আমাদের দেশের লোকে যে শাস্ত্র মানেন তাহা ছোটো নয়, বরং বড়ো। অন্তত বিশ্বাস করো, সেখানকার শাস্ত্রের কথা কিয়ৎক্ষণ শোনা ও আলোচনা করা উচিত।

সে যে অঙ্কশাস্ত্র, লোককে তাহা বিস্ময়াপন্ন করে। সাধারণ লোকে তাহার মধ্যে অসত্য দেখে। যাহারা সে সত্য সাধন করে, তাহাদিগকে নির্বোধ, পাগল বলে। তথাপি মুখ থামিবে না, তেজের সহিত বলিব যে, অঙ্কশাস্ত্র অতীব আশ্চর্য; কেননা, তাহার মতে তিন হইতে পাঁচ লইলে সতেরো অবশিষ্ট থাকে। এই সারতত্ত্ব ধরিয়া

এই নিয়ম অনুসারে ধর্ম সাধন করা হইলে লাভই হয়, ক্ষতি হয় না। এইরূপে সাধন করাতেই বহু শত্রু-সমক্ষেও জয়পতাকা নিখাত করা হইয়াছে। এই অঙ্কের উপর ধর্ম-জীবন স্থাপিত; যে জয় হইয়াছে তাহা ইহাতেই হইয়াছে। যেখানে পাঁচ আর তিনে আট বলিয়াছি, সেইখানেই হারিয়াছি। যেখানে বলিয়াছি, অল্প হইতে বহু বাদ দিলে অনেক বাকী থাকে, সেইখানেই জিতিয়াছি। গৃহ নির্মাণ করা উচিত বুঝিলাম, অমনিই করিলাম। আকাশের দিকে প্রাচীর উঠিল, গৃহ নির্মিত হইল, ঘরে ছবি দেওয়া হইল, তার পর পত্তন ভূমি নির্মাণ করিলাম। সর্বশেষে পত্তন ভূমি নির্মাণ করি। এ দেশের এই বিধি, এই শাস্ত্র।

যাহারা ভিত্তি পত্তন করিয়া গৃহ নির্মাণ আরম্ভ করে তাহাদিগকে আমরা নির্বোধ বলি; জয়লাভ করিবে না বলিয়া নির্দেশ করি। যদি দেখি, কেহ বলিতেছে, কেমন করিয়া ধর্ম মন্দির নির্মিত হইবে, কিরূপে প্রাচীর উঠিবে, আগে যদি টাকা না হইল, কিরূপে নির্বাহ হইবে, অমনিই বুঝিয়া লই, ইহার জয় সম্ভব নয়। আমরা বলি, বাড়ি চাই, ঈশ্বর? হাঁ। বুঝিলাম, তৎক্ষণাৎ আকাশের উপর চারতলা বাড়ি হইল। বাড়ি নির্মিত হইল, টাকাও আসিতে লাগিল, তখন পত্তন হইল। আগে ভাবিয়া করিবে না; আগে করিয়া পরেও ভাবিবে না। আগেও না, মধ্যেও না, পরেও না; ভাবনা কখনোই করিবে না। ঈশ্বরাদেশে কার্য করিবে; ভাবিবে কেন? সন্তানের বিবাহ দিবে, পাঁচ শত টাকা চাই, পাঁচ সহস্র চাই; পৃথিবীর মূর্খ ভাবে, কোথায় টাকা, কেমন করিয়া টাকা আসিবে। বিবেচনার পর আলোচনা, আলোচনার পর বিবেচনা করিয়া মস্তিষ্ক আলোড়িত করে। পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল; বিবাহ আর হইল না। যাঁহার ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার সকল বিষয়েই ভাবনা আসিল। আমাদের দেশে লোকে কন্যার বিবাহ দিতে হইলে কেবল আকাশের দিকে তাকায়; বলে, হরি, তোমার এই কন্যার

কি বিবাহ দিতে হইবে ? হাঁ, পাঁচই আশ্বিন দিন স্থির। বিবেক ও বৈরাগ্যের অস্ত্র লইয়া সাধক বাহির হইলেন। শুভক্ষণে বিবাহ হইয়া গেল ; কোনো বাধাই ঘটিল না। পাত্র ছিল না, টাকা ছিল না, এই অবস্থাতে সাধক কার্য সাধন করিলেন।

এইরূপ অবস্থায় পৃথিবীর লোকে ভাবে, কিরূপে হইবে ? ঈশ্বর জানেন ; হইবে। ভক্ত বলেন, ঈশ্বর যখন বলিয়াছেন, তখন হইবেই। ভক্ত দেখিলেন, একটি পয়সা নাই ; কিন্তু ঈশ্বর বলিলেন, পাঁচ শত লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া উৎকৃষ্টরূপে খাওয়াইতে হইবে। ভক্ত উপাসনায় বসিলেন। এদিকে বিবাহের বাদ্যও প্রস্তুত, হাজার লোকের আয়োজন হইল। বিবাহ হইয়া গেল। কিরূপে হইল ? হইবে কিরূপে— এ দেশের লোকে ভাবে না ; হইল কিরূপে— ইহাই ভাবে। ঠিক যেখানে সাতটি টাকা চাই, দশজন লোক চাই, ঠিক সময়ে তাহাই আসিল। যখন যাহা প্রয়োজন হইল, সকলই হইল। কোন্ সূত্রে কেমন করিয়া হইল, কে বলিবে ? স্বর্গ জানে, মর্ত্য বলিতে পারে না। এই-সব হইল। আবার গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করেন, কিরূপে হইল ? সকলই এইরূপে হইল। এইরূপেই আসিল।

যেখানে দেখা গেল, সকল লোকেই এই কার্যের সুখ্যাতি করে, এই কার্য যদি করা যায়, সকল লোকেই সুখ্যাতি করিবে। সাধক অমনিই বুঝিলেন, এ কার্য মন্দ কার্য ; ইহাতে সর্বনাশ হইবে। বিদ্বানেরা গ্রাহ্য করিবে, পণ্ডিতেরা মানিবে, সাধারণ লোকে যশ কীর্তন করিবে, অতএব এ কার্য করা হইবে না। মন বলিল, এই কার্য করো ; আকাশের দিকে তাকাইয়া বোঝা গেল, এ একটু ভালো কার্য। ভালো ভালো লোকে, ধনাঢ্য লোকে, পণ্ডিত লোকে পাগল বলিতেছে, বিপক্ষ হইয়াছে ; স্থির হইল, ইহা করিতেই হইবে। এ কার্য করিলে সবাই নিন্দা করিবে, ভয়ানক অপমান হইবে, যে প্রদেশে বক্তৃতা করিতে যাইব, কেহই শুনিতে আসিবে না ; খুব বন্ধু আপনার লোক যাহারা তাহারাও ছাড়িয়া যাইবে ;

শরীর ক্ষীণ, মন ক্ষীণ, বুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া অবসন্ন হইবে; যেই এরূপ দেখিলাম, মন বলিল. ঠিক হইয়াছে, কেউ সায় দেয় না; অতএব এই কার্য করা উচিত। কেননা, পৃথিবীর যাহাতে শত্রুতা হয়, ঈশ্বরের তাহাতেই মিত্রতা হয়। পৃথিবী যাহাতে বিমুখ, ঈশ্বর তাহাতে অনুকূল।

লক্ষ লোক যে কাজে প্রয়োজন, সাধক ভক্ত গৃহস্থ বলেন, তিন জনের দ্বারা তাহা অনায়াসে সাধিত হইবে। পৃথিবী বলে, এ কাজ পাঁচ সহস্র লোক ভিন্ন সমাহিত হইবে না; ভক্ত বলেন, পাঁচ জনের অধিক লোক যদি এ কাজে হয়. ইহা নষ্ট হইবে। অনেক টাকা চাই. অনেক প্রচারক চাই. অনেক উপদেষ্টা চাই, তবে প্রচার হইবে, পৃথিবীর এই কথা। ভক্ত বলেন— না, পাঁচ জন হইলেই যথেষ্ট; বারো জন একত্র যদি হয়, উর্ধ্বসংখ্যা ভাবিবে; বারো জন যা করে, বারো লক্ষ তাহা করিতে পারে না। তেরো জন লোক করিতে গেলেই মন্দ হয়। যাহা পাঁচ শত লোকে না করিতে পারে, পাঁচ জনে তাহা করিতে পারে। আর পাঁচ জনের কার্যে ছয় জন লোক প্রবেশ করিলেই সকল কার্য বিফল হয়। এইজন্য চেষ্টা করি. লোক যাহাতে অল্প থাকে। লোক বাড়ানো ঈশ্বরের আজ্ঞা-বিরুদ্ধ। 'দেখ দেখ, পাঁচটি বিশ্বাসী বসিয়া আছে', এর মধ্যে এত লোক কিরূপে হইল? কী চমৎকার! পঞ্চাশ বৎসরে এত অধিক লোক কিরূপে হইল, এত অধিক লোক ঈশ্বর করিলেন? অল্প লোকই স্তম্ভস্বরূপ হইয়া মাথায় করিয়া ধর্মসমাজ রক্ষা করিবে। দুর্জয় দ্বাদশ ধরাতলে জয়ী হইল। এইজন্য যিনি আমাদের দেশ হইতে আসেন, তিনিই চান, অল্প লোক থাকে।

যখন দেখিলেন, অনেক লোক আসিতেছে, যেমন সংগীতকার সা, ঋ, গা, মা করিয়া সুর চড়ান, তেমনই আচার্য উপরের দিকে সুর চড়াইতে থাকেন। অসংখ্য লোক, এক শত লোক হইল। এখনো এত লোক? আসল পথে এত লোক? আরো শক্ত সাধন প্রবর্তিত

হইল। কেহ ইহাতে বিরক্ত হইল, কেহ নিন্দা করিয়া পলায়ন করিল। দুই শত লোক যখন পাঁচ জন হয়, তখন স্বর্গ হইতে পুষ্প বর্ষণ হইতে থাকে। আচার্য বলেন, এত দিনে এত লোক হইল। পাঁচ শত সংখ্যাকে কাটিয়া কাটিয়া কপ্‌চাইয়া পরে ভিতরে পাঁচজনের মধ্যে সমস্ত ধর্মসমাজের বল ঘনীভূত হইল। যে কার্যে ভাবনা অধিক, সে কার্যে এখানে ভাবনা নিষ্প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন, এ গণিতশাস্ত্রে অনুমানের ব্যাপার ; তাহা নহে। একজনের জীবনে পঁচিশ বৎসর, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। এ জীবনে যাহা-কিছু জয়লাভ হইয়াছে, চিন্তা না করার দরুন। টাকা জড়ো করিয়া কার্য আরম্ভ করা যেখানে— সেখানে বিফল। যেখানে টাকা নাই, চিন্তা নাই, —সেইখানেই জয় হইয়াছে। এ যদি চক্ষে দেখা সত্য হয়, তবে কেন না সকলে এ গণিতের প্রশংসা করিবে ?

নিশ্চিত বলিতেছি, চিন্তা করিলে বিষয় রক্ষা হয় না, শরীর রক্ষা হয় না, ধর্ম তো রক্ষা হয়ই না। বৌদ্ধশাস্ত্রের নির্বাণ লইয়া যেখানে যাওয়া যায়, সেইখানেই জয়। যেখানে পর্বত হাঁ করিয়া আছে, যেখানে দাঁড়াইলে পদস্খলন হয়, শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্মস্থাপন করো। লক্ষ টাকা পায়ের নীচে রাখিয়া তবে তুমি দয়াব্রত স্থাপন করিবে ? না, না। দয়াব্রত স্থাপন করো, কাপড় ছিঁড়িয়া একটি সুতা হাতে করিয়া বলো, আয় আয়, টাকা আয়। পর দিন সকালে সূর্যের মুখ হইতে, যত প্রয়োজন, ঈশ্বর দিবেন। ঈশ্বরের ধন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের ধন, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের ধন। সন্তান হইলে টাকার ভাবনা কি ? নাটক করিতে হইবে, বিধবার চক্ষুর জল মোচন করিতে হইবে, দেশে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে ; ঘরে দেখিলাম, টাকা আছে, বুঝিলাম— দয়া-পথের কণ্টক। দুই পাঁচ দিন গেল, দেখিলাম, ঘরে একটিও পয়সা নাই ; এখন ধর্মের অভিনয় করিতে হইবে। প্রবর্তক

বলিলেন, ভবিষ্যতের বক্ষে টাকা আছে। পৃথিবীতে যখন টাকা আছে, সাহসে ভক্তেরা কাজ আরম্ভ করিলেন। যার দুই লক্ষ টাকা ছিল, সে দুই টাকা খরচ করিতে পারিল না। যার কিছু নাই, সেই কাজ করে। কে না জানে, আমি ধনী? এক কোটি আমার হাতে, কেন না মনে করি? কেননা, জানি যে, একটিও টাকা আমার নাই। আমার কিছু নাই, আমি কেবল ব্রহ্মধনে ধনী, ইহাতেই আমি সহস্র কাজ করিতে পারি।

যেখানে অন্যের গালে হাত, সেখানে আমার কোমরে হাত। অন্যে যেখানে যাইতে সাহসী, আমি সেখানে যাইতে কুণ্ঠিত। অনেক টাকা যেখানে, দুইটা স্কুল হয়, চারিটা ব্রহ্মমন্দির হয়, অত টাকা যেখানে— ভাবি, বিষ সেখানে। টাকা লইয়া লোকে মদে মত্ত হয়। শয়তানের ধন স্পর্শ করিয়া হরিসমাজ স্থাপনে প্রবৃত্ত হইব না। যখন দেখি, হরির টাকা, অমনিই মাথায় ছোঁয়াই। হরির এক টাকা, লক্ষ টাকা। হরির টাকা না পাইলে সাহস হয় না। এ প্রণালী অবলম্বন করিতে যাঁহারা আদিষ্ট, তাঁহারা অবলম্বন করুন; এ প্রণালী অবলম্বনে দায়িত্ব আছে। ইহাতে অনেকের অনিষ্ট হইবারও সম্ভাবনা। ঈশ্বরের ইশারা বুঝিয়া এ প্রণালীতে কাজ করিতে হয়। অনেকে না ভাবিয়া কাজ করিতে গিয়া ঋণজালে জড়িত হইয়াছেন। অনেকেই বলিলেন, 'টাকার কি ভাবনা? মনে যদি করি, চিঠি লিখিয়া লক্ষ টাকা আনিতে পারি'; এই বলিয়া সাহসে উড়িলেন; উড়িয়া পড়িলেন, ডুবিলেন। আমরা উড়িলাম, কিন্তু পড়িলাম না। পূর্বে যত সাহস হইত, তদপেক্ষা অনেক সাহস বাড়িল।

যখন টাকা নাই, তখন প্রচারক-সংখ্যা যদি দশগুণ বৃদ্ধি হয়, প্রচারকদের মধ্যে আসিয়া যদি দুই শত লোক আশ্রয় লন, সকলকে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব; কেননা টাকা নাই, জানি পয়সা-কড়ির টানাটানি। এরূপ সময়ে দুই শত জন আসিলে মুহূর্তের মধ্যে

কুবেরের ধন আসিবে। একবার কাঁদিলেই হয়। এইরূপে কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা বৎসর বৎসর ব্যয় করিয়া আসিতেছি। কখনো ক্ষতি নাই। খড়ো পোস্তায় দোকান, তৃণ দন্তে করিয়া ব্যবসায়; কিন্তু অভাব কখনো নাই। এক উপাসনা করিয়া, পাঁচটি তৃণ দাঁতে লইয়া, যদি কেহ বলে, একটি বিদ্যালয় করিব, তাহাতে মাসে মাসে পাঁচ শত টাকা ব্যয় হইবে; তাহার মুখ দেখিয়া বুঝি, হইবে। এক তৃণ দাঁতে করিয়া এ ব্যক্তি কত টাকাই আনিতে পারে। যার টাকা আছে, তাহার দ্বারা যাহা হয় না— যাহার টাকা নাই, তাহার দ্বারাই তাহা হয়। এ আশ্চর্য ব্যাপার কে বুঝিবে? যাহা ভক্ত বুঝিতে পারে, বিদ্বান্ তাহা কিরূপে বুঝিবে?

না ভাবিয়া কার্য করো, ব্যবসায় করো, বাণিজ্য করো, সন্তানদের লেখাপড়া করাও— সকলই হইবে। সরস্বতী ও লক্ষ্মী, বিদ্যা ও ধন উভয়ই তোমার হইবে। তুমি ভাবিয়া করো, আমরা না ভাবিয়া করি। আমাদের নববিধানের লোক টাকা না লইয়া বহু কীর্তি স্থাপন করিতে পারেন। 'জয় নববিধান' বলিবই বলিব। তোমরা এক-একটি পরিবার প্রতিপালন করিতে পার না, কিন্তু না ভাবিয়া বহু পরিবারের প্রতিপালন হয়। পঞ্চাশ জন কুমারীর বিবাহ দিতে হইবে, পীড়িতদিগের জন্য ঔষধ আনিতে হইবে, কিরূপে ইহা হইবে, কে চিকিৎসক ডাকিবে, ভাবিতে পারিবে না। ভাবিয়া কেহ কিছুই করিতে পারেন না; চিন্তায় মনুষ্য মগ্ন হইল, অথচ মেয়ের বিবাহ হয় না, ছেলের চাকরি হয় না, সন্তান না খাইয়া মরিল! পৃথিবীর পাণ্ডিত্যকে ধিক্। উপাসনায় যাহা হয়, চিন্তায় পাণ্ডিত্যে তাহা হয় না। ধনাঢ্য ও পণ্ডিতে যাহা করিতে না পারে, আমাদের দেশের এক ভক্ত, ভক্তবৎসল আদেশ করিলে, তাহা অনায়াসে করিতে পারে। আমি আরো দেখাইব। আমার দলে যদি বিশ্বাসী লোক থাকে, তবে দেখাইবে যে, এ গণিত অভ্রান্ত। না ভাবিয়া, না ভীত হইয়া, যে আগুনের মুখে দাঁড়াইবে, তাহারই

জয় হইবে। যাহার কিছু নাই, তাহারই জয়। অগ্নিমধ্যে দক্ষিণ হস্ত. প্রজ্বলিত হুতাশনে বাম হস্ত রাখো; সাহসে পূর্ণ হও; মুখে তৃণ করিয়া দণ্ডায়মান সাধক স্বর্গরাজ্যে বাস করো।

হে দয়াসিন্ধু, হে করুণাময়! তোমার মতে চলিলে দেখানো যায়— তুমি সত্য, তোমার অঙ্কশাস্ত্র সত্য। পৃথিবীর মানুষের বিদ্যা— বিদ্যা নয়, অবিদ্যা। তোমার পথে গেলে যে সত্য শোনা যায়, আপাতত তাহা অসত্য বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু ঠাকুর, তাহা নহে, তাহা নহে! চলিতে চলিতে দেখি, কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! যে দেশে বড়ো বড়ো বীর আসিতে পারে না, সেই রাজ্যে আমরা আসিয়াছি। অর্ধ পয়সায় আমরা যাহা করিয়াছি, লক্ষ টাকায় লোকে তাহা করিতে পারে না। আমরা উপাসনা খুব করি না, তাই আমাদের অভাব হয়। কৌপীনধারী যদি হই, শ্রীগৌরাঙ্গ, ঈশা, মূষার ন্যায় যদি সর্বত্যাগী হই, তবে দেখাইতে পারি, এক খণ্ড রুটিতে লক্ষ লোককে খাওয়ানো যায়। প্রাণের সহিত ইহা বিশ্বাস করি। টাকার অভাবে সত্য স্থাপন হইবে না, এ আশঙ্কা কি আমাদের হয়? আনন্দময়ী সাহস দাও! কেন সত্য স্থাপন হইবে না? এখনই তোমার দাসেরা দাঁড়াইবে। কি একটা ভারতবর্ষ; পাঁচ-ছয় জন লোক দাঁড়াইয়াছি; ভারত জয় হইবেই হইবে। পাঁচ শত লোক দাঁড়াইলে বলিতাম— 'ঠাকুর! এরূপ লোক কেন হইল? ধর্মের প্রথম অবস্থাতে দ্বাদশ লোক আছে। শিক্ষক উপদেষ্টা দশ-বারো জনের অধিক যে কখনো হয় নাই। তামাসা দেখিবার জন্য কি এই লোক? পুষ্টিসাধন করো, সমস্ত বল অল্পলোকের মধ্যে ঘনীভূত করিয়া রাখো।' এখন ভয় করিব কেন? আর তো ভয়ের কারণ নাই। আমরা যে দেখিয়াছি, এইরূপ উপায়েই দিগ্বিজয়ী হইব। যত ভক্ত জয়লাভ করিয়াছিলেন, প্রার্থনা উপাসনায় করিয়াছিলেন। প্রার্থনা উপাসনা করিয়াই তাঁহারা পারত্রিক ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। পৃথিবীর ধন যে অসার; আমরা

তোমা-ধন চাই; তোমার লোককে আমরা আদর করিতে চাই। সুবুদ্ধি দাও; তোমার যত লোক এই ধর্মসমাজে আছেন, সকলকে সুবুদ্ধি দাও, ভাবনাশূন্য আকাশবিহারী পক্ষীর ন্যায় যেন তাঁহারা তোমার আদিষ্ট কাজ করিতে পারেন। কী ভয় লোকভয়ে? এইরূপে কাজ করিলে পৃথিবী ক্রয় হইবে। ধিক্ ধিক্, ক্ষত্রিয়বলে ধিক্। পৃথিবীর রাজ্যবল, বাহুবল, ধনবলে ধিক্। ব্রহ্মবল যাহা পাইয়াছি, তাহাই দুর্জয় বল। এই বলে বলী হইয়া বলিব, 'জয় ব্রহ্মের জয়, জয় ব্রহ্মের জয়,' অমনি আকাশ পাতাল কাঁপিবে। দুই-পাঁচ জন লোক লইয়া পৃথিবী জয় হইবে। দয়াময়, পঁচিশ বৎসরের সখা! দয়া করিয়া যে-সব সত্য বুঝাইলে, উপস্থিত বন্ধুদিগকে তৎসমুদয় বুঝাইয়া দাও। এই সত্য লইয়া যেন কেহ উপহাস না করেন। আমরা এই সত্য অবলম্বন করিয়া সংসারাসক্তির হাত এড়াইব; তোমার উপর নির্ভর করিয়া কর্ম করিব। আমাদের মনে আর দ্বিধা নাই; আমাদের আর কি অভাব? তুমি যে আমাদের, আমরা যে তোমারই। তুমি যে আমাদের সর্বস্ব ধন; তুমি সহায় হইলে, ধন সহায়, জগৎ সহায়। তুমি সহায় না হইলে কেহই সহায় নয়। আমরা তোমাতে সকল পাইব— এই চাই। দয়াময়, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আশীর্বাদ করো। আমরা পৃথিবীর কুটিল জটিল অঙ্কশাস্ত্র ছাড়িয়া, তোমার নিকট প্রার্থনা করতঃ যেন মহৎ কীর্তি স্থাপন করিয়া যাইতে পারি, কৃপা করিয়া দুঃখী সন্তানদিগকে আজ এই আশীর্বাদ করো।

(রবিবার, ১৬ আশ্বিন, ১৮০৪ শক; ১ অক্টোবর, ১৮৮২ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বি, শ)

জয়লাভ

যখন ভগবানের আনন্দবাজারে প্রথম দোকান খোলা হয়, তখনই এই নিয়ম করা হইয়াছিল যে, ঋণ করিয়া কিছু ক্রয় করা হইবে না, এবং ধারে কিছুই বিক্রয় হইবে না। যেরূপ সঙ্গতি ও সম্বল, তদনুসারে ক্রয় করা ও নগদ মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করা প্রথমাবধি নিয়ম ছিল। ইহা হইতে মন আর কখনো এদিক ওদিক নড়িল না। পরের কথায় বিশ্বাস করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলাম না; যাহা আপনার নয়, তাহা আপনার বলিলাম না। যতটুকু অধিকার, তাহার অতিরিক্ত বিষয়ে হাত দিলাম না। যতটুকু পাইয়াছি, যতটুকু প্রেমরস ঘটে ছিল, যতটুকু বিদ্যা ছিল, যেটুকু মানিতাম, সেইটুকুই কার্যে পরিণত করিয়াছি। এইরূপ অনেক বুঝিয়া বাণিজ্য চালাইতে হইয়াছিল; ক্রমেই কারবার বাড়িল; অনেকে কিনিতে আসিলেন। এইটুকু নিয়মের জন্যই কারবারের এত শ্রীবৃদ্ধি হইল।

শাস্ত্রে লেখা আছে, কি অমুক বলিয়াছেন, এ বিবেচনা করিতাম না; জানিতাম, তাহা করিতে গেলেই গোলে পড়িব। পরের মুখে ঝাল খাইয়া শেষে বিপদে পড়িব, এ আশঙ্কা ছিল এবং এখনো আছে। নিজে বুঝিব, পরে করিব, প্রথমাবধি এই প্রতিজ্ঞা ছিল। বৈরাগ্যই হউক, আর যোগই হউক, পরের কথায় লইব না। ভিতরে কী আছে, শেষে কী হইবে; অন্ধকারের মধ্যে যাওয়া উচিত নহে। চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, হস্ত আছে, দেখিব, পরিষ্কার করিয়া বুঝিব। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? মা বাড়িতে আছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি; গুরু ঘরে আছেন, অর্থ তাঁহার কাছে বুঝিয়া লই; বন্ধু দক্ষিণ হস্তের কাছে রহিয়াছেন, তাঁহাকেই বলি— 'হরি আমাকে সাহায্য করো।'

ঘরে টাকা সঞ্চিত, তাই খরচ করি। অধিক খরচের আবশ্যক

হইলে ভগবান দিবেন। ধনী মহাজন পরে যদি হই, বৃদ্ধি করিব, এই বলিয়া চলিলাম। বাজারে খুব ভালো করিয়া ব্যবসায় চালাইলাম, ধার হইল না। অল্প টাকার অল্প ব্যবসায়কে ভগবান প্রচুর ধন-সম্পত্তির কারণ করিলেন। যাঁহারা কিনিতে আসিতেন; তাঁহাদিগকে ধারে দিতাম না; ঈশ্বরের সঙ্গে যে কারবার করিয়াছি, তাহাও নগদে। নগদ পাইবার আশা। নগদ না পাইলে বিক্রয় করিব না, এ নিয়ম ঈশ্বরদত্ত। লোভপ্রযুক্ত সন্দেহ, অবিশ্বাসের জন্য এ বিধি লই নাই। জীবনের সুপ্রভাতে বিধাতা বলিয়া দিলেন, তিনি নগদ দেন, ধার দেন না। নগদ বহুমূল্য ঐশ্বর্য তিনি অর্পণ করেন। এইজন্য বিশ্বাস হইল, যাহা-কিছু প্রয়োজন, যতদূর মানুষের পক্ষে লাভ করা সম্ভব, সমস্তই পাইব। সাধন করিলাম; ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ধন আশা না করাতে লাভ হইল। রাত্রি কাটাইলাম; পরদিন প্রাতে অভিলষিত ধন পাইলাম। পরে পাইব মনে করিলে হইবে না। সেইজন্য প্রণাম করিয়া বলিলাম—প্রভু হে, বলিয়াছিলে নগদ দিবে, দাও; বিলম্ব করিব, কিন্তু তোমার নিকট হইতে লইয়া যাইব।

ক্রমে ক্রমে দেখিলাম, আপনার সম্বন্ধে, পৃথিবীর সম্বন্ধে, দেশের সম্বন্ধে, মানবমণ্ডলীর সম্বন্ধে যাহা যাহা চাহিয়াছি, সকলই পাইয়াছি। পাইতে বিলম্ব হয়, পাওয়া হয় না, হওয়া অসম্ভব— এ-সকল কথা শুনিয়াছি। পরলোকে ফললাভ হইবে, কীর্তি স্থাপন হইবে, এখানে কেবল শস্যবপন; অপরাপর শাস্ত্র পড়িয়া দেখিলাম, এরূপ বিশ্বাসের ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যাহা পাইবার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে কত লোকের শরীর অবসন্ন হইল, দিন যামিনী কাটিয়া গেল, আমাদের সামান্য বলে, সামান্য চেষ্টায় তাহা লাভ হইল। অনেক ধর্মসংস্কারক মহামতি পণ্ডিত সত্য বিস্তার করিতে কষ্ট সহ্য করিয়া, অনেক পরিশ্রমের পর ভবের ব্যবসায় বঞ্চিত হইয়া পরলোকে গেলেন। বীজ বপন করিবার সহস্র বৎসরের পর আমরা

ফল সম্ভোগ করিতেছি। এ সময় অনুকূল হইল ; প্রবল প্রেম প্রবলতর হইয়া অবস্থা পরিবর্তন করিয়া দিল। এখন দেখিতেছি, পঁচিশ বৎসরের পরিশ্রমে পাঁচ শত বৎসরের ফল হয় ; এক দিনের কাজ এক ঘণ্টায় হয়। যে বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে অনেক বৎসর লাগে, ফল প্রসূত হওয়া অনেক সময় সাপেক্ষ, এখন তাহা অল্পেই হয়। ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়া কার্য আরম্ভ হইল ; দুই বৎসর যাইতে না যাইতে দেখি, প্রচুর ফল ; লোক লোকারণ্য। দুর্বহ ভার লইবার জন্য দেশদেশান্তর হইতে লোক আসিতেছে।

কী ছিল পঁচিশ বৎসর আগে, কী হইয়াছে পঁচিশ বৎসর পরে ! এ ব্যাপার তো কেহই জানিত না। কল্পনাতেও কেহ ধারণা করিতে পারে নাই। ধর্মে ধর্মে কি বিবাদ ছিল ; অধর্মের প্রতি লোকের কি আসক্তি ছিল ; ব্রাহ্মধর্মকে কি ক্ষীণ করিয়া রাখিয়াছিল ; ভক্তি প্রেমের কি অভাব ছিল ; দুর্বল বাঙালীর পক্ষে উৎসাহের কিরূপ অভাবই ছিল। দশ-কুড়ি বৎসরের অপ্রতিহত যত্নের পর সত্য বিস্তার ও রক্ষার সম্ভাবনা বর্ধিত হইল। অনেক কীর্তি মাটি হয় যে দেশে, সেই দেশে ব্রাহ্মধর্ম নববিধানে পরিণত হইল। এমন বৎসর যায় নাই, যে সময় উন্নতি হয় নাই। এমন মাস কই, এমন সপ্তাহ কই, যে সময়ে ঈশ্বর নিদ্রিত ছিলেন, লোকে স্বর্গের কথা শুনিতে পায় নাই। সিংহ বাড়িল ; বঙ্গদেশ কেন, সমস্ত ভারতবর্ষ কাঁপিতেছে, টলমল্ করিতেছে। নববিধান সম্বন্ধে কী কার্য হইয়াছে, যাহা পূর্ণ হয় নাই ? এমন কী কার্য, যাহার ফল না ফলিয়াছে ? বড়ো বড়ো কীর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল ; ছোটো ছোটো কর্ম, যাহা ভক্ত হরিনাম করিয়া আরম্ভ করিলেন, তৎসমুদয়ও সফল হইল। এখন সত্য সূর্যের দিকে তাকাইয়া, সত্য অগ্নির মধ্যে হাত রাখিয়া বলা যায়— যাহা পাইবার পাইয়াছি, যাহা দেখিবার দেখিয়াছি।

আনন্দবাজারে যাঁহারা দোকান খুলিয়াছেন, তাঁহাদেরই প্রচুর লাভ হইয়াছে। যত কারবার করিলাম, কেবল লাভই হইল, ক্ষতি

হইল না। আর কিছুতেই ভীত হই না, কিছুতেই ব্যথিত হই না। যে হিসাবের কাগজ খুলি, দেখি, পাঁচ টাকায় আরম্ভ, পাঁচ লক্ষ টাকা লাভ। খড়ো পোস্তায় যে দোকান করিয়াছিল, তাহার টাকার সংখ্যা নাই। জন্মের পর যাহার জন্য ঈশ্বর অবিনশ্বর অক্ষরে 'জয়লাভ' লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার জয়লাভ কে খণ্ডন করিতে পারে? ঈশ্বর বলিয়াছেন— 'এরা জয়ী হইবে; ধূলিমুষ্টি ধরিবে, স্বর্ণমুষ্টি হইবে; হরিনাম করিয়া যাহা করিবে, তাহাতেই পৃথিবীর মঙ্গল হইবে।' স্বার্থপর হইয়া কাজ করি নাই, দুই টাকার লোভে উপার্জন করিতে আসি নাই, দেশের দুঃখে ব্যথিত হইয়া আসিয়াছিলাম। হরি সকাল বেলায় বলিলেন—'বর লও'। ভক্ত কী বর চাহিলেন? এই বর চাহিলেন— যেন জয়ী হই। তখন নিজ হস্তে হরি লিখিয়া দিলেন —'ভক্তের জয়, নিঃসংশয়'। এখন দেখিতেছি ভক্তির সহিত যাহা করা যায়, তাহারই জয় হয়।

এই সময় আশ্চর্য প্রমাণস্থল এত হইতেছে যে, আর গণনা করিতে পারি না। বলো শত্রুগণ, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে, নববিধান সম্বন্ধে, কোন কার্যের সূত্রপাত হইয়াছে, যাহা পূর্ণ ও সফল হয় নাই? দেশে হরিনামের রোল উঠিল। কী হইল দেখ! যে দেশে মদ্যপান প্রবল হইতেছিল, গৌরাঙ্গের মধুমাখা হরিনামে সেই দেশ উন্মত্ত হইল। কে জানিত, দেশের লোকে ইংরাজি শিখিয়া, মৃদঙ্গ বাজাইয়া, ছোটো লোকের মতন কীর্তন করিয়া বেড়াইবে? অবিশ্বাস, নাস্তিকতা আসিতেছিল, বন্যার মতো অবিশ্বাসের ভাব প্রবল হইতেছিল, কে জানিত এমন সময়ে, বঙ্গদেশের যুবকগণ নিমীলিত নয়নে, 'এই ব্রহ্ম পেয়েছি', 'এই ব্রহ্ম পেয়েছি', 'সর্বেশ্বর মহেশ্বর হৃদয়েশ্বরকে এই ধরেছি' বলিবে? এ ব্যাপার এখন চক্ষে দেখিয়াছি, অপরকে দেখাইয়াছি। এখন শাক্ত বৈষ্ণবে মিল হইয়াছে। কালী কৃষ্ণ একসঙ্গে বসিলেন। কালীকে কৃষ্ণ, কৃষ্ণকে কালী দেখিতেছেন ভক্ত। শক্তিকে ভক্তি,

ভক্তিকে শক্তির ভাবে পূজা হইতেছে। বঙ্গদেশে শাক্তভক্ত, ভক্তশাক্ত এক হইতেছে। শাক্তের মন্দির ও ভক্তের মন্দির দুই একত্রে মিলিয়া এবার এক সোনার মন্দির হইবে।

যে ভক্তি ছিল মার প্রতি, হরিকে সে ভক্তি দেওয়া হইল; হরিভক্তেরা হরিকে যে ভক্তি অর্পণ করিতেন, মাকে সেই ভক্তি দিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছাতে নববিধানে দুই এক হইল। পঁচিশ বৎসরের পরিশ্রম সফল হইতেছে। দেশে জাতিভেদ প্রভৃতি কত কুসংস্কারের প্রভাব ছিল। এই মন সেজন্য কতই ক্রন্দন করিয়াছে। কোথায় গৌরাঙ্গ? কোথায় শ্রীচৈতন্যের জাতিনির্বিশেষে প্রেম?— এই বলিয়া প্রাণ কত কাঁদিয়াছে। এক এক ফোঁটা জল পড়িল, আর লক্ষ লক্ষ বিঘায় ফসল হইল। নিজগুণে এত হইল না; সকলই হইল হরিপদ ধরাতে। ধূলি যদি এক মুষ্টি ধরা যায়, আবার বলিতেছি, স্বর্ণমুষ্টি হয়। হরিনাম বিদ্বান সভ্যদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; বঙ্গদেশের যুবকদের মধ্যে মুনি ঋষিগণ আসিতেছেন। আমরা কত প্রার্থনা করিয়াছিলাম; সেই প্রার্থনার জন্য, ভিক্ষার জন্য, হরি এই-সব করিয়া দিতেছেন। এইজন্যই বলিতেছি, আমাদের নগদ লাভ হইতেছে। দেশের কোনো একটি সেবা করিতে হইবে। দশ সহস্র লোকের আসাতে পাছে তাহা বিফল হয়, অমনি দেখি, ভক্তদল অল্প হইয়া পুষ্ট হইতেছেন। সকল দিকেই কেবল মঙ্গল দেখিতেছি।

হরিনাম কী প্রবলই হইয়াছে! পঁচিশ বৎসরে দেশের মুখ ভিন্ন লক্ষণ ধারণ করিয়াছে। এখন যদি শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, বিরোধানল প্রজ্বলিত হয়, বিপদ আসিয়া আমাদিগকে প্লাবিত করিবার চেষ্টা করে, তথাপি ভয় নাই। কেননা, জয়ী হইবার জন্যই আমরা জন্মিয়াছি; কোনো যুদ্ধে হারি নাই। যত মহারণে প্রবৃত্ত হইলাম, যত অনুকূল প্রতিকূল অবস্থাতে পড়িলাম, সর্বত্রই জয় হইল। হরি হস্ত দ্বারা আমাদের স্পর্শ করিলেন, আমরা দুর্জয় হইলাম। তাঁহার

প্রেমের ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখিয়াছি। চারি দিকে আমাদিগের এক শত দুই শত কীর্তিস্তম্ভ স্থাপিত হইল। হরি বলেন, কী পরিশ্রম করিয়াছিস? একগুণ শ্রমের দশগুণ ফল দিয়াছি। এরূপ না হইলে কি চলে? হাতে হাতে লাভ। আমরা যে রোজ খাটিয়া খাই। নতুবা যে প্রাণপতির কথা ভালো লাগে না। রোজ না পাইলে আমরা থাকিতে পারিব না জানিয়াই, হরি এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন একগুণ শ্রমের দশগুণ ফল পাইলাম; মনে হইতেছে, বার্ধক্যের ভিতরে আবার বালক হই। আবার মহাপরিশ্রম করিয়া বঙ্গদেশকে কাঁপাই; কোটি বালক আসিয়া যেন দেহের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। যৌবনকাল ফিরিয়া আসিয়া চক্ষুকে অগ্নিময় উৎসাহে জ্বলন্ত অগ্নিসম করিতেছে। ঈশ্বরের কার্যে কি জীবন দিব না?

অনেক ব্যথিত হইলাম, উৎপীড়িত হইলাম, অনেকের নিকট পদদলিত হইলাম; তথাপি আমি মনে করি, আমার কিছুই ক্ষতি হয় নাই। হরি ধন্য, হরি ধন্য, হরি ধন্য! আমার কেবলই লাভ হইতেছে। আমি যে কার্য করিয়াছি, সেই কার্যই সহস্র সহস্র লোককে পরমাত্মার দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। ঘরে লুকাইয়া থাকিলেও দেখিব, দশ সহস্র লোক 'হরি হরি' বলিতেছে। আমি বলিলাম, 'হরি হে! এজন্য কি আমি কাঁদি নাই?' অমনিই হরি কলিকাতায় বৃন্দাবন দেখাইলেন; সেই যমুনা, সেই প্রেমের ব্যাপার দেখাইলেন। টাকা সম্পদ পাই নাই বলিয়া কি আমার দুঃখ হইতেছে? তালুক-মুলুক না পাওয়াতে কি ক্ষোভ আছে? আমি যে হরিদাস; প্রভুর যাহা, দাসেরও তাহা। ব্রহ্মাণ্ড যে আমার হস্তগত হইল। আমি কি জন্মিয়াছি কখনো হারিবার জন্য? রসনায় যদি হরিনাম উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে এ রসনা কখনো হারিবে না। যদিও অন্য বিষয়ে হীন হই, যদিও ধন নাই, মান নাই, অধিক সাধন-ভজন নাই, কিন্তু হরিনামের বল আমার উপর,

আমার দলের উপর আছে। এই যে দেখিতেছি, শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের দলে আসিয়া নাচিতেছেন। সমস্তই চক্ষে দেখিয়াছি; অবিশ্বাস করি কিরূপে? এ ভক্ত হারিল না, কিছুতেই হারিল না; কেবলই জয়লাভ করিল; আর কী সংবাদ চাও? জয়ী হইয়া হরিনামের নিশান পথে পথে উড়াইয়াছি। অহংকারে স্ফীত হই নাই। হরিনামের জোরে তোমার আমার মতো লোক সব করিতে পারে। হরিনামের জোরে আমরা পৃথিবীটাকে শরার মতো বোধ করিয়া ছুড়িয়া বৈকুণ্ঠে ফেলিব।

আমরা নরাধম বলিয়াই এখনো এত দুর্দশা রহিয়াছে; কিন্তু দুর্দশার মধ্যেও দেখিলাম, জঘন্য অসার জিনিস হাতে করিয়া হরি বলিবা মাত্র স্বর্ণ হইল; মাঠের মধ্যে বাড়ি প্রস্তুত হইল। বিরোধীদের প্রাণের মধ্যেও নববিধান প্রবিষ্ট হইতেছে। খৃস্টানে হিন্দুতে পরস্পর আসক্ত হইতেছে। কৃষ্ণে খৃস্টে মিলন হইতেছে। যুবক বৃদ্ধে মিলিয়া প্রণয়ে আবদ্ধ হইতেছে। সহস্র উন্নতির দ্বার মুক্ত হইল। বঙ্গবাসী! শীঘ্র চলিয়া এসো। সুবাতাস বহিতেছে, চলিয়া এসো। ভক্তিঘাটে এসো; পাল তোলো, নৌকা ছাড়ো। একজন পাপিষ্ঠের জীবন যদি এত কীর্তি স্থাপন করে, তোমরা সহস্র ভাই একত্র হইলে হরিনামের মহিমা কত বিস্তার করিতে পারো; দেশে কত কীর্তি স্থাপন করিতে পারো। এক পাপী এত দেখাইলে; তোমরা সহস্র সাধু আরো অনেক দেখাও। দেশকে এখানে রাখা হইবে না। কল্যাণের রথ, পুণ্যের রথ আসিয়াছে; নরনারীকে সংবাদ দাও। কার সাধ্য, আমাদের মস্তক খণ্ড খণ্ড করে? কার সাধ্য, এই-সকল অমরাত্মার উপর হস্তক্ষেপ করে? দুর্জয় হইয়া, এই বঙ্গদেশকে লইয়া স্বর্গে ফেলিয়া দাও।

হে দীনশরণ, হে ভারতের পরিত্রাণকর্তা! আমরা কী সুখই পাইলাম। লোকে বলে, সংসার বিঘ্নময়; যদি বীজ বপন করি, বৃষ্টি হয় না; রৌদ্রে শুষ্ক হয়। দুঃখের কথা আমরা অনেক শুনিলাম।

অষ্টপ্রহর যাঁহারা তোমার প্রসঙ্গে থাকেন, তাঁহারাও ভয়ের কথা অনেক শুনাইলেন। আমরা তোমার প্রসাদে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হইব, কাহারো নিকট হার মানিব— এ কথা মনে করিলাম না। হরিনামের বল যখন আছে, তখন লড়াই করিলাম ; প্রাণ থাকে, আর যায়। অভেদ্য সাজ পরিয়া যে শয়তানের সহিত যুদ্ধ করে, তাহার কি মরণ আছে ? তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে ধ্রুবকে যে ব্যাঘ্রে বিনাশ করিত। এমন যে কখনো হয় নাই, এমন যে হইতে পারে না। তাই বিপদকালে 'হরি হরি' বলিয়া কত ডাকিয়াছি। দেখ, মা দেখ, আজ জয়ী হইয়া আমি কত রাজ্যের রাজা হইয়াছি ; দেখ, মা দেখ, অস্পৃশ্য বলিয়া যাঁহারা আমাকে পরিত্যাগ করিতেন, তাঁহারা আজ অতিথি হইয়া আসিয়াছেন। মা, দেখ, যাঁহারা কলসী ভাঙা মারিতেন, কপাল কাটিয়া রক্তারক্তি করিতেন, তাঁহারা আজ কাছে আসিয়া বলিতেছেন—'কই, তোমাদের মা কই ? আমরা তাঁহাকে পূজা করিব। আমরা নববিধানের বিপক্ষতা করিয়াছি ; আমরা ঈশ্বর-সন্তানদের রক্ত দেখিয়াছি ; এবার তোমাদের মাকে মানিব।' মা! আমাদের আর কিছু দাও না দাও— জয় দিয়াছ। জয়-নিশান উড়িল ; জয়-বৃষ্টি হইল ; এজন্য আমরা তোমায় ধন্যবাদ প্রদান করি। দুঃখী দুঃখিনীদিগকে এত সুখ দিলে ? ধারে ধর্ম করিতে হইল না। নির্জন কাননে অনিশ্চিত জয় লক্ষ্য করিয়া কাল কাটাইতে হইল না। কত লোকে জয়ের জন্য অনিশ্চয়ের পথে প্রতীক্ষা করিতেছে ; বড়ো আহ্লাদ আমাদের যে, আমাদিগকে সে পথে যাইতে হয় নাই। আমরা পৃথিবীতেই বৈকুণ্ঠ দেখিলাম ; সম্মুখে বাহিরে বৈকুণ্ঠধাম। বঙ্গদেশ টল্‌মল্ করিতেছে। ছিল না হরিনামের প্রভাব, মৃদঙ্গসহকারে হরিনাম হইল। যুবক বৃদ্ধ এখন সংগ্রাম করিতেছে, কে কত নাচিতে পারে, এই বলিয়া। কার হরিভক্তি অধিক, এই বলিয়া বঙ্গদেশের লোকে কোলাহল করিতেছে। হরি, কী দেখিয়াছিলাম, আর কী দেখিতেছি। আমরা তোমাকে

পূজা করিয়া অনেক লাভ করিলাম। এ ধনের গুণ এক মুখে বর্ণন হয় না। বৈকুণ্ঠে কী পাব, সে পরের কথা; আজ যাহা পাইয়াছি, তাহাতেই বড়ো আনন্দ। হরিপাদপদ্ম হাতে পাইয়াছি। এদেশে এত সংশোধন হইতেছে। এত লোক আমাদের দিকে আসিতেছেন। কত যে উন্নতি হইতেছে, কত দলাদলি ভাঙিয়া যাইতেছে, জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, কালভেদ বিনষ্ট হইতেছে, কে বলিতে পারে? হরি, বিশ্বাসের আলোক সঞ্চার করো, লোহার ভারত সোনার ভারত হইবে; কলিযুগের ভারত সত্যযুগের ভারত হইবে। পূর্ণচন্দ্রের আলোক ভারতে পড়িয়াছে; আহা! দুঃখিনী ভারতমাতার এত হইল! মাতৃভূমি ধন্য হইল। কৃপাসিন্ধু, এই আশীর্বাদ করো, হারিব না মনে করিয়া প্রাণপণে যত্নের সহিত যেন তোমার নববিধান সর্বত্র প্রচার করি। মা দয়াময়ি, কৃপা করিয়া তোমার সন্তানদিগকে আজ এই আশীর্বাদ করো।

(রবিবার, ২৩ আশ্বিন, ১৮০৪ শক; ৮ অক্টোবর, ১৮৮২ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত)

বিয়োগ ও সংযোগ

মন পূর্ণ বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করে, আবার খণ্ড খণ্ডকে একত্র করিয়া এই মনই সংযোগ করে। আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধেও বিয়োগ ও সংযোগ সর্বদা চলিতেছে। যেমন জড়জগতের বস্তু সকল বিযুক্ত হইয়া পরমাণুতে পরিণত হয় ও পরমাণু সকলের সংযোগে বস্তুসমূহ গঠিত হয়— মন তেমনই ধর্মরাজ্যে বসিয়া সর্বদা বিয়োগ ও সংযোগ ক্রিয়া সমাধা করিতেছে। কাহারো মনে এই বিয়োগ-ভাব প্রবল; কাহারো মনে আবার সংযোগস্পৃহা বলবতী। কেহ কেবল একটি বস্তুকে চিন্তা দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতেছে; একটি ভাবকে খণ্ড খণ্ড ভাবিয়া অধ্যয়ন করিতেছে; এক বস্তুর গুণগুলি এক এক করিয়া ভাবিতেছে। কোনো কোনো লোক আবার বিয়োগের দিকে যাইতে চাহে না; অখণ্ড বস্তু দেখিতে চাহে। কত আর এক এক করিয়া গুণ ভাবিব, কত আর পূর্ণ বস্তুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া করিয়া অবলোকন করিব, ঐ চিন্তা কাহারো কাহারো মনে প্রবল দেখা যায়। আমার স্বভাবের মধ্যে দুইয়ের সামঞ্জস্য রাখিবার চেষ্টা হইতেছে। এক সময়ে দুই ভাবের সামঞ্জস্য হইল, এরূপ বলা যায় না।

সাধারণ মানবমণ্ডলীর ন্যায় আমিও প্রথমে আংশিক দর্শনের পক্ষপাতী ছিলাম। প্রত্যেক বিষয় সূক্ষ্মরূপে বিচ্ছিন্নভাবে বুঝিবারই চেষ্টা ছিল। একটি একটি করিয়া বুঝিব, এই ইচ্ছাই বলবতী ছিল। কিসে পাপ যায়, প্রথমে এই একই চেষ্টা ছিল; কিসে মনে কুপ্রবৃত্তি না হয়, এই ভাবই ছিল। কিসে পরসেবা করিয়া সার্থক-জন্মা হইব, কয়েক মাস ধরিয়া এই একটি ভাবই মনের স্থায়ী ভাব হইল। কিসে স্বার্থপরতা যায়, দয়ায় ডুবিয়া থাকিতে পারি, কখনো এই চিন্তা প্রবলা হইত। কখনো বিদ্যার প্রতি অনুরাগ হইত, কখনো

বা বিরক্ত হইতাম। কখনো গ্রন্থ না হইলে তৃপ্তিবোধ হইত না, কখনো গ্রন্থ ভালো লাগিত না। দুই ভাবই মনে ছিল; কিন্তু একটি একটি করিয়া সাধন করিয়াছিলাম। কখনো বৈরাগ্য, কখনো পুণ্য, কখনো প্রেম, এক-একটি করিয়া সাধন করিয়াছি! ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে প্রথমে ন্যায়ের ভাবই হৃদয়ে প্রবল হইয়া প্রকাশিত হইল। বাহিরে ন্যায়ের ভাব দেখিলাম, অন্তরে অন্যায়ের জন্য অনুশোচনা অত্যন্ত শক্তি ও পরাক্রমের সহিত আবির্ভূত হইল। অনেক দিন পরে ন্যায়ের পরিবর্তে দয়ার ভাব ও অনুতাপের পরিবর্তে ভক্তি প্রেমের সঞ্চার হইল।

যাবতীয় স্বরূপ একত্র ধরিবার জন্য আগ্রহ ছিল না; যখন যেটি প্রয়োজন, তখন সেইটি ধরিবার জন্যই চেষ্টা ছিল। বিয়োগ-স্পৃহাতেই দিন যাইতে লাগিল; আবশ্যক যেটুকু, সেইটুকু ধরিবারই ইচ্ছা হইত। অখণ্ডে অনুরাগ হইত না; অখণ্ড ধরিতে পারিব না, অখণ্ড ধরিবার প্রয়োজন নাই— এই চিন্তাই মনে হইত। সম্মুখে ঔষধালয় দেখিলাম, সমগ্র শোভার দিকে দৃষ্টি নাই। রোগীর যে ঔষধ প্রয়োজন, তাহার জন্যই হস্তপ্রসারিত হইবে। নববিধানের ভাব তখনো আসে নাই; সৌন্দর্যবোধ জন্মে নাই। রোগ প্রতিকার করিয়া পরে দেখিব, পক্ষপাতী হইলাম কি না, এই ইচ্ছাই গূঢ়ভাবে ছিল। ভয়ানক রোগ, ভয়ানক অভাব; সুতরাং বিয়োগ-স্পৃহা প্রাবল্য সহকারে হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল। যখন এক-একটি অভাব মোচন হইতে লাগিল, তখন দেখি, প্রকৃতির আশ্চর্য কৌশল। যদিও প্রকৃতির ক্রিয়া গদ্যে লেখা হইতেছিল, পরে দেখি, তাহার মধ্যে পদ্যও অনেক। দেখিলাম, প্রকৃতির কৌশল একটির পর একটি আনিয়া নির্ধারিত নিয়মানুসারে সকলগুলির সংযোগ করিতেছে। জবাব যখন প্রয়োজন হইল, ভক্তির সহিত লইলাম; তুলসীর যখন আবশ্যক হইল, তুলসী লইলাম ভক্তির সহিত। পরে দেখি, কে সমস্ত সংযোগ করিয়া পুষ্পমালা রচনা করিতেছেন।

প্রথমে ইচ্ছা জন্মে নাই, নববিধানে সমস্ত একত্র গাঁথিব ; পরে দেখি, প্রকৃতির মধ্যে কে তাহাই করিতেছেন।

কে জানিত, ঈশাকে মানা উচিত? যখন দেখিলাম, শ্রীগৌরাঙ্গকে আদর না করিলে আমার চলিতেছে না, তখনই নবদ্বীপে গেলাম ; নবদ্বীপ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গকে আনিয়া হৃদয়ে বসাইলাম। বুদ্ধের আবশ্যক হইল, অমনিই বৃক্ষতল হইতে বুদ্ধকে প্রাণের মধ্যে আনিলাম। কে জানিত, তিন জনকে একত্র আনিতে হইবে? কে জানিত, ভগবান এইরূপে এক এক করিয়া আনিয়া ভক্তমণ্ডলী রচনা করিবেন? ভিতরে ভিতরে কেহ যে এরূপ কৌশল অবলম্বন করিতেছেন, তাহা জানিতাম না। সময়ের গতি ও অন্তরের রুচি অনুসারে যখন যাহা প্রয়োজন বোধ হইত, তাহাই খণ্ড খণ্ড ভাবে ধরিতাম। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে বিয়োগ সংযোগের সামঞ্জস্য হইবার মূল ছিল। কোনো ভাবে মন অধিক কাল আবদ্ধ থাকিতে পারে না, অদ্যাবধি দেখিতেছি, এই ভাবই প্রবল। অধিক কাল কোনো একটি গুণের মধ্যে যে বদ্ধ থাকিব, তাহা থাকিতে পারি নাই। ন্যায়-চিন্তা করিলাম পাপের জন্য ; কিছুদিন পরে বলিলাম, এরূপে থাকিলে আংশিক সাধন হইবে। অমনিই প্রেমের চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলাম। খুব প্রেম ভাবিলাম, দিন রাত্রি সহাস্য ভাব ধরিয়া রহিলাম। আবার মন বলিল, অত দৌড় ভালো নয় ; এবার বিপরীত দিকে অনেক দূর গতি হইয়াছে। আবার ন্যায়ের দিকে গেলাম। যেই দেখিলাম, সেই নৌকা একদিকের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, আবার টানিলাম। এইরূপে হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ রাখিবার জন্য চিরদিনই চেষ্টা করিতেছি।

অনেক পড়াশুনা করিলাম, দেখিলাম— মন বুদ্ধির হাতে পড়িয়া মারা যায় ; অমনিই বালকভাব কিসে হয়, সারল্য কিসে হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এক দিকে বিপদ দেখিলেই অপর দিকে দৌড়াই। ক্রমাগত কেবল সামঞ্জস্যের চেষ্টাই হইতেছে।

আমার সম্বন্ধে যেমন, অপরের সম্বন্ধেও তেমনি। যখন দেখি, ব্রাহ্মমণ্ডলী মধ্যে পরিশ্রম ও কর্ম প্রবল হইতেছে, তখন মনে হয়, এ-সব ফিরাইয়া আধ্যাত্মিক ভাবের মধ্যে লওয়া উচিত। চারি সপ্তাহ মধ্যে দেখি, কর্মশীল ধ্যানশীল হইয়াছেন। কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া ধ্যানের গভীর আনন্দ ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছেন। আবার যখন দেখি, ধ্যান করিতে গিয়া কেহ আর পরসেবা করে না, অমনিই বিবেককে ডাকিয়া আনিয়া ধর্মমণ্ডলীতে স্থাপন করি। আপনার মনের ন্যায় অপরের মন বলিয়াই, কেবল এক খণ্ড হইতে বিপরীত খণ্ডে যাই। এইরূপে দিন গেল বটে, কিন্তু সামঞ্জস্যের দিকেই যাইতেছি, নববিধানের দিকেই যাইতেছি। আংশিক ধর্ম ছাড়িয়া হৃদয় এখন পূর্ণতার দিকে গিয়াছে। এখন আর আংশিক উন্নতি সাধন করিতে পারি না।

স্বদেশে, মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য ঈশ্বর যে নববিধান দিয়াছেন, ইহার অর্থ কেবল পূর্ণতা। এই পূর্ণতা মনের মধ্যে ছিল। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, ঈশ্বরের মতো পূর্ণ হও। বহুদিন হইতে স্বর্ণাক্ষরে এই উপদেশ মনে লেখা ছিল। মনে হইত, খণ্ড খণ্ড ভাব লইয়া থাকিব না। ঈশ্বরের পূর্ণ গুণ ; ষোলো আনা তাঁহার দয়া। আমার সেরূপ নাই। তাঁহার যেমন বৈরাগ্য, তেমনই আনন্দ। আমার বৈরাগ্য হইলে আনন্দ কমে, আনন্দে মাতিলে বৈরাগ্য কমে। আমি হয়তো ব্রহ্মকে জলে তত দেখিতে পাই না, যেমন দেখিতে পাই না স্থলে। আমি এক খণ্ডে ঈশ্বর দেখি, অপর খণ্ডে দেখিতে পাই না। পুণ্যাত্মার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাই, পাপীর মধ্যে দেখিতে পাই না। পাপী যে, সেও ঈশ্বরসন্তান, পুণ্যবানও ঈশ্বরসন্তান। পাপীর মুখে আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না। আমি ঈশার ঈশ্বরকে দেখিব, বুদ্ধের ঈশ্বরকে দেখিলাম না? তুমি বুদ্ধি করিয়া একজনকে রাখিয়া, একজনকে ঘর হইতে তাড়াইবে? তুমি মনে কর, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম হৃদয়কে আনন্দিত

করিবে, ঈশার বিবেক তোমাকে সুখী করিতে পারিবে না? তুমি বুঝি হৃদয়ে গুপ্ত পাপ গোপন কর? তাই বুঝি, ঈশাকে তাড়াইবে? কেবল শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ করিতেছ, পাপ দেখিতে চাও না? আত্মবিস্মৃত হইয়া কৃত্রিম সুখ চাও, তাই বুঝি তোমার এ প্রকার ভাব? অংশে আর মন তৃপ্ত হয় না।

একজনকে ভালোবাসিয়া আর-একজনকে কম ভালোবাসিলে, মনে হয়, উনি কী মনে করিবেন? বুদ্ধকে অনাদর করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে হৃদয়ে বসাইলাম, বুদ্ধ কত কী মনে করিতেছেন? গৌরাঙ্গকে আদর করিয়া, ঈশাকে দূর করিয়া দিলাম? আমি বাঙালী হিন্দু, তাই বুঝি গৌরাঙ্গকে ভালোবাসি? ঈশা পরদেশী, তাই বুঝি ঈশাকে ভালোবাসি না? প্রাচীন ঋষিরা ব্যাঘ্রচর্মে বসিতেন, গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিতেন, পাছে তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ করা হয়, তৎক্ষণাৎ গেলাম ঋষিদিগের বাটীতে। ব্যাঘ্রচর্ম লইলাম, গৈরিক বস্ত্র পরিলাম। ঋষিগণ, আশ্রমবাসিগণ; সভ্যতার খাতিরে সম্ভ্রম রাখিতে পারি না। এসো, উনবিংশ শতাব্দীতে তোমাদের ভালোবাসিব; এসো, তোমাদের আদর করি— এই বলিয়া ঋষিদের আদর সম্মান করিলাম। যখন এক সাধু লই, তখনই আর এক সাধু কাছে আসেন। ভগবান হৃদয়ের নারদকে শিখাইয়াছেন, যখন একজনকে নিমন্ত্রণ করি, এক সত্যকে আহ্বান করি, তখনই নারদ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত সাধুকে, সত্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। আমি একজনকে নিমন্ত্রণ করিব, একটি লইব মনে করি, নারদ তাহা করিতে দেন না। একটিকে আনিতে গেলেই সকলগুলিকে আনিতে হয়। ঈশা মুসা যেন পরস্পর হাতে হাত বাঁধিয়াছেন।

এই দেখিয়াই নববিধান নামে আখ্যাত করিলাম নব ব্রাহ্মধর্মকে। অন্যে আংশিক ভাব রাখিতে পারেন, নববিধানে তাহা কখনোই হইতে পারে না। আমার জীবনে যখন দেখিয়াছি,

এক-একটি লইলে অপরাধ থাকে, তখন এই নূতন নামে ব্রাহ্মধর্মকে উপস্থিত করা আবশ্যক। বয়স বাড়িল, পূর্বেকার উপার্জিত আংশিক ভাব এখন তোড়ার মতো করিয়া বাঁধিলাম। ফুলের তোড়ার মতো সাধুরা মিলিত হইয়াছেন। সত্যের তোড়া বাঁধা হইয়াছে। কোনো দিন ঋষি আসিলেন, কোনো দিন পাঞ্জাবের নানক আসিলেন, কোনো দিন অযোধ্যার কবীর আসিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলেই আসিতে লাগিলেন, ঈশা গৌরাঙ্গ সকলেই আসিলেন। ভিতরে যিনি কার্য করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, সকলেই বসো। কখনো অনুতাপ, কখনো সদনুষ্ঠান, কখনো বৈরাগ্য, কখনো আনন্দ, কখনো বৃদ্ধভাব, কখনো বাল্যভাব, কখনো বা যুবার উৎসাহ, এক এক করিয়া সমস্তই আসিতে লাগিল। যিনি জীবনের মূলে ছিলেন, তিনি সকল রত্ন পাইয়া মালা গাঁথিয়া গলায় পরাইয়া দিলেন। কখনো ইহলোকের সৌন্দর্য, কখনো পরলোকের সৌন্দর্য উপস্থিত হইল। ইহলোক পরলোক এক হইল। বাড়িতে বসিয়া স্বর্গসুখ করা হইল।

দুই বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া উঠিল, একটির পর আর-একটি আসিয়া এখানে সমুদয়ের মিল হইয়াছে। সমুদয় যন্ত্র মিলিয়া এক যন্ত্র হইল। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের স্বর মিলিয়া এক সুমিষ্ট স্বর উৎপন্ন হইল। এখন পূর্ণতা চাই। পূর্ণতার দিকেই এখন যাইতেছি। ক্রমাগত চলিতেছি। ভ্রাতা বন্ধু যাঁহারা দৌড়াইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পথের মধ্যে দাঁড়াইলেন। এই সৌভাগ্যশীল ব্যক্তি কখনোই দাঁড়াইল না, ক্রমাগত চলিতেছে। পথিক নাম দিয়া ভগবান আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন; পান্থশালা পাইব না বলিয়া দিয়াছিলেন; তাই ক্রমাগত চলিতেছি। বর্ষায় দৌড়াইয়াছি, শীতে দৌড়াইয়াছি, ঋতুর বাধা মানি নাই। বাল্যকালে চলিয়াছি, যৌবনে ভ্রমণ করিয়াছি, মৃত্যুর পরেও দৌড়াইতে হইবে। নববিধানের পূর্ণতা হইবেই হইবে। এই পথিকের সঙ্গে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা প্রস্তুত হউন। এখনো ঢের অভাব আছে।

ভাই বন্ধু ঈশ্বরের পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। আর অংশ লইয়া ঈশ্বরের অপমান করিয়ো না; আর নববিধানের বক্ষ বিদারণ করিয়ো না।

হে দীনবন্ধু, হে পূর্ণব্রহ্ম। যেমন আমরা অংশ অংশ করিয়া ধর্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলাম, সমস্ত পৃথিবী সেইরূপ দোষ চিরকালই করিয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন ভাব সাধন করিলেন, তাই এত বিরোধ। আমরা যখন হিন্দুসমাজে ছিলাম, যখন অবিশ্বাসের মধ্যে ছিলাম, তখন আমরাও কেবল আংশিক সাধন করিতাম। এখন বুঝিয়াছি, এক-একটি করিয়া সকল লইয়া পূর্ণ হইতে হইবে। যতদিন হইতে নববিধান মনের মধ্যে আসিয়াছে, ততদিন হইতে কেবল মনে হয়, হায়! ঈশাকে লইলাম, প্রাণের বন্ধু গৌরাঙ্গকে তাড়াইয়া দিলাম? ভক্তি বুঝি কাঁদিতেছেন, ন্যায়ের পক্ষপাতী হইতে গিয়া বুঝি ভক্তিকে মারিয়াছি? একটি ভাইকে হৃদয়ের রাজা করিয়া আর একটি ভাইকে মারিয়াছি? এক ভগ্নীকে স্বর্ণালংকার দিয়া আর একজনকে বলিয়াছি, দূর হইয়া যা? এখন আর তাহা পারি না। সকলকে অনাদর করিয়া ঈশাকে যদি আদর করি, বাড়ি গিয়া দেখি, দুঃখ হয়; দেখি, ঈশাও বড়ো দুঃখিত হইয়াছেন। তাঁহাকে এমন আদর করিয়াছি যে, তাঁহার অন্যান্য ভাইগুলিকে হৃদয় হইতে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছি? পূর্ণব্রহ্ম, তোমার রাজ্যে উদার প্রেম। তোমার সন্তানেরা চান, তাঁহারা পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়া থাকেন। তোমার ন্যায়ের সঙ্গে তোমার প্রেম নৃত্য করে। তোমার যত গুণ মিলিয়া এক গুণ হয়। সমস্ত রঙ মিশিয়া যায়। আমি দেখিলাম, সাত রঙ মিশিয়া এক রঙ হইল। দেখিলাম, নববিধানের কী আশ্চর্য শোভা! তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো, যেন আমি পূর্ণব্রহ্মরূপ দেখি, ব্রহ্মের পূর্ণ পরিবার দেখি, পূর্ণ সৌন্দর্য দেখি। তাহা হইলেই সকল খেদ মিটিয়া যায়। চারি দিকের লোকের ব্যবহার দেখিয়া বড়ো দুঃখ হয়। কেহ কেবল পাপ করে; কেহ কেবল সুখ সুখ করিয়া

বেড়ায়। কেহ ঈশাকে লইয়া বাড়িতে বসিয়া থাকেন, কেহ গৌরাঙ্গকে লইয়া উন্মত্ত হন। কেহ কর্মশীল হইয়া আর সব পরিত্যাগ করিলেন। কেহ বিবেক আর সব লইলেন না। আর গুণের খণ্ড খণ্ড দেখা যায় না। দেখিতে গেলেই যেন এবার অখণ্ড দেখা যায়, এমনই করো। অখণ্ড ভাব দেখিয়াই যেন সকলের ভক্তিভাব পুণ্যভাব উথলিয়া উঠে। সমুদয় সাধুমণ্ডলী দেখিয়া যেন প্রাণ মন আনন্দিত করি। একটি দুইটি তিনটি দেখিয়া স্থির থাকিতে পারি না। নববিধান দিয়াছ, এখন ইচ্ছা করি, অমনিই পূর্ণ হই; যাঁহারা নববিধানে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা পূর্ণ হইতে চান। আর অংশ দেখিতে চাই না; আর অংশ লইতে চাই না। ব্রহ্মের সন্তান হইয়া খণ্ড খণ্ড লইব? পূর্ণব্রহ্ম, এসো; এ হৃদয় তোমায় লইবে। আসিবে যদি, তবে পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণপুণ্য, পূর্ণপ্রেম ও পূর্ণশক্তি লইয়া এসো। গরিবকে আর কষ্ট দিয়ো না। দুই হাত প্রসারণ করি, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণভাবে হৃদয়ে এসো। যে অংশ চায়, সে অংশ পায়; যে পূর্ণতা চায়, সেই মাকে পূর্ণভাবে দেখিতে পায়। সমস্ত মনুষ্যের জন্য এই প্রার্থনা করি, অংশ ধর্ম যেন আর না থাকে; সমস্ত মিলিয়া এক হোক। কবে আমরা নববিধানকে বুক জুড়িয়া আলিঙ্গন করিব? সমস্ত গুণ কোটি কোটি সূর্যের ন্যায় হৃদয়ে প্রকাশিত হউক; দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া যাই। অনন্তে লীন হই; আর মাকে খণ্ড খণ্ড লইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া থাকিব না। পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম, এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে পূর্ণতা না পাইলে নিস্তার দেখি না। রূপে যখন মুগ্ধ হই, তখন তুমি বল, বৎস, গুণে কেন মুগ্ধ হও না? গুণই যদি কেবল ভাবিতে থাকি, তুমি বল, ছেলে হয়ে বুঝি মার গুণ ভাবে? রূপ দেখিতে পারিলে না? দয়াময়ী, চিরকাল এইরূপে লাঞ্ছনাই পাইলাম; যতবার তোমার কাছে গেলাম, সুখ্যাতি আর পাইলাম না। যদি বলি, মা, তোমার গহনা বেশ,

তুমি বলো, কাপড় ভালো নয় কি? কাপড়ের সুখ্যাতি করিলে, তুমি বলো, গহনাকে কেন অনাদর কর? মা, আমি বলিলাম, তোমার ন্যায়-গুণ কী চমৎকার! অমনিই অসীম প্রেমস্বরূপ দেখাইয়া বলো, প্রেম কি আমার খাট? বিবেককে আদর করিলে, তুমি বলিতে থাকো, ভক্তি বুঝি ফেল্না? মা, আমি কী করিব বলো? আংশিক সাধনে আর প্রাণ তৃপ্ত হয় না। পূর্ণতা কিসে পাইব, বলিয়া দাও। অংশ লইয়া যাঁহারা সন্তুষ্ট, আমাদিগের ন্যায় তাঁহাদিগকেও কাঁদাও। পূর্ণ বৈকুণ্ঠ কোথায়, আমাদিগের সকলকে বলিয়া দাও। দয়াসিন্ধু পরমেশ্বর, দয়া করিয়া এই আশীর্বাদ করো, পূর্ণ ধর্ম লইয়া যা-কিছু অভাব, যেন দূর করি; পূর্ণ পবিত্রতার আনন্দে যেন মগ্ন হই। মা দয়াময়ী, অনুগ্রহ করিয়া তুমি আমাদিগকে এই আশীর্বাদ করো।

(রবিবার, ৩০ আশ্বিন, ১৮০৪ শক: ১৫ অক্টোবর, ১৮৮২ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত)

ত্রিবিধ ভাব

সাধকের জীবন-ধাতু এক জাতীয় নহে, ইহা অল্প বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহা সংযুক্ত ধাতু, ত্রিবিধ ধাতুর মিলন ইহাতে লক্ষিত হয়। যদি জিজ্ঞাসা করো, ইহা কিরূপে জানা গেল? নিজের জীবন পর্যালোচনা করিয়াই বুঝিলাম, জীবনের ভিতরে তিন ধাতু আছে। বিবেচনা করিয়া তিন ভাবের মিলন রাখিয়া যে জীবন আরম্ভ করিয়াছি, তাহা নহে। অনেক দিন জীবন-প্রবাহ চলিতে লাগিল, পরে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম; তখন সিদ্ধান্ত হইল, ইহা এক জাতীয় নয়। জীবন-ধাতু যখন পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তখন জানিতে পারিলাম, কি কি ধাতুতে ইহা গঠিত হইয়াছে। এই জীবনের ভিতর তিন পুরুষ বর্তমান। তিন প্রকৃতি এই জীবনে বিরাজ করিতেছে। তিন প্রকার স্বভাবের সমন্বয় হইয়াছে; তিন প্রকার ধাতুর একত্র মিলন হইয়াছে। একটি বালক, একটি উন্মাদ আর একটি মাতাল।

এই তিনের প্রকৃতি যে বিভিন্ন, তাহা সকলেরই নিকট প্রতীয়মান। এই তিনকে বুঝিতে হইলে, অধিক বিচার বা শাস্ত্রপাঠ করিতে হয় না; সহজেই তিনের স্বভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা এই তিনের স্বভাবকে আপনার স্বভাবের ভিতরে মিলিত করিয়াছেন। তিনের মিলনে আশ্চর্য জ্ঞান, আশ্চর্য পবিত্রতা ও আশ্চর্য মুক্তি লাভ করা যায়। তিনের একটি পরিত্যাগ করিলে স্বভাব অপূর্ণ থাকে। যেন ঈশ্বর বলিয়া দিয়াছেন, তিন মশলা একত্র মিলিত না হইলে, ভালো জীবন, সুখী জীবন, ভালো পরিবার, সুখী পরিবার সংগঠিত হইবে না। নিগূঢ়রূপে প্রত্যেক সাধকের ভিতরে অল্পে অল্পে এই তিন প্রকার মশলা মিশান হইয়াছে। সাধক যত সাধন করে, ততই বালক হয়; যত উপাসনা

করে, ততই উন্মাদ হয়;-যত নৃত্য গীতের ভিতর গিয়া স্বর্গের আস্বাদ লাভ করে, ততই মাতাল হয়। প্রথম অবস্থায় সাধকের জীবনে অল্প পরিমাণে বালকত্ব, উন্মাদ-লক্ষণ ও মাতাল-প্রকৃতি লক্ষিত হয়; যতই সাধনে পরিপক্ক হয়, ততই এই সকল গুণ বাড়ে।

বালকের স্বভাব সহজ স্বভাব। এ স্বভাব সহজেই জানা যায়। বালকের স্বভাব হইলে লোকে বৃদ্ধের সহিত মিলিতে অসমর্থ হয়; জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থা বালকের অনাস্থা ও অভক্তির বিষয় হয়; ছেলেদের সঙ্গেই থাকিতে ইচ্ছা হয়; খেলার দিকেই মন যায়। যত বুঝিতে পারি, সারল্য সহজ হইতেছে, বৃদ্ধাবস্থা, কুটিলতা, প্রবঞ্চনা বড়ো অপ্রিয় বোধ হইতেছে, মনের কথা খুলিতে ইচ্ছা হয়, ততই আপনাকে বালক মনে হয়। যতই বৃদ্ধ হইতে যাই, ততই ম্লানবদন হইতে হয়। বল, বীর্য, উদ্যমকে বয়সের সঙ্গে যদি তাড়াই, ক্রমে নিরুদ্যম, নিষ্ক্রিয় হইয়া যাই, কার্য করিবার ইচ্ছা ক্রমে চলিয়া যায়। এইরূপ যত অনুভব করি, ততই বুঝি— বালক নই, বৃদ্ধ। 'জীবনবেদ' পাঠে প্রতিপন্ন হইল— বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাল্য-ভাবেরই বৃদ্ধি হইয়াছে। মনে হয় না যে, বয়োবৃদ্ধি হইতেছে। অসত্যমূলক গণিতের অনুরোধে বলিতে হয় বৃদ্ধ হইলাম; কিন্তু ভিতরে আমাদের দেশের গণিতানুসারে দেখিতেছি, ক্রমে বালকই হইতেছি, ক্রমেই বয়স কমিতেছে। যদি নিতান্তই এ কথা না মানো, অন্ততঃ এটুকু স্বীকার করা উচিত, বয়স বাড়িতেছে না। প্রত্যূষে যখন সাড়ে চারিটা বাজিয়া যায়, আর দুই মিনিট হইলে কি দিবস হইল মনে করি? এক মিনিটের তারতম্যে কি ভাবি? কিছুই না। পাঁচটা বাজিতে পাঁচ মিনিট, আর পাঁচটা বাজিতে আট মিনিট, এ ব্যবধানকে কি অধিক মনে করি? ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ কি ষাট বৎসর পরলোকের লক্ষ বৎসরের কাছে পলক মাত্র। পলক-প্রভেদ প্রত্যূত কিছুই নয়।

বালকের বয়স দেড় বৎসর, চার দিন না হয় বাড়িয়াছে, তাহাতে

কি হইল? দেড় বৎসরের যে বালক, সেই বালক আমি। কোটি বৎসর কার্য করিব যে কার্যালয়ে, সেখানে আমি এখন সম্পূর্ণ বালক। এই মাত্র আসিলাম ভবে, এখন সময় হয় নাই মৃত্যুচিন্তার। একটি জীবনে এক বৎসর কি এক শতাব্দী বস্তুতঃ ঘড়ির এক সেকেণ্ড মাত্র। ত্রিশ গেল, চল্লিশ গেল, ভাবিয়া কেন অস্থির হই? এ দেশে বলে, আশী বৎসরের বৃদ্ধ গেল; আমাদের দেশের লোকে বলে, দুই বৎসরের বালক চলিয়া গেল। এ দেশে বলে, দৌড়ে গেল; আমাদের দেশে বলে, হামাগুড়ি দিতে দিতে গেল। জীর্ণ কলেবর হইলেই কেহ বৃদ্ধ হয় না। মনের সারল্যই বাল্যকাল। মনের স্বর্গ ই স্বর্গ; তাহাই ঈশ্বর রক্ষা করুন। আর এই বাল্যকাল সঙ্গী দ্বারাও জানা যায়। আমি মিথ্যাবাদী— বৃদ্ধসঙ্গ যদি আমি কখনো খুঁজিয়া থাকি। বালকের সঙ্গই আমি চাই; বালককে আমি চুম্বন করি, বালকের মুখের সঙ্গে আমি নিজ মুখ এক করি। বালকের পদধূলি লইতে আমার ইচ্ছা হয়। বালক আমার গোলাপ ফুল; দেখিলে স্বর্গ মনে পড়ে। বালকদের সঙ্গে থাকিব, কেবল এই মনে হয়। যত বৃদ্ধ শ্মশানাভিমুখে যাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগকে দেখিলে কী মনে হয়? মনে হয়, ইহারা নিজে চেষ্টা করিয়া বৃদ্ধ হইতেছে। জীবনবেদের শ্রোতা কেহ থাকো, শ্রবণ করো। মাকে খুব ডাকতে ডাকতে ছেলেমানুষের ভাব আসে। রাজাধিরাজের পূজাই যদি কেবল করো, বৃদ্ধ হইয়া যাইতে পারো। মার পূজা করিয়া কখনো বৃদ্ধ হইলে না; কখনো বৃদ্ধ হইবে না। মার কোলে যতদিন থাকিব, মার স্তন্যপান যতদিন করিব, ততদিন বালকই থাকিব; বৃদ্ধ আর হইব না। পরলোকে গিয়া বিদ্যালয়ে ভর্তি হইব; সেখানেও শিখিব, মাকে মা বলিয়া ডাকিতে হয়— এই মন্ত্র, এই শাস্ত্র।

এই বালকের মশলা ভিতরে; তার সঙ্গে উন্মাদের মশলা। উন্মাদের সঙ্গে কাহারো মেলে না। পৃথিবীর উত্তর, উন্মাদদিগের

দক্ষিণ দিক। উন্মাদের সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান ও গণিত সমুদয়ই পৃথিবীর বিপরীত। সংসারের লোকের মতো হওয়া ঠিক নয়। এইরূপ উন্মাদ হওয়া আবশ্যক। ক্রমাগত এমন সকল কার্য করা চাই, যাহাতে পৃথিবী বলিবে, এ সকল বুদ্ধিমানের কার্য নয়। বিপরীত রকমের কার্য সকল দেখিয়া লোকে উন্মাদ ক্ষেপা বলিয়া উপহাস করিবে। উন্মাদের বিভিন্ন শাস্ত্র; পৃথিবীর লোকে তাহার কথা শুনিয়া কেবল উপহাস করে; আমাদের দেশের লোকে উঁহা যত পড়ে, তত খুশি হয়। পৃথিবীর ক্ষতিলাভ বিবেচনা করিয়া উন্মাদ চলে না; সহস্র বিষয়ে ক্ষতির দিকেই উন্মাদ গমন করে। পৃথিবীর পথে লোকে চলে, উন্মাদ আকাশে চলিতে যায়। উন্মাদ বাড়ি করিবে, কেবল ভাবের উপর। পৃথিবীর লোকে কোটি টাকা পাইলে ধনী মনে করে, উন্মাদ কিছু না থাকিলেও আপনাকে ধনী ভাবে। উন্মাদকে দেখিলেই হাসিতে হয়। যদি এ জীবনে কিছু হাসিবার বিষয় থাকে, তবেই কৃতার্থ হই। পরিহাসের বস্তু জীবনে পৃথিবী দেখিয়াছে। সেই সমস্ত ভাবই জীবনের সোনাভাগ; উন্মাদের বিপরীত ভাব লোহাভাগ। উন্মাদের মতো যতই পৃথিবী ভুলি, ততই সুখের সঞ্চার হয়। যদি দেখি, বুদ্ধি আসিতেছে, তবে ভাবি, ঐ যা, পৃথিবীর লোক হইলাম? কাহাদের দলে পড়িলাম?

সেয়ানাদের সঙ্গে বসিলে মন কেমন করে। মনে হয়, যেন উঠিতে পারিলেই বাঁচি। পৃথিবীর সেয়ানারা যে রাস্তায় চলে, সে দিকে চাহিতে ভয় করে। যে সকল স্থানে তাহারা একত্র হয়, সে সকল জঘন্য স্থানে যাইতে ইচ্ছা হয় না; কার্যানুরোধে গেলেও উঠিতে ইচ্ছা হয়। পাগল চায় পাগলকে; সেয়ানা চায় সেয়ানাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত পাগলের কাছে থাকো, দেখিবে, পাগল এলোমেলো বকিতেছে। যাহারা কল্যকার জন্য ভাবিয়া কার্য করিতেছে, তাহাদের দিকে পাগলের চক্ষু যাইতে চায় না। কোন দিকে চক্ষু যায়? যে দিকে পাগলের আড্ডা; যে দিকে পাগলাগারদ। যেখানে

উন্মাদেরা 'ঈশ্বর ঈশ্বর, হরি হরি' বলিয়া নৃত্য করিতেছে, পাগল সেইদিকেই তাকায় ; সেইখানেই যাইতে চায়। বালক নৃত্য করিল আমার ভিতরে ; এইরূপ উন্মাদও তাহার সঙ্গে ভিতরে নৃত্য করিল। পাগলামির ভাব খুব পরিপক হইল। বুদ্ধিমানের মতো উপাসনা করিলে মনে হয়, ঈশ্বরকে দেখিয়া উপহাস করিয়া হাসিলাম না কি ? বুদ্ধিমানের ন্যায় শাস্ত্র পড়িলে ভাবি, এ কি, ঈশ্বরকে ঠকাইতে আসিয়াছি না কি ? উন্মাদের মতো যে দিন উপাসনা করি, উন্মাদের মতো যে দিন পড়ি, উন্মাদের মতো যে দিন নৃত্য করি, যে দিন কাজগুলি উন্মাদের কাজের মতো হয়, সেইদিন মনে খুব সুখ হয়। দুই ধাতু মিলিল।

তৃতীয় ধাতু মাতালের আসক্তি। সুরাপানের মত্ততা পৃথিবীতে আছে ; আমাদের লক্ষণে তার বৈপরীত্য নাই। কেন ? মাতাল হইলে পরিমাণ বাড়াইতে হয়, আমরাও তাহাই করি। পাঁচ মিনিট উপাসনা ছিল ; এখন পাঁচ ঘণ্টা হইয়াছে। একবার ঈশ্বর বলিয়াই তুষ্ট হইতাম, এখন ঈশ্বর, ঈশ্বর, ঈশ্বর, ঈশ্বর বলিলে তবে তুষ্ট হই ; তাহাতেও হয় না, আরো বলিতে ইচ্ছা করে। আগে একবার তাকাইলেই হইত, এখন তাকাইয়া বসিয়াই থাকিতে হয়। তখন এক প্রকার মদে চলিত ; এখন গরম মদ খাইতে হয়। এখন মনে হয়, বৃহৎ মাতাল যাঁরা— ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ণ মাতলামি করিতেছেন। পৃথিবীতে তেমন নাই ; তেমন দরের মদও এখানে প্রায় দেখা যায় না। হাত জোড় করিয়া প্রার্থনা করি বটে, কিন্তু এ এক দরের ; আর ঈশা মুষা যেমন করেন, সে আর এক দরের। ভাবিতে ভাবিতেই সমস্ত জ্ঞান শূন্য হইয়া যায়। জীবন কেবল মাতলামি করিতেই ভালোবাসে।

মাতালের আর কি লক্ষণ ? যেমন পড়িমাণে বাড়াইতে ইচ্ছা দেখা যায়, হৃদয় যত অগ্রসর হয়, মাতালের মতো ততই সঙ্গী বাড়াইবার চেষ্টা হয়। অধিক সঙ্গী চাই, দল চাই, কীর্তনভূমি বিস্তৃত

করা চাই। এক হাজার লোককে ঈশ্বরের কথা বলিতে পারিলে আগে মন তৃপ্ত হইত, এক হাজার লোকের সঙ্গে কীর্তন করিলেই আগে আনন্দ হইত, এখন ছয় হাজার লোক পাইলেও মন তৃপ্ত থাকে না। মন আরো চায়। দল কবে হরি বাড়াইবেন, স্বভাবতই এই ইচ্ছা হয়। দলে ক্রমাগত সঙ্গী বাড়াইবার চেষ্টা করি। ক্রমাগত যদি সকলে স্বর্গীয় সুধা পান করে, তবেই মনে হয়, জীবনের সাধ মিটিল। যতদিন না একেবারে পূর্ব পশ্চিম পাগল হইয়া যাইতেছে, যতদিন না সকলে স্বর্গীয় সুরাপানে মত্ত হইতেছে, ততদিন এ লোকের এই লাল চক্ষু কিছুতেই তৃপ্ত হইবে না। একলা মাতলামি হইল না; একশ' হাজার লোকের সঙ্গে মাতলামি করিয়াও সুখের শেষ হইল না। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোকের সঙ্গে মিলিয়া মাতলামি করিতে চাই। বালক হইলে বালক দল চায়; পাগল পাগলের সঙ্গই কামনা করে; মাতাল মাতালকেই খোঁজে। হরির পাগল, হরির মাতাল কোথায়, তাহাই কেবল খুঁজিতেছি। আরো বালক হইব, আরো পাগল হইব, আরো মাতাল হইব। স্বদেশের লোক কে-কোথায় আছে, খুঁজিয়া লইব। তিন ধাতুর তিনটি মানুষকে বুকে রাখি, বরণ করি। এই তিন ভাবকে শিরোধার্য রত্ন বলিয়া বহুমূল্য জ্ঞান করি। যতদিন বালকত্ব আছে, পাগলামি আছে, প্রমত্ততা আছে, ততদিনই সুখ ও পবিত্রতা। যে দিন বৃদ্ধ হইব, পাগলামি ছাড়িব, উন্মাদ অবস্থা তিরোহিত হইবে, নেশা ছুটিয়া যাইবে, সেইদিনই মৃত্যুকে আলিংগন করিতে হইবে; ভগবান করুন, যেন এ তিনের সঙ্গে বিচ্ছেদ কখনো না হয়।

হে দীনবন্ধু, হে করুণার অনন্ত সমুদ্র। কি সুখ হয়, যদি তোমার কোলে গিয়া বসিতে পারি। অনেক বয়স হইয়াছে, জ্ঞান হইয়াছে, ধর্ম করিয়াছি, ভাবিলে অপরাধ হয়। কিছু হয় নাই, মার কোলে থাকিব, এই কথা যত মনে রাখি, তত সুখ হয়। বুড়ো হওয়া দূরে থাকুক, তোমার কোল হইতে আর কেহ যদি কোলে

লইতে আসে, ভয় হয়। বৃদ্ধ দেখিলে আমার ভয় করে। আমি মা ভিন্ন আর কিছু চিনিলাম না— এই জ্ঞান মুক্তিপ্রদ জ্ঞান, সুখপ্রদ জ্ঞান। এই জ্ঞানের বৃদ্ধি হউক, এই প্রার্থনা। মা, কেবল তোমার স্তনদুগ্ধই যেন খাই। পৃথিবীতে আসিয়াই আমি অন্ন খাইতে পারিব না, মাংস খাইতে পারিব না। বয়স হয় নাই; দাঁড়াইতে পারিব না। মা, তোমার কোলে থাকিব। শক্ত জিনিস খাইতে পারিব না। দয়াময়ী, তোমার পূজা করিতে করিতে যত স্তনদুগ্ধ পান করিলাম, বাল্যাবস্থায় যত সুখ পাইলাম, ততই আমার পাগল আর মাতালের ভাব হইতে লাগিল। মনে হইল, ধুতরা আছে, কি মদ আছে, মার স্তনের দুগ্ধ খাইলে যেন শিশুর আবল্য ধারণ করে। যতবার তোমার দুগ্ধ টানিয়াছি— মা, ততবারই বিভোর হইয়াছি। সাদা চক্ষে যদি বক্তৃতা করিতে যাই, ভুল হয়। সাদা চক্ষে সাধন করি, হয় না। নেশা হইলে, এ সব বেশ হয়। দয়াময়ী, দয়াময়ী বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তোমার স্তনদুগ্ধ মুখে আসে, ধুতরার মতো কি এক পদার্থ তুমি দুধের সঙ্গে মিশাইয়াছ, তাহাই খাই, আর পাগল হই। কত এলোমেলো বকি, কত মাতলামি করি। মা, এতেই আমি সুখী থাকি। এই পাগলামি মাতলামি ভালো। পৃথিবীর জ্ঞানী হইতে চাহি না। বালক করিয়া রাখিও; বৃদ্ধ যেন কখনো না হই। মাথার চুল যদি পাকে ক্ষতি নাই; আত্মার বার্ধক্য যেন না হয়। দোহাই ঠাকুর, বালক থাকা বড়ো সুখের। প্রাণের ভিতর গোলমাল নাই, শিশুর মতন উপাসনার সময় সহজ কথা কহিব। আঁকাবাঁকা চাই না; কুটিল হইলে সুখ হইবে না। বৃদ্ধের বিষ বালক-অঙ্গে প্রবেশ করিতে দিয়ো না। তুমি মা, আমায় হাতে করিয়া দোলাইবে, মুখ চুম্বন করিবে— ইহাই চাই। ব্রহ্মমন্দিরের প্রার্থনা শোনো; আমাদের কোলে তুলিয়া আদর করো। কৃপাময়ি, কৃপা করিয়া আশীর্বাদ করো, চিরকাল বালক থাকিব; পাগল, মাতালের প্রকৃতি লইয়া বাস করিব। যাহা কিছু বার্ধক্য সঞ্চয় করিয়াছি, পরিত্যাগ করিয়া যেন বালক হই।

দয়াময়ী, তোমার ধর্মরস পান করিয়া খুব উন্মত্ত অবস্থা লাভ করিব, বালকের মতো, পাগলের মতো নাচিব, নাচিতে নাচিতে স্বর্গে প্রবেশ করিব, এই আশা করিয়া ভক্তির সহিত তোমার শ্রীপাদপদ্মে বারবার নমস্কার করি!

(রবিবার, ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক; ১০ ডিসেম্বর, ১৮৮২ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত।)

জাতি-নির্ণয়

যদি মানবমণ্ডলীকে ধনী এবং দরিদ্র জাতিতে বিভাগ করা যায়, আমি আমাকে কোন শ্রেণীতে বিভক্ত করিব? হে আত্মন্, তুমি কোন জাতীয়? ধনীর সন্তান, কি দীনের সন্তান? ধনবানের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, কি দরিদ্রজাতির মধ্যে পরিগণিত— এ জীবনে অনেকবার এ কথা আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছে। এ কথার মীমাংসা জীবনবেদের একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ। ইহা জানা আবশ্যক, আত্মা কোন জাতিতে জন্মিল। কি প্রকার স্বভাব, রুচি ও অভিপ্রায় কোন জাতির মতন, স্বভাবত কোন দলে মিশিতে ইচ্ছা, কার্যপ্রণালী কাহার ন্যায়, স্বভাবত ইহা জানিতে ইচ্ছা হয়। সর্বাগ্রেই জানিতে ইচ্ছা করে, আমি কোন জাতীয় মানব। অনেক অনুসন্ধানে এবং পঁচিশ বৎসরের সূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে, মনের কামনা, অভিরুচি তন্ন তন্ন করিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে যে, আত্মা দরিদ্রজাতীয়। শরীরের রক্ত দুঃখীর রক্ত, মাথার মস্তিষ্ক দীন জাতির মস্তিষ্ক। যাহা কিছু আহার ব্যবহার দৈনিক, প্রচুর পরিমাণে তাহাতে দরিদ্রতাই লক্ষিত হয়। অনুমান দ্বারা যদি এ কথার সিদ্ধান্ত করি, কথা মিথ্যা হইবে; বেদী হইতে মহাপাপ হইবে। মনের গভীরতম রুচি অনেক বৎসর হইতে পর্যবেক্ষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম। সত্য সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি, ইহাতে অনৃত বচন নাই, ভ্রান্তি নাই, অনুমানের কথা নাই। অনেক বিচারে পরীক্ষিত হইয়া দীন বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছি।

যদিও উচ্চকুলোদ্ভব, যদিও নানাপ্রকার ধনসম্পদ ঐশ্বর্যের পরিচয় দিতেছে, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার অনুরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। ধন আছে কিন্তু ধনের প্রয়াস নাই; উপাদেয় আহার্য আছে, কিন্তু আহারস্পৃহা নাই; মন সামান্য বস্তুতেই সন্তুষ্ট। মান-মর্যাদা চারি দিকে আছে, কিন্তু মন সে সকলের খবর লয় না।

দুই দলের লোক আসিলে, ধনী ছাড়িয়া মন দরিদ্রের খোঁজ লয়; দরিদ্রসহবাসে মন পরিতৃপ্তি বোধ করে। এই সমস্ত দেখিয়া সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, মন কোন জাতীয়। এই পরীক্ষা বিচারককে ভ্রান্তিতে আনিতে পারে না; ইহাতে ভুল হইতে পারে না। কেন না, বিশেষ অবস্থায় পরীক্ষা হইয়াছে। হৃদয় যদিও দীন, বাহ্য উপকরণ ধনাঢ্যের। শীঘ্রই এ অবস্থায় আত্মাকে পরীক্ষা করা যায়। ধনীর অট্টালিকায় না জন্মিয়া যদি দরিদ্রের পর্ণকুটীরে জন্মিতাম, তাহা হইলে পরীক্ষা করা কঠিন হইত। মনের ভিতর হয়তো ধনসম্পদের উষ্ণতা থাকিত। হয়তো কেবল বাধ্য হইয়াই গরীবের চালে চলিতাম। বাহিরে ধনীর ভাব, ভিতরে আছে কি না, ইহা দেখা উচিত। যখন ধন পরিত্যাগ করিয়া মন দারিদ্র্য অন্বেষণ করে, তখন বুঝিতে হইবে, দরিদ্রতা মনের স্বাভাবিক ভাব; মন দরিদ্রজাতীয়।

ধনাঢ্য পিতা পিতামহের দ্বারা পালিত ও বাহ্যিক ঐশ্বর্য সম্পদে বেষ্টিত হইয়াও, মন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক দৈন্যের পরিচয় দিতে লাগিল। সামান্য আহারে মন তৃপ্তি বোধ করে; দৈন্যসাধন ইহার স্বভাবসিদ্ধ। বহুকষ্টে দীনতা সাধন করিতে হয় না, শাকান্নেই আমি লোভী। আসক্তি যদি কোনো পদার্থে থাকে, তবে সে পদার্থ শাক। এ কথা আমার জীবনে অতি অপূর্ব তত্ত্ব প্রকাশ করে। ইহাতে অন্যের মনোরঞ্জন না হউক, আমার পক্ষে ইহা অতি চমৎকার বিষয়। হৃদয় স্বভাবত শাকেতে এত তৃপ্তি বোধ করে, এত সুখ, আরাম পায়, এত তৃপ্তি এবং আনন্দ মন এই সামান্য বস্তুতে দেখিতে পায় যে, তাহাতেই বুঝিলাম, আমার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ করুণা। বাষ্পীয় শকটে যদি কোনোখানে যাইতে হয়, তৃতীয় ছাড়িয়া প্রথম শ্রেণীতে যাইতে ভয় হয়। মনে হয়, বুঝি অনধিকার চর্চা করিতেছি; ভয় হয়, বুঝি ধনীর রাজ্যে যাইতেছি। সমস্ত সময় উদ্বিগ্ন হইতে হইবে, বিজাতীয় ভাব ও বস্তু সকলে মনের তৃপ্তি অন্তর্হিত, শান্তিরসের ভঙ্গ হইবে। মন পলকের মধ্যে সিদ্ধান্ত করে, প্রথম

ছাড়িয়া দ্বিতীয়ে এবং দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে যাওয়াই স্বভাবসিদ্ধ। সিদ্ধান্ত করিতে কালবিলম্ব করা সম্ভব নয়; আরামের জন্য দুঃখী দরিদ্রদের আধারের দিকেই মন যাইতে চায়।

যদি তৃতীয় শ্রেণী ছাড়িয়া প্রথম শ্রেণীতে যাইতে হয়, তাহা কর্তব্যানুরোধে হইতে পারে; কিন্তু স্বভাবকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'সুখ ঐস্থানে; উদ্বেগবিহীন যেমন তৃতীয় শ্রেণী, প্রথম শ্রেণী তেমন নয়।' এই যুক্তিতেই বুঝা যায়, আমি ধনীদের জন্য নই, দরিদ্রদের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছি। যেখানে দরিদ্রেরা, সেইখানেই আমার আরাম; জীবন-রক্ষা সেইখানেই। আয়াস দ্বারা এ সকল দরিদ্র ভাব শিক্ষা করি নাই; আপনা আপনি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। রাস্তায় যদি চলিতে হয়, দরিদ্রের মতোই চলি। নগর-কীর্তনে দুঃখীদের মতো চলিতে হইবে, কে বলিল? এ যে দুঃখীর লক্ষণ; কাহার নিকট ইহা শিক্ষা করিলাম? ভাবিলাম না, ধনীরা ইহাতে কি বলিবেন। সংবাদপত্রে হয় তো পরিহাসসূচক কথা বাহির হইবে, মানহানি হইবে, জানিয়াও কেন ইহা করিলাম? কেন করিলাম, তাহা চিন্তা করিলাম না; উহা যে চিন্তার বিষয়, তাহাও মনে করিলাম না। কিন্তু বিনামা পরিত্যাগ করিয়া আপনা আপনি চলিলাম। তোমাকে শিখাইলাম না, হে আত্মন্, অথচ দরিদ্রতা শিখিলে। কুটীরে রাখিলাম না; স্বভাবত ধূলির মধ্য দিয়া হৃদয় চলিতে চাহিল। এ বিষয়ে আরো অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করা যায়। পৃথিবী বুঝুক আর না বুঝুক— আমি ঠিক বুঝিয়াছি, আত্মা দীনের আত্মা, মনটা দুঃখীর মন, শরীরটা দুঃখী দরিদ্রের শরীর। সকল বিষয়েই দৈন্য দারিদ্র্যের লক্ষণ প্রকাশিত।

বড়ো ধনীদের সঙ্গে বসি? বড়ো লোকের করস্পর্শ করি? এ সকল করিলেই কি স্বভাব যাইবে? চণ্ডাল কি ব্রাহ্মণস্পর্শে ব্রাহ্মণ হইবে? শাকান্ন-ভোজী একদিন সম্রাট-গৃহে আহার করিলেই কি ধনী হইবে? এ স্বভাব কিছুতেই যাইবে না। এইজন্য সকলের সঙ্গে

মিশিয়া নিরাপদ আছি। জাতি টের পাইয়াছি। কে কে এই জাতির লক্ষণযুক্ত, ইঙ্গিতে বুঝিলাম, ইশারায় নিরূপণ করিলাম। কিন্তু একটি কথা আমার শাস্ত্রে লেখা আছে, তাহাও বলা উচিত। যদিও নির্ধন দীনদের সঙ্গে আমি আছি, যাহাদের ছিন্নবস্ত্র, গরীব যাহারা, যদিও তাহারাই আমার প্রাণের বন্ধু, অল্পে তুষ্ট যাহারা, যদিও তাহারাই আমার প্রাণের সখা, তথাপি আমি সে কথা শিক্ষা করিয়াছি। কথিত ছিল, ধনীকে ঘৃণা করিয়া দীনকে মান্য দিবে: পরাক্রমশালীকে অগ্রাহ্য করিবে; পরিত্রাণের পথে ধনীরা যাইতে পারে না। মান, সম্পদ, গৌরব যেখানে, সেখানে ধর্ম নাই; পর্ণকুটীরেই কেবল ধর্ম বাস করেন। কিন্তু এখনকার শাস্ত্রে নববিধানের মতে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ধনীকে মান দিবে এবং দুঃখীকেও মান দিবে। স্বর্গের পথে ধনী দুঃখী উভয়েই চলিতেছে। বাহিরে ধন থাকিলে ক্ষতি নাই, মনে দুঃখী হইলেই হইবে। বাহিরে ধন আছে বলিয়াই কি একজন স্বর্গের পথে চলিতে পাইবে না? দুঃখীকে কাছে টানিবে, ধনীকেও কাছে টানিবে। পক্ষপাতশূন্য হইয়া দুজনকেই প্রেমদান করিবে।

নববিধানের নব কথা, নব উপদেশ। ধর্ম যিনি, তিনি রাজপ্রাসাদে, তিনি পর্ণকুটীরে। ভক্ত যিনি, তিনি নবাবকে প্রেমালিংগন দেন, সামান্য চণ্ডালকেও প্রেমালিংগনে বদ্ধ করেন। প্রেমিক নরপতির কাছে যেমন, দুঃখীর কাছেও তেমনিই। তাঁর কাছে ধনী, ধনী নয়; দরিদ্রও দরিদ্র নয়; মনুষ্য হইলেই তিনি প্রেম দেন। এই কথাই আমার হৃদয়ে প্রবল হইল; হইবারও কারণ আছে। যদিও আমি হীন স্বভাব ও দীন মন পাইয়া মাতৃগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যদিও ভূমিষ্ঠ হইয়াই বুঝিলাম, আমি দীন হীন; কিন্তু চারি দিকে চাহিয়া দেখিলাম, ধনীদের মধ্যে জন্ম, প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দাস-দাসী, ঐশ্বর্যের মধ্যে অবস্থান। উত্তরে দক্ষিণে কেবল ঐশ্বর্যেরই ব্যাপার। ভিতর বাহিরে যুদ্ধ হইতে লাগিল। মনে মনে

জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন চণ্ডালের ঘরে জন্মিলাম না? যেখানে দাস-দাসী, গাড়ি-ঘোড়া নাই সেখানে কেন আমার জন্ম হইল না? দুঃখীকে কেন ভগবান ধনীদের সঙ্গে দিলেন? বাল্যকালে ধনী বালকদের সঙ্গে ও যৌবন সময়ে কেন ধনী যুবাদের সঙ্গে বেড়াইলাম? বয়স বাড়িলে উচ্চবিদ্যা-শিক্ষার্থ উচ্চ বিদ্যালয়ে কেন যাইতে হইল? ঈশ্বর জানিতেন, তাহার ভিতরেও গভীর অর্থ আছে। সে সকল কি জন্য হইয়াছিল, তখন বুঝিতে পারি নাই।

দীনজাতীয় হইয়া যদি দীনের ঘরে থাকিতাম, দীন ব্যবহার করিতাম, তাহা হইলে হয়তো দীনদিগেরই পক্ষপাতী হইতাম; ধনীর মস্তকে হয়তো কুঠারাঘাত করিতে চাহিতাম। কে বলিতে পারে যে, দীনগৃহে থাকিলে নিরপেক্ষ হইতাম? প্রাণেশ্বর ধনীর ঘরে জন্ম দিলেন; ঘনীভূত দৈন্য অন্তরে, লক্ষ্মীর প্রকাণ্ড সংসার চক্ষের সমক্ষে রাখিলেন। বাহিরে ঐশ্বর্য থাকিলেও চক্ষু বন্ধ করিয়া নির্ধনের ব্যাপার দেখিতে পাইলাম। এই দ্বিজাতীয় ভাবের মধ্যে থাকিয়া সহস্রবার ঈশ্বরকে নমস্কার করিলাম। ধনীর পক্ষপাতী হইলাম, দুঃখীরও পক্ষপাতী হইলাম। সকল প্রভেদ ভুলিলাম; বর্ণভেদ, জাতিভেদ ভুলিয়া সকলকে প্রেম দিলাম। এখন দুই বাহু প্রসারণ করিয়া নববিধানে ধনীকে আনিতেছি, পরিব্রাজক সর্বত্যাগী অতি দীনকেও আলিংগনবদ্ধ করিয়া আনয়ন করিতেছি। একপার্শ্বে ধনী-বিদ্বানকে বসাইতেছি, আর একপার্শ্বে দীন-দুঃখীকে আসন দিতেছি। পুস্তক পড়েন যিনি, তাঁহাকে আনিতেছি; যিনি পুস্তক না পড়েন, তাঁহাকে আনিতেছি। সকলেই আসিয়া প্রেমালিংগন গ্রহণ করিতেছেন; সকলেই আসিয়া নববিধানের ঘর পূর্ণ করিতেছেন।

আজ কি সুখের দিন! ভাগ্যে দ্বিজাতীয় স্বভাব দেখিলাম। উচ্চজাতীয়, নীচজাতীয়, বিদ্বানজাতীয় মূর্খজাতীয়, এই দ্বিজাতির সন্ধিস্থলে ভাগ্যে জন্মিয়াছি। এইজন্যই এখন বলি, 'হে দয়াল, ধনীর ধন আছে বলিয়াই কি তোমায় পাইবে না? পণ্ডিত সংস্কৃত

পড়িয়াছেন বলিয়াই কি তোমার গৃহে আসিতে পাইবেন না? যিনি কিছুমাত্র বিদ্যা অর্জন করেন নাই, তাঁহাকে কি তুমি তাড়াইয়া দিবে?' নববিধান বলেন সকলেরই জন্য ঈশ্বরের বাহু প্রসারিত। হও দুঃখী; কিন্তু আকর্ষণ করিয়া সকলকেই ঈশ্বরের গৃহে আনয়ন করো। বলিতে বড়ো ইচ্ছা হয়, অন্তরে এই যে দীনজাতীয় ভাব, ইহা হইতে অনেক উপকার হইল। এই দীনতার জলে অহংকার-আগুন নিবাইয়াছি; ধন, বিদ্যার গৌরব তাড়াইয়াছি। শান্তি লাভ করিলাম, এই জলে। কর্তব্যের অনুরোধ বড়ো ঘরে যাই, ধনীর কাছে যাই, আচার ব্যবহারে বড়ো পরিবারে আবদ্ধ হই; তথাপি জানি— আমি হীন, চিরহীন; নীচ, অতি নীচ। নিজে হইলাম দীন, মান দিলাম দুঃখী ধনী উভয়কেই; প্রেমে উভয়কেই আলিংগন করিলাম। নিজে দীন-দরিদ্রজাতীয় থাকিলাম, ইহাতেই সুখ, শান্তি; দীনাত্মারই পরিত্রাণ।

হে দীনবন্ধু, হে করুণাময়, পৃথিবীর উচ্চপদ পাইয়া মন কত সময় অহংকারে গর্বিত হয়; ধন, মানের মধ্যে থাকিয়া হৃদয় কত সময় বিচলিত হয়। কিন্তু হে ঈশ্বর, জন্ম হইতে, বাল্যকাল হইতে যাহাকে দীনতায় স্থির করিয়া রাখো, অহংকার কিরূপে তাহার কাছে স্থান পাইবে? আমি দীনজাতীয় বলিয়া দীনদের দলে কত ফল লাভ করিলাম, দীনদের সঙ্গে নগর-কীর্তনে কত মাতিলাম। অনেক ধন, মানের মধ্যেও প্রচুর ফল লাভ করিলাম। যদি বড়ো মানুষের জাতীয় হইতাম, বড়ো পাপ করিতাম। সামান্য শাকান্নে যদি আসক্তি না থাকিত, হে দীনহীনগতি, আমি তাহা হইলে তোমায় চিনিতাম না; বেদীতে আজ বসিতাম না। তুমি দেখিলে, সন্তানকে ধনীজাতীয় করিলে সে ধনের গরমে মরিবে; তাহাকে দীনজাতীয় করা উচিত। বিপদ জানিয়া, অহংকার, মৃত্যু বিনাশ করিবে দেখিয়া, দয়াসিন্ধু, তুমি বলিলে, সন্তানকে দুঃখীর মন দিই, গরিবের আত্মা দিই, রুচিগুলি দুঃখীর মতো করিয়া দিই। দীনজাতীয় হইয়া আসিয়া অবধি কত সুখই পাইলাম; সকলেরই কারণ দেখিলাম, এই দৈন্য।

দৈন্য-স্বভাব আমার পক্ষে অভিসম্পাত না হইয়া আশীর্বাদ হইল। এত বিপদ মস্তকের উপর দিয়া গেল, কিছুতেই কিছু হইল না। উচ্চপদে কত উঠিতেছি, কত উচ্চলোকের করস্পর্শ করিতেছি, ধনের উষ্ণতা বোধ করিতে হইল না। ব্রাহ্মদলের মধ্যে আমার কাছে যত প্রলোভন আসিয়াছে, এত যে কাহারো কাছে আসে নাই; পরীক্ষা যে কাহারো হইল না। আমার সংসারের ভিতরে রাজার সংসার আসিয়াছে, মান্য অনেক দূর উঠিয়াছে, কিন্তু জাতি আমার গেল না। তোমার প্রতি মতি থাকাতে বড়ো তুফানের ভিতরেও মরিলাম না। আমি নাকি সেই মাদুরই প্রস্তুত করিতেছি, জাতীয়স্বভাবে গুড় বেচিয়া নাকি রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইতেছি। সামান্য ছোটো সঙ্গই নাকি খুঁজিতেছি, তাই বাঁচিয়া গেলাম; নতুবা ধন-সম্পদের মধ্যে ডুবিয়া মারা যাইতাম। বুঝিলাম, তুমি যাহাকে বাঁচাও, তাহাকে মারে কে? ঠাকুর, দীনতা আমার পরিত্রাতা। এখন তোমার কাছে থাকিয়া ডাকিতেছি; ধনীকে ডাকিতেছি— ধনী, এস; গরীবকে ডাকিতেছি— ভাই, তুমিও এস। ধনীর সংসারে ছিলাম, ধনীরা ডাকেন, সেখানে যাই; বড়ো মানুষকে ভালোবাসি, রাজা রানীকে ভালোবাসি; মহারানীকে ভক্তি দিই, বিদ্বানদেরও ভক্তি দিই। এখন ধনীর সঙ্গে মিশিলেও ভয় আর নাই। সিদ্ধ হইলে আর ভয় থাকে না। হে দীনবন্ধু, ধর্মের শান্ত ভাব, দীনতার ভাব সকলকে দাও। দুঃখী আমরা যথার্থই। আমাদিগের নববিধান যে দুঃখীদের বিধান। আমরা দুঃখীর মতো রাস্তায় চলিব, ধূলি হইয়া যাইব, দন্তে তৃণ করিব; তবে হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইব। কৃপা করিয়া এই আশীর্বাদ করো, যেন আমরা সকলেই দীনাত্মা হইয়া পৃথিবীতে যে পবিত্র স্বর্গীয় সুখ, তাহাই সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হই।

(রবিবার, ৩ পৌষ, ১৮০৪ শক; ১৭ ডিসেম্বর, ১৮৮২ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত।)

শিষ্য-প্রকৃতি

এই পৃথিবী ব্রহ্মবিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে যতদিন থাকিতে হইবে, ধর্মোপার্জন ও জ্ঞানচর্চা করিয়া ব্রহ্মকে লাভ করিব। এইজন্যই আপনাকে কখনো শিক্ষক মনে করিতে পারি নাই; শিক্ষক বলিয়া কখনোই আপনাকে বিশ্বাস করিব না। শিষ্য হইয়া আসিলাম, শিষ্যের জীবন ধারণ করিতেছি, শিষ্যই থাকিব অনন্তকাল। শিখধর্মের প্রধান ধর্ম শিক্ষা করা, আমার শোণিতের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সেই ভাব হইতেই জীবনতরু দিন দিন সবল ও সতেজ হইতেছে; শোণিতের মধ্যে সেই ভাব দিন দিন প্রবল হইতেছে। শিক্ষা করিয়াছি, শিক্ষা করিতেছি; প্রবল কামনা আছে, চিরকালই শিক্ষা করিব। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্ন সময়ে শিক্ষা করিয়া থাকি, সম্পদে বিপদে ধর্মগ্রন্থের নানা পরিচ্ছেদ অধ্যয়ন করি। প্রাণীমাত্রই আমার গুরু, বস্তুমাত্রই আমার শিক্ষক, মনুষ্য-প্রকৃতির নিকটেও আমি অনেক বিষয় শিক্ষা করি। চক্ষু খুলিলে বিদ্যালয় দেখিতে পাই, চক্ষু বন্ধ করিলে আরো প্রকাণ্ড বিদ্যালয়। শিক্ষা করিবার স্পৃহা যেমন আমার, শিক্ষার বস্তুও তেমনি অপর্যাপ্ত। বিবিধ সত্য, পরিত্রাণপ্রদ জ্ঞান চারি দিকে বিবৃত রহিয়াছে। গ্রন্থাভাব আমি কখনোই দেখিলাম না; শিক্ষার যে কোনো দিন বিরাম হইবে, এ কথা বিশ্বাস করিলাম না। শিক্ষাই আমার ব্যবসায়, শিক্ষাতেই জীবন; সুখ শিক্ষাতে, পরিত্রাণ শিক্ষাতে। শিক্ষা করিয়া করিয়া এত সত্য ধন পাইয়াছি, বলিয়া শেষ করা যায় না। এখন মনে হইতেছে, আরো কত ধন প্রাপ্ত হইব। কখনো আমার মনে হইল না যে, শিক্ষার শেষ হইয়াছে।

কত গুরুর নিকট হইতেই সত্য শিখিতেছি। আকাশ গুরু, পাখি গুরু, মৎস্য গুরু, সকল গুরুর নিকটেই শিষ্যত্ব স্বীকার

করিয়াছি। কর্তব্যবোধে যে ইহা করিয়াছি, তাহা নহে; ধর্মানুরোধেও ইহা হয় নাই। ইহার জন্য স্বভাব উপযোগী হইয়া রহিয়াছে। ইহাতেই আমার সুখ হয়। আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া আবিষ্কর্তার মনে যত না সুখ হইয়াছিল, কোনো চমৎকার বস্তু দর্শন করিয়া দর্শকের যত না সুখোদয় হয়, বোধ হয় তদপেক্ষা আমার গভীর সুখ হইয়া থাকে— যখন আমি ধর্ম বা নীতি সম্বন্ধে কোনো নূতন সত্য লাভ করি। আনন্দ হয় আমার মনে কখন ? যখন আমি কোনো সত্যকে ধরিতে পারি। নিজ বুদ্ধিতে কখনো আমি সত্য লাভ করি নাই; বিবিধ শাস্ত্র মন্থন করিয়া, এক একটি সিদ্ধান্ত করা আমার ব্যবসায় নয়; এ শিক্ষা আমার নয়। ঘোরান্ধকার মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রকাশ যেমন, তেমনিই আমাতে সত্য প্রকাশ হয়। কোনো বস্তু দেখিতেছি কি কোনো কাজ করিতেছি, গাছের পানে তাকাইয়া আছি, কে যেন আমার নিকট সত্য আনিয়া দেয়। মনের ভিতর একটি সত্য আসিল, অমনিই হৃদয় বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল, সমস্ত জীবন আলোড়িত হইল। মনে ধাক্কা দিয়া এক একটি সত্য আসিয়া থাকে। কত সত্য আসিয়াছে। ইতিপূর্বে যত সত্যের আবিষ্কার হইয়াছিল, মিলাইয়া দেখিয়াছি, তৎসমুদয় হইতে সম্পূর্ণ নূতন। নিত্য নূতন সত্য লাভ করিয়াছি; লাভ করিবামাত্র মনে সন্তোষ ও শান্তির উদয় হইয়াছে। হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে দেখিলাম, আনন্দময়ী জননী অধ্যাত্মরাজ্যে ভক্তদিগকে এইরূপেই সত্য দান করেন। যেই একটি সত্য প্রকাশিত হয়, জীবনে বিশেষরূপে উপকার করিয়া থাকে।

সত্য-প্রকাশে বুদ্ধি যেমন চরিতার্থ হইল, পুণ্যে সেইরূপ জীবন সুশোভিত হইল। বিশেষ কথা এই, সত্য লাভে আমার প্রভূত আনন্দ হয়। আনন্দ না হইলে কেহ শাস্ত্রব্যবসায় গ্রহণ করে না। জ্ঞানলাভে কৃতার্থ হইয়া আমি কি শাস্ত্রব্যবসায় লইয়াছি? নির্দিষ্ট পাঠে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া আমি সিদ্ধ হইয়াছি, অধ্যাপক হইয়াছি—

এ কথা কি বলিব ? গুরুর নিকট যাহা শেখা উচিত, তাহা শেখা হইয়াছে, এ সেবকের মনে এ ভাব কখনোই হইল না। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যখন উপদেশ দিয়াছি, তখনো এ ভাব মনে হয় নাই ; ব্রহ্মমন্দিরের সম্মানিত স্থান পাইয়া আজো তাহা মনে হইতেছে না। শিক্ষা আমার শেষ হইয়াছে, এখন শিক্ষা দিতে হইবে— এ কথা কখনো মনে আসে নাই। যখন পড়িয়াছি, তখন এ ভাব মনে হয় নাই ; যখন পড়াইয়াছি, তখনো এভাব মনে হয় নাই। যখন শিখিয়াছি, তখন আমি শিষ্য ; যখন শিখাইয়াছি, তখনো আমি শিষ্য। পাঁচ জনের সঙ্গে সাধন করিয়া তত্ত্ব সঞ্চয় করি ; হৃদয়ের মধ্যে সত্যরত্ন পাইলেই আহ্লাদ হয়। মনে হয়, সৌভাগ্যবশতই মেদিনীতে আসিয়াছি ; মনুষ্যজীবন সৌভাগ্যের জীবন। শিক্ষা করিলে যত আনন্দ হয়, দিলে কি তত আনন্দ হইয়া থাকে ? সত্য-লাভ অপূর্ব আনন্দের হেতু। সত্যের সঙ্গে আত্মার একটি সম্বন্ধ আছে ; সত্য পাইলেই মনে হয়, আমি একটি নূতন জগৎ অধিকার করিলাম, অধ্যাত্মরাজ্যের এক প্রকাণ্ড সম্পত্তি আমার হস্তগত হইল। যার সুর বোধ আছে, সে তানপুরা কি সেতার লইয়া, ইংলণ্ড দেশীয় কি ভারতবর্ষীয় কোনো যন্ত্র লইয়া, সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে যদি নূতন একটি সুর আবিষ্কার করিতে পারে, তবে তাহার আনন্দের সীমা থাকে না। সুরসিক হৃদয়ে কি আনন্দেরই সঞ্চার হয়। আমার গলার অস্থির মধ্য হইতে নূতন সুর আসিল, সরস্বতী আমার নিকট একটি নূতন সুর প্রেরণ করিলেন, ভাবিতে ভাবিতে সে ব্যক্তি আনন্দে বিহ্বল হইয়া যায়।

নূতন রত্ন লাভ করিলে বস্তুতই হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। সামান্য ধীবর নদীতে মাছ ধরিতেছে। রোজ রোজ অধ্যবসায় সহকারে মাছ ধরিয়া যদি সেই পুরাতন পোনা কিম্বা রুই মাছ প্রাপ্ত হয়, তাহার জীবনের উপায় হয়, পরিশ্রম সার্থক হয়। তাহা ভিন্ন আর কোনো সুখ হয় না ; কিন্তু একদিন সোমবার প্রাতে যেমন জাল

ফেলিয়াছে, পুরাতন জাতীয় মাছের পরিবর্তে, যাহা কখনো দেখে নাই ও শোনে নাই, এমন এক নূতন জাতীয় মৎস্য যদি দেখিতে পায়, আনন্দের শেষ থাকে না। তাহার শরীরের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত আনন্দতড়িৎ প্রবাহিত হইতে থাকে। যিনি চিত্র করেন, যাহা শিক্ষকের নিকটে শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই আকার প্রকার, সেই লক্ষণ যেমন শিখিয়াছিলেন, তেমনই উৎপন্ন করেন। চিত্র করিতে করিতে যদি নূতন বর্ণ বাহির হয়, নূতন কোনো ভাব ব্যক্ত হয়, নূতন লক্ষণ চিত্রে চিত্রিত হয়, 'ধন্য আমার স্রষ্টা, ধন্য পৃথিবী' বলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ করিয়া, চিত্রকর নিজ সৌভাগ্যের পরিচয় দিতে থাকেন। যাহা শিখি নাই, তাহা কিরূপে হইল ? কোথা হইতে তাহার উৎপত্তি হইল ? এই ভাবিয়া চিত্রকর বিস্ময়ান্বিত হইয়া পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিতি করেন। চিরকাল গ্রহ নক্ষত্র দেখিয়া আসিতেছেন, এরূপ জ্যোতির্বিদ কখন আনন্দ প্রাপ্ত হন ? যখন সেই পণ্ডিত, সেই বিজ্ঞানবিদ নভোমণ্ডল দেখিতে দেখিতে একটি নূতন নক্ষত্র আবিষ্কার করেন, তখন তিনি চারি দিকে আপনার হৃদয়ের অতুল আনন্দ ঘোষণা করিতে উদ্যোগী হন। কোটি টাকা পাইলেও লোকের সেরূপ আনন্দ হয় না; সম্রাটের সিংহাসন লাভ করিলেও তত আহ্লাদ হওয়া সম্ভব নহে। তিনি মনে করেন, আমি যে আজ নূতন নক্ষত্র আকাশমণ্ডলে দর্শন করিলাম, আমি যে একটি নক্ষত্রকে আবিষ্কার করিতে পারিলাম, ইহাতেই আমার পরম সুখ। নূতন নক্ষত্র দেখিতে পাইয়া জ্যোতির্বিদের যত সুখ, নূতন সত্য লাভ করিলে আমার ততোধিক সুখ ও আনন্দ সঞ্চার হয়।

কে ধনী হইবার কামনা করে, কে নৃপতি হইতে চায় ? ব্রহ্মপ্রসাদে যদি নূতন সত্য সমাগত হয়, তবে সেই সত্য লাভ করার ন্যায় আর কিছুতেই সুখ নাই। শিশু-প্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়াই আমি সেইজন্য আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছি। বিদ্যালয়ের ন্যায় এখনো

ছাত্রের ব্রত দেখিতেছি। চারি বেদ কখনোই পড়া হইল না; শিষ্যত্ব আর ঘুচিল না। প্রকাণ্ড হিমালয় ব্রহ্মজ্ঞানের উচ্চতার পরিচয় দিতেছে। জ্ঞান যে শিক্ষা করিয়া শেষ হইবে না, চারি দিকেই তাহার নিদর্শন দেখিতেছি। কি সাধারণরূপে, কি বিশেষরূপে, দুই রূপেই দেখিতেছি জ্ঞানের শেষ নাই। কি ভক্তি সম্বন্ধে, কি ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে, শিক্ষার অন্ত হইল না। সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় কিরূপে হয়, এ সম্বন্ধে ব্রহ্ম-প্রমুখাৎ কত আশ্চর্য কথা শুনিয়াছি, তত্রাপি ফুরাইল না। গুরু যার জাগ্রত জগদগুরু, তার শিক্ষার অভাব কি? সামান্য গুরুর নিকটে ছাত্র হই নাই। আমার গুরু জগদগুরু। তিনি কেবলই শিখাইতেছেন; যতই শিক্ষা করি, ততই অহংকার চূর্ণ হয়। চল্লিশ বৎসর চলিয়া গেল, তথাপি শেখা আর সম্পূর্ণ হইল না; কত প্রার্থনাতত্ত্ব শিখিলাম, তথাপি শেখা হইল না; দয়াল নাম কেমন করিয়া করিতে হয়, আজো সম্যক জানা হইল না। ভালোবাসার শব্দার্থ কি? প্রেম মানে কি? জানিয়া শেষ করা হইল না। সেইজন্যই আপনাকে ধিক্কার করি। যেই ধিক্কার করি, অমনিই সত্য শিক্ষা করি। ধন্য আমি, এইরূপে অনেক সত্য শিখিয়াছি। ধন্য আমি, এখনো সেইরূপ শিখিতেছি; এখনো আমি শিক্ষক হই নাই।

শিক্ষক হই নাই বলিয়া কি চিরকাল স্বার্থপরের ন্যায় থাকিব? জ্ঞানলাভ করিয়া কি কাহাকেও দিব না? কৃপণের ন্যায় আমার ধন কি আধারে চিরাবদ্ধ থাকিবে? 'গ্রহণ-মন্ত্র' সাধন করিলাম, 'প্রদান-মন্ত্র' আমি কখনো লই নাই। 'দান' আমার মূলমন্ত্র নয়। সত্য আসিলেই বাহির হইবে, এই স্বভাবের নিয়ম। আমাদের দেশের লোকের স্বভাব এমনই যে, সত্য আসিলেই প্রকাশিত হয়। যাঁহারা আমাদের দেশ হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের ঘরের দুইটি দ্বার আছে। এক দ্বার দিয়া আমদানি, আর এক দ্বার দিয়া রপ্তানী হয়। আসে এক পথ দিয়া, যায় এক পথে। সত্য আসিয়া জগতে

যায়; জগতে দ্বিগুণ হইয়া অন্তরে প্রবেশ করে; চারগুণ হইয়া আবার বাহিরে যায়; শতগুণ হইয়া আবার আসে। মনে আসিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, খরচ হইলে আরো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সত্য যখন লাভ হয়, তখন মনে আনন্দ জন্মে; সত্য প্রকাশ হইলে সেই আনন্দ আরো অধিক হয়। সত্য লাভ করিতেই আমার আশা ও আগ্রহ। কিরূপে সত্য দিব, একবারও ভাবিলাম না। মুখ খুলিয়া কি বলিব, কখনোই চিন্তা করিলাম না। যখনই বলিতে হইল, সত্য আপনা আপনি সতেজে প্রকাশিত হয়। গুরুগিরি অসার, তাহা কখনো অবলম্বন করি নাই; পুরাতন কথা বলি নাই। গত বৎসর যাহা বলিয়াছি, এ বৎসরেও যে তাহাই বলিব, তাহা নহে। দিবার জন্য আসি নাই, বুঝিতে পারিয়াছি। আসিয়াছি শিখিতে; শিক্ষিত বিষয় আপনা আপনি প্রকাশিত হইবে।

গত বৎসর যাহা বলা হইয়াছে, এ বৎসর যদি তাহাই বলা হয়, কাল যে প্রার্থনা করিয়াছি, আজো যদি তাহাই করি, কাল যে বক্তৃতা করিয়াছি, সেই বক্তৃতা যদি পুনরায় করি, মনে হইবে, অসার গুরুগিরি করিতেছি, ভ্রূকুটি ভঙ্গি করিয়া বুঝি পাঁচ জনের মন হরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। পুষ্করিণী বুঝি শুকাইয়া গিয়াছে, লোককে বুঝি কাদা দিতেছি, কাদাও বুঝি আর নাই, শুষ্ক মাটিই দেখিতেছি। এ কথা কিন্তু আমাকে বলিতে হইল না; এ আক্ষেপ আমার মুখ হইতে উচ্চারিত হইল না। দীননাথ আর পাঁচ প্রকারে যেমন উপকার করিয়াছেন, এ বিষয়েও তেমনই উপকার করিয়াছেন। কিছু নাই, কি বলিব, কি লিখিব, এ চিন্তায় কোনো দিন চিন্তিত হইতে হইল না। কল্যকার দিনকে অদ্যকার দিন করিব? পুরাতন ইতিহাসকে বর্তমান করিব? চর্বণ করিয়া পুনরায় বস্তু লইয়া চর্বিতচর্বণ করিব? ছি! ছি! আমার গুরু এ কথা শুনিলে অসন্তুষ্ট হন। সেইজন্য চর্বিত বস্তু কখনোই চর্বণ করিতে হইল না; কাদা ঘাঁটিতে আমাকে হইল না। কি দিলাম, কি শিখাইলাম,

সে দিকে দৃষ্টি হয় না; কি শিখিলাম, কেবল তাহাই দেখি। ইহাতেই আমি বাঁচিয়া গেলাম। ভালো কথা পাঁচ জনকে শুনাইতেছি, ইহা মনে হইলেই জিহ্বা জড়াইয়া যায়, বাকরোধ হয়, শরীর মন সংকুচিত হয়। আমি শিখিলেই শিখান হইল; আমি পাইলেই দশ জনের পাওয়া হইল। শরীর হইতে শ্রোতার শরীরে সত্য লাভের বল ও প্রভাব সঞ্চারিত হয়। আমার আত্মায় সত্য আসিলেই সত্য অন্যের হইবে। আমার নিকট সত্য ঘোষিত হইলে, নিশ্চয়ই সেই সত্য শঙ্খ-ঘণ্টাসহকারে সর্বত্র ঘোষিত হইবে।

ভারতের পানে চাহিয়া দেখিয়াছি, আমি শিখি যাহা, ভারত শেখে তাহা। যেন পাখিতে ঠোঁটে করিয়া সকলের ঘরে সত্য বহন করিয়া দিয়া আসে। আমার হৃদয় যেন প্রণালী দ্বারা ভ্রাতৃহৃদয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা হইয়াছে। তদ্দ্বারা যেন আমার হৃদয়ের সত্য সর্বত্র সর্বহৃদয়ে গিয়া উপস্থিত হয়। আমার মনে সূর্যের জ্যোতি প্রকাশিত হইলেই, সেই জ্যোতি সকলকেই জ্যোতিষ্মান করে। ধনাঢ্যের প্রাসাদে যেমন, দরিদ্রের কুটীরেও তেমনই সত্য সঞ্চারিত হইতেছে, শুনিতে পাই। ধন্য জগদীশ্বরকে, একজনের নিকট সত্য গিয়া, সেই সত্য দশ সহস্র লোকের মনে প্রকাশিত হইতেছে। সত্য আমরা কেবলই শিক্ষা করিব; চিরদিনই শিখি, এই কামনা। যে কেউ হউক না, তাহারই নিকট শিখিতে ইচ্ছা হয়। সামান্য গায়ক দেখিলে, তারও পায়ে পড়িয়া শিখিতে ভালোবাসি। কোনো বৈরাগী আসিলে, লক্ষ টাকা ঘরে আসিল ভাবিয়া, তাহার সংগীত শুনিয়া কত শিক্ষা করি। যে কোনো লোক হউক, নূতন কথা বলিতে আসে; মনে করি, যে কোনো প্রকারে তাহার নিকট হইতে কিছু আদায় করিতে পারিলে হয়। এ জীবনে কেহ কাছে আসিয়া, না দিয়া চলিয়া যায় নাই। হৃদয়ের ভিতরে ভগবান শক্তি দিয়াছেন, সাধুসঙ্গে বসিবা মাত্র গুণ আকর্ষণ করিতে পারি। বেশ বুঝিতে পারি, সাধু যখন নিকট হইতে চলিয়া যান, হৃদয়ের গুণ ঢালিয়া দিয়া

যান। আমি যেন তাঁর মতো কতকটা হইয়া যাই। আমি জন্মশিষ্য; জন্ম হইতে শিখিতেছি, শিক্ষা আর ফুরাইল না। সকলেরই নিকট হইতে চিরদিন শিক্ষা লাভ করিব; শূকরাদি পশুর নিকট হইতেও শিক্ষা প্রাপ্ত হইব। শিখিতে শিখিতে পরলোকে যাইব।

হে সদ্গুরু, অনুগ্রহ করিয়া এ পৃথিবীতে অনেক শিখাইলে, অনেক দেখাইলে। অন্ন দিয়া যেমন শরীর পোষণ করিতেছ, আত্মার মুখে নূতন নূতন সত্যান্ন দিয়া তেমনই আত্মাকে পোষণ করিতেছ; ইহার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করি। আমার গোপন কথা কিরূপে ব্যক্ত করিব? প্রকাশ্যরূপে যে বলিয়া উঠিতে পারি না। তোমার কাছে বসিয়া অশেষ সুখ ভোগ করিতেছি। যত সত্য শিক্ষা করি, ততই সুখ হয়। নূতন সত্য লাভ করিয়া এত সুখ হয়, যেন হৃদয় পাগল হইয়া যায়; খুব চীৎকার করিতে ইচ্ছা হয়, প্রাণটা ছট্ ফট্ করে। কেবল ভাবি, এ নূতন কথা কোথা হইতে আসিল, কে দিয়া গেল? ঠাকুর, গুরুর কাছে সত্য শিক্ষা করা বড়ো সুখপ্রদ। নিরাশ্রয় শিশুকে সুখই দিতেছ। মা, তোমায় ছাড়িয়া আর কোনো গুরুর বাড়ি কি আমি গিয়াছি? স্কুলে পড়িয়া শিক্ষা শেষ করিতে কখনো কি চাহিয়াছি? টোলে পড়িয়া পণ্ডিত হইবার কি কখনো প্রয়াসী হইয়াছি? আমার প্রত্যাদেশ ঐ চরণে; আমার বিদ্যাবুদ্ধি ঐ পদধূলিতে। আমি অন্য জ্ঞানে জ্ঞানী হই নাই; তাই মা, তুমি আমায় বেদ-বেদান্ত, সাহিত্য-ইতিহাস সকলই শিখাইতেছ। মা যার সরস্বতী, তার বাড়ি যে ব্রহ্মবিদ্যালয়। তার মা তো কখনোই শিখাইতে ভুলেন না। তুমি আমাদিগকে চিরশিখ্ করিয়া রাখ; আমরা কেবলই শিক্ষা করিব। সামান্য লোকের এত অভিমান কেন? অধ্যাপকের সংখ্যা এত বাড়িতেছে কেন? সকলেই যে শিখাইতে চায়, কেহই যে শিখিতে চায় না। সুমতি দাও মনুষ্যকে; শিখিলেই শিখানো হইবে। আর প্রচার করিতে যাইতে চাই না;

সত্য আসিলেই আপনা আপনি বাহির হইবে। সত্য পাইতে পাইতে যদি ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলে দেওয়াও ফুরাইবে। অনন্ত বেদে যদি পণ্ডিত করো, তবেই বলিতে পারি, 'শিক্ষাও ফুরাইবে না, দেওয়াও ফুরাইবে না। সত্যের অভাব এ জীবনে কখনো বোধ করিতে হইল না। রাশি রাশি সত্য আসিতেছে। অবশিষ্ট জীবন শিখিতে শিখিতেই কাটাইব। শিষ্য হইয়া চিরদিনই তোমার বেদ-বিদ্যালয়ে পড়িব। নূতন নূতন শত সহস্র বেদ তোমার এই উপাসকমণ্ডলীকে শিক্ষা দাও। দম্ভ নাশ করিয়া সকলকে বিনীত করিয়া দাও। যতদিন বাঁচিব, আমরা শিষ্যব্রত সাধন করিব, মুক্তিপ্রদ সত্য সকল লাভ করিয়া প্রাণকে সুশোভিত করিব; কৃপা করিয়া তুমি আমাদিগকে এই আশীর্বাদ করো। তোমার শ্রীচরণে আমাদিগের এই প্রার্থনা।

(রবিবার, ১০ পৌষ, ১৮০৪ শক; ২৪ ডিসেম্বর, ১৮৮২ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত।)

অনৃত-খণ্ডন*

আমার জীবনবেদ পাঠ না করিয়া, সমুদয় পরিচ্ছেদ অধ্যয়ন না করিয়া, কেহ কেহ অন্যায় কথা সকল বলিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহারা মিথ্যাকথন অপরাধে ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকট অপরাধী হইয়াছেন। সে সকল মিথ্যা কথা স্পষ্টরূপে নির্ধারণ করা আবশ্যক। জীবনবেদের বিশেষ তত্ত্ব না জানিয়া যাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, এবং তদ্দ্বারা যে সমস্ত অনৃতবচনে দোষী হইলেন, সে সকল খণ্ডন করা আবশ্যক। মিথ্যাকথন দোষে কে কে দোষী? কে কে অপরাধী? পৃথিবীর শ্রদ্ধেয় ভক্তিভাজন ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষদিগের সঙ্গে, পুণ্যের প্রবর্তক, মুক্তির সহায় ঈশা গৌরাঙ্গের সঙ্গে, এই নরকের কীটকে যাঁহারা একশ্রেণীভুক্ত করিলেন, এই বেদী তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিতে কুণ্ঠিত নহেন। আমি তাঁহাদিগের সহিত একশ্রেণীভুক্ত? এ কথা নিতান্ত অসার। যাঁহাদিগের চরণরেণু আমি মস্তকে ধরিবার উপযুক্ত নই, তাঁহাদিগের সহিত একশ্রেণীভুক্ত হইব? যাঁহাদিগের কাছে বসিতে পারি না, সমস্ত পৃথিবী যাঁহাদিগকে ভক্তি করে, যাঁহাদিগের নিকট হইতে পরিত্রাণের সাহায্য লাভ করিয়াছে, সেই সকল সাধুর নিকট পাপীর ন্যায় পরিত্রাণপ্রার্থী হইয়া যাইব; জীবের সহায় হইয়া একত্র বসিতে চেষ্টা করিব না, এক আসনে বসিব না।

নীচে বসিয়াছেন যাঁহারা, দৃষ্টান্ত লইতেছেন যাঁহারা, উপদেশ শুনিতেছেন যাঁহারা, সেই সকল ব্যক্তির আমি অন্তর্ভূত। ইহাতেই আমার গৌরব; আমি তাঁহাদের নাম করিয়া পবিত্র হই, নৃত্য করিতে পারি, এই আমার সুখ ও শান্তি। আর যাঁহারা বলিলেন, এ

* এই উপদেশের তারিখ পাওয়া গেল না, সম্ভবত ইহা ১৭ পৌষ, ১৮০৪ শক হইবে। গঃ—

ব্যক্তির চরিত্র নির্মল, পাপ দেখা যায় না, সাধুদিগের মধ্যে এ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, এই বেদী তাঁহাদিগকে মিথ্যাকথন অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন। এ জীবনবেদে স্পষ্ট লেখা আছে, অনেক পাপ ছিল, ভয়ানক দোষ কলংক আশ্রিতভাবে এ জীবনে পাপের মূলের সঙ্গে যুক্ত ছিল, কাটা হয় নাই। যাঁহারা সাধু, যাঁহাদের নাম করিলে জীবন পবিত্র হয়, আমার নাম সে শ্রেণীতে কেহ যেন মনে না করেন। এই যেন সকলে ভাবেন, আর দশ জন পাপী যেমন গুপ্ত পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করে, আমিও তেমনই। তাহারা যেমন ভালো হইবার জন্য প্রার্থনা করে, আমিও দোষে গুণে মিশ্রিত। দোষ থাকা সত্ত্বেও অপরে যেমন ঈশ্বরের নিকট হইতে সত্য পান, লোককে উপদেশ দিতে সাহসী হন, আমিও তেমনই সত্যলাভ করি, উপদেশ দিই।

আচার্য হইবার অর্থ এ নয় যে, পাপমুক্ত হইয়া আচার্য হইয়াছি; আচার্য হইবার অর্থ এ নয় যে, আপনাকে নির্মল করিয়াছি, এক্ষণে অপরকে নির্মল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি আচার্য হইয়াছি কেন? কতকগুলি রত্ন পাই, সেইগুলি অপরকে দিবার জন্য। কতকগুলি ভাব পাইয়াই অপর সকলকে তৎসমুদয় অর্পণ করি। পাপাশ্রিত হইয়া, গুণসম্বন্ধে পরহিত-সাধন-মানসে আমি আচার্যের আসনে বসিতে লজ্জা বোধ করি। আমি স্বর্গ হইতে অল্প অল্প যেটুকু পাইয়াছি, সেইটুকু দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। যদিও সাধু মহাপুরুষদের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হইবার উপযুক্ত নই, যদিও তাঁহাদিগের চরণতলে বসিবার যোগ্য নই— নির্মলচরিত্র সাধুদিগের সঙ্গে, পবিত্র-চরিত্র মহর্ষিদিগের কাছে বসিবার উপযুক্ত নই— তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, আমি তাঁহাদিগের নাম সাধন করিয়া রিপুদমনব্রতে ব্রতী; তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, জ্ঞান এবং পুণ্য, শান্তি ও প্রেম ঈশ্বরের নিকট হইতে আমার নিকট আসিতেছে।

যাঁহারা বলিলেন, এ জীবন প্রত্যাদিষ্ট নয়, এ ব্যক্তি ঈশ্বর দর্শন করে নাই, তাঁহারাও মিথ্যা কথা বলিলেন। বারম্বার ঈশ্বর দর্শন করিতেছি, তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতেছি, এই সত্য, ইহাই বেদের কথা। এইরূপ দেখিয়া আমি বাঁচিয়া আছি। এ ব্যক্তি অযোগ্যতা সত্ত্বেও একবার নয়, তুইবার নয়, শত সহস্রবার স্বর্গের সুধাভিষিক্ত বাণী শ্রবণ করিয়া জীবন পবিত্র ও সুখী করে— শত সহস্রবার দর্শন লাভ করিয়া জীবন পবিত্র ও দর্শনপ্রয়াসী হয়। যাঁহারা এ কথা স্বীকার করিলেন, তাঁহারা সত্য কথা বলিলেন। যাঁহারা বলিলেন, এ ব্যক্তির ঈশ্বর-দর্শন ভ্রান্তি ও কল্পনা, বাস্তবিক এ ব্যক্তি ঈশ্বরকে দেখে নাই, তাঁহার কথা শোনে নাই, পৃথিবী তাঁহাদিগকে আজ নয় কাল মিথ্যাবাদী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবে। আমি বাহিরের বস্তু সকলকে যেমন দেখিতেছি, ভগবানকে ঠিক তেমনই দেখিতেছি। ভগবান বলিয়া যাঁহার পূজা করি, বন্ধু বলিয়া যাঁহাকে ভালোবাসি, তাঁহার কথা শুনিতেছি। আহার, পরিধান প্রভৃতি ব্যাপার যেমন সহজ, এই ঈশ্বর-দর্শন ও শ্রবণ তেমনই সহজ। ইহাতে যদি কেহ বলেন, এ ব্যক্তি অপর সকল লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছে, তাঁহারাও মিথ্যাবাদী।

যাঁহারা আমার দর্শন ও শ্রবণ অস্বীকার করিলেন, তাঁহারা যেমন মিথ্যাবাদী, আর এই দর্শন শ্রবণের জন্য যাঁহারা আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিলেন, তাঁহারাও তেমনই মিথ্যাবাদী। ঈশ্বর-দর্শন অসাধারণ পুরুষত্বের পরিচয় নয়। ঈশ্বরের কথা শ্রবণ অসামান্য নয়। যেমন বাহিরের জড় বস্তু সকল দেখা, ঈশ্বরকে দেখা তেমনই। তিনি যেমন ভাবান, তেমনই ভাবি, যেমন বলান, তেমনই বলি; যেমন প্রচার করিতে বলেন, তেমনই প্রচার করি। তাঁহার সঙ্গে অতি সহজ যোগ। আর যদি কোনো গূঢ় দর্শন থাকে, তাহা হয় নাই। যেমন জড় বস্তু দেখা, তেমনই ঈশ্বরকে দেখা হইয়াছে; যেমন বাহিরের শব্দ শ্রবণ করা, তেমনই ঈশ্বর-বাণী শ্রবণ

করা হইয়াছে। এ বিষয়ে অন্যান্য যোগী ভক্তদের সঙ্গে কোনো প্রভেদ নাই। যেমন বাহিরের বস্তু ঠিক দেখি, বাহিরের কথা ঠিক শুনি, বিপরীত হইতে পারে না, ইহাও সেইরূপ। যদি কেহ মনে করেন, এ ব্যক্তি অন্যান্য লোকের ন্যায় বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া, নানা অনুসন্ধান করিয়া, অনেক জ্ঞানলাভ করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়, লোকের পরামর্শ লইয়া কাজ করে, তিনি মিথ্যা মনে করেন। যাঁহারা জানেন, এ ব্যক্তি ঈশ্বর কর্তৃক কোনো কোনো পদে অভিষিক্ত হইয়াছে, ঈশ্বর স্বয়ং ইহার সমক্ষে সত্য প্রকাশ করিতেছেন, তিনি স্বয়ং ইহার সংসার চালাইতেছেন, তাঁহারাই সত্য জানেন ও সত্য বলেন। তাঁহারা মিথ্যাবাদী, যাঁহারা এই বলিয়া অপবাদ করিলেন যে, এ ব্যক্তি বুদ্ধিসহকারে ধর্ম সকলকে মিলিত করিতেছে, এ ব্যক্তি ভয়ানক অধ্যবসায় সহকারে হিমালয়কে স্থানান্তরিত করিতে পারে; এইরূপ আমার জীবন সম্বন্ধে লোকে কত সিদ্ধান্ত করিতেছে।

যে ব্যক্তি ছেলেমানুষের মতো বিশ্বাস করে, কল্যকার জন্য ভাবিত হয় না, ধর্মজীবন আরম্ভ অবধি সাংসারিক সকল চেষ্টা হইতে বিরত, পরের মন্ত্রণা শোনে না, দশ জনকে অধ্যক্ষ করিয়া আপনাকে পরিচালিত করিবার জন্য বিধি লয় না, আকাশের দিকে তাকায়, আর অন্ধকারের ভিতর হইতে যে সংকেত আসে, তাহাই করে, সেই এই ব্যক্তি। এই একটি লোকের জীবনে পঁচিশ বৎসরে অনেক বড়ো বড়ো সংকট উপস্থিত হইয়াছে, এ ব্যক্তি যে শুদ্ধ তৎসমুদয় পরাজয় করিয়াছে, তাহা নয়; জীবনের ভিতর হইতে আলোক পাইয়া এখন বড়ো বড়ো বিপদের কাছে দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছে। ঈশ্বর কেমন করিয়া মানুষকে চালান, এই ব্যক্তিতে তাহা অতি স্পষ্ট প্রকাশিত। দাঁড় লইয়া একজন চালান, একজন চালিত হয়; একজন ভাবেন, তাই একজনকে ভাবিতে হয় না। আমার জীবনের এই গূঢ় কথা যদি জানিতে চাও, তবে 'জীবনবেদ' পড়। এ ব্যক্তি আপনাকে চালাইবার জন্য কোনো চাকরী করিল না, কোনো

ব্যবসায় লইল না, বরাবর ঈশ্বর স্বয়ং চালাইয়াছেন, আজো চালাইতেছেন। ইহা যাঁহারা অলৌকিক পুরুষত্বের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করেন, তাঁহারা মিথ্যাবাদী।

যেমন আমি আমার জীবনকে ঈশ্বরের হাতে দিয়াছি, এমনই লক্ষ লক্ষ ভক্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী ঈশ্বরের হাতে জীবন ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহা অলৌকিক নয়। এমন জীবনের কথা অনেক স্থানে পড়া গিয়াছে। ঈশ্বর পরিত্রাতা মনুষ্যের জীবনতরীকে চালান, ইহাতে কোনো সংশয় নাই। অতএব বলিও না যে, আমাদের উপদেষ্টা 'জীবনবেদে' এ কথা প্রকাশ করায়, আপনার জীবনকে উচ্চ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। একজন মূর্খ নীচ অবস্থার লোক হইতে পারে, অথচ ঈশ্বর দয়াময়ী মাতা হইয়া তাহাকে সত্যের পথে, সাংসারিক শ্রীসম্পদের পথে চালান। আর কে মিথ্যাবাদী? যে ব্যক্তি আমাকে ধনী ও জ্ঞানী বলিয়া নির্দেশ করেন, সে ব্যক্তিও মিথ্যাবাদী। আমি ধনী, মানী, জ্ঞানী, এ জ্ঞান আমার নাই। সত্যানুরোধে আমাকে ধনী বলিয়া গণনা করা যায় না। নিজের বাড়ি ছাড়া একটি পয়সা আছে বলিতে পারি না। যদি কেহ আমাকে ধনীদিগের মধ্যে স্থান দিয়া থাকেন, ভ্রান্তিবশত দিয়াছেন; জানেন না বলিয়া লোকে আমাকে ধনীদের মধ্যে বসিতে দেন। যাঁহারা গূঢ়তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা অবগত আছেন, কল্য প্রাতঃকালে নিশ্চয় অন্ন আসিবে, এমন উপায় নাই। কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর উপায় আছেন।

আমি আপনাকে যেমন ধনী বলি না, তেমনই নির্ধনও বলি না। যাঁহারা আমাকে দরিদ্রদিগের মধ্যে পরিগণিত করিতে চান, তাঁহারাও মিথ্যায় পতিত হন। দরিদ্র কে? যে কাঁদে, সেই দরিদ্র, সেই দুঃখী। দীনবন্ধু আমাকে সে দলে ফেলেন নাই, আমাকে সে শ্রেণীভুক্ত করেন নাই। ধন না থাকিলেও যদি কাহাকেও ধনী বলিয়া গণনা করিতে পারে, তবে সে ব্যক্তি আমি।

পৃথিবীর ধনকে আমি তুচ্ছ বোধ করি। কল্যকার জন্য উদাসীন হইয়া, যাঁহাতে হৃদয়কে স্থির রাখি, আমার তিনিই ধন। আমি কেন ভাবিব? যিনি ভাবিবার, তিনি ভাবিবেন। ধন আমার ভাণ্ডারে আছে, বাড়িতে নাই পিতার কাছে সকলই আছে।. তাঁহার দেওয়া, আর আমার লওয়া কেবল বাকী। যাঁহারা ব্যাঙ্কে অনেক টাকা রাখিয়া মনে করেন, আপনাদিগের পরিবারের জন্য অনেক বিষয় রাখিয়াছি, ভবিষ্যতের দারিদ্র্য অসম্ভব করিয়াছি, মাসে মাসে অনেক টাকা আসিবে, তাঁহারা মিথ্যা চিন্তা করেন।

আমার বিদ্যাও পৃথিবীর নয়। এখানকার সামান্য একজন বিদ্বান যাহা জানেন, আমি সত্য সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, তাহা আমি জানি না। যে জ্ঞান আছে, তাহা আমি বলিতে পারি, এমন ভাষা-বোধ আমার নাই। সম্পূর্ণ বিদ্যা-শিক্ষা বিদ্যালয়ে হয় নাই। কৃতবিদ্যদিগের সহিত আমার তুলনা করিলে, সে তুলনা মিথ্যা জানিতে হইবে। বিদ্যা আমার নাই। যাহা থাকিলে বিদ্বান বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায়, তাহা আমার নাই। কিন্তু জ্ঞানে আমার ঔদাসীন্য নাই! আমি যে ঈশ্বরের কথা জানি না, কি উপদেশ দিতে পারি না, তাহা নহে। একজন জ্ঞানী আমার বাড়িতে থাকেন, আমার দৃষ্টি তাঁহার উপর থাকে। সেই শাস্ত্রীর শাস্ত্র শুনিয়া আমি বিদ্যা সম্বন্ধে যত অভাব মোচন করি। লজ্জানিবারণ যদি আমার লজ্জা নিবারণ করেন, তবেই হয়। যেগুলি থাকিলে উপদেশ দেওয়া যায়, হরি তাহার ব্যবস্থা করেন। আর কে মানী? উচ্চপদস্থ লোক অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত আলাপ করেন। আমার যাহা কিছু মান হইয়াছে, তাহা হরির জন্য। আমার মান হরির মান! পৃথিবীর মান পাই নাই, পাইব না, সুতরাং হারাইবারও আশংকা নাই। পৃথিবীর কাছে কোনো প্রকার মান প্রাপ্ত হই নাই। ব্রহ্ম আমার ধন, ব্রহ্মই আমার বিদ্যা ও জ্ঞান, ব্রহ্মই আমার মান ও প্রতিপত্তি। এখন এই ব্যক্তি সম্বন্ধে কে কে মিথ্যা বলিলেন, এ

ব্যক্তির জীবনের অন্যায় অর্থ করিলেন, তাহা সহজেই ধরা যাইবে। এখন সকলের এই মনে হওয়া উচিত, এ ব্যক্তির জীবন যেমন চলিয়াছে, আমাদের তেমনই হউক। নিজের দ্বারা কিছু হয় নাই, হরি-চরণ ব্যতীত আর ধন নাই, হরি-চরণ ব্যতীত আর কোথাও জ্ঞান, শান্তি পাওয়া যায় না, হরি-চরণই সর্বস্ব। এই 'জীবনবেদের' ইহাই মূল তাৎপর্য।

হে দীনবন্ধু, হে আশ্রয়দাতা, এ জীবনের পঁচিশ বৎসর তোমারই সাক্ষী। এ জীবন তোমাকেই জগতের কাছে প্রকাশ করুক, আমি কৃতার্থ হই। আমার জীবনে আমি কি করিলাম? পাপ করিলাম। তুমি কি করিলে? সমুদয় করিলে। সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে। আমার বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, তুমি আমাকে ধর্মশাস্ত্র বুঝাইলে। হে দীনবন্ধু, এখন একজন ভক্তকে স্বয়ং দেখা দিয়া কৃতার্থ করো। আমি পাপ বিনাশ করিবার উপযুক্ত নই, কিন্তু তুমি আমার জীবনে কি করিয়াছ, করিতেছ, তাহার সাক্ষ্য দিতে আমি প্রস্তুত আছি। আমার জীবন যে সোনার জীবন হইল। পরমেশ্বর, আমার জীবনকে সোনার করিয়াছ। হৃদয়কে হীরকখণ্ড করিয়াছ। এমন হীনকে এত বড়ো করিলে? আমি যে আগে পিপীলিকার গর্তে থাকিতাম। এক একবার বাহির হইতাম, আর এক একটি চাউল মুখে করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতাম। আজ ব্রহ্মমন্দিরের পবিত্র বেদীতে বসাইয়াছ। কেন এমন হইল? ভগবান যাহাকে সুখী করেন, সেই সুখী হয়। তুমি যাহাকে ধনী, মানী ও জ্ঞানী করিবার প্রতিজ্ঞা করো, সেই কৃতার্থ হয়। এই 'জীবনবেদ' পৃথিবীর লোকে পাঠ করুক, আলোচনা করুক। এ জন্য নয় যে, আমাকে সুখ্যাতি করিবে। লোকে বলে, হরি আগে যেমন ভক্তকে লইয়া অলৌকিক ক্রিয়া করিতেন, এখন আর সেরূপ করেন না, এখন ঈশ্বর দূরে গিয়াছেন। হে হরি, আমার প্রাণের সহিত এ অনৃত-খণ্ডন করিয়া যাই। লোকে এই ক্ষুদ্র পাপীর 'জীবনবেদ' পড়ুক।

এক একটি শব্দ আলোচনা করুক। তাহাদিগের মনে তোমার প্রতি বিশ্বাস ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক। তুমি আমাকে টাকা-কড়ি আনিয়া দিলে, তুমিই আমাকে জ্ঞান দিলে। তুমি কত করিলে, এখন এই প্রার্থনা পূর্ণ করো। আমার বেদীতে বসা যেন এই উপকার করে, যেন লোকে ভাবে, এ ব্যক্তি মন্দ ছিল, এখন কি হইল। ইহার যে কিছু ছিল না, এখন এত হইল। আমার জীবনতরী কোথায় পড়িয়াছিল, আর আজ এ কোন্ ঘাটে লাগিল। এ যে বৈকুণ্ঠের কাছাকাছি। এখন তুমি আমাকে যাহা বলাইবে, আমি তাহাই বলিব, যাহা করাইবে আমি তাহাই করিব। হরি, আমি তোমারই। আমার 'জীবনবেদ' পড়িয়া পৃথিবী যেন তোমারই পাদপদ্মে প্রণত হয়, তোমারই প্রেম ভক্তিতে প্রমত্ত হয়, কৃপা করিয়া তুমি এই আশীর্বাদ করো।

জীবনবেদের পাঠের ভূমিকা

'বেদ' এই শব্দটি 'বিদ্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে সুতরাং ব্যাপক অর্থে 'বেদ' কথাটির মানে অখণ্ড জ্ঞানরাশি। 'বিদ' ধাতুর উত্তর করনে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করে 'বিদ্যতে অনেন' এই অর্থে 'বেদ' শব্দ নিষ্পন্ন করা হয়। বিভিন্ন অর্থ ভেদে 'বিদ' ধাতুর চার রকম মানে হয়। অন্য তিন অর্থে 'বিদ' ধাতু সকর্মক, এই অর্থ অনুযায়ী বলা যায়, যার দ্বারা কিছু লাভ করা যায়, যার দ্বারা কিছু জানা যায় বা যার দ্বারা কিছুর বিচার করা যায়, তাকেই 'বেদ' বলে। বেদের অর্থ জ্ঞান, জ্ঞান চিরদিনই আছে ও থাকবে, তার ক্ষয় বা বিনাশ নেই। এই অর্থেই বেদকে অপৌরুষেয় 'বা নিত্য বলা হয়। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ বেদ অনাদি কাল থেকে একই রকম আছে ও থাকবে তাই আক্ষরিক অর্থে বেদের প্রতিটি শব্দ সত্য। কিন্তু এই মত নিতান্তই ভ্রান্ত ; কোনো একটি বিশেষ গ্রন্থ কখনই অনাদি বা নিত্য হতে পারে না, তাই পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে ব্যাখ্যা করে বলেছেন বেদের শব্দ নিত্য নয়, মর্মার্থ (Idea) নিত্য। সে যুগে যাঁরা ঋষি বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁরা ছিলেন জ্ঞানের সন্ধানী। তাঁদের গভীর মনন ও সাধনার ফলে জীবনের কোনো চরম মুহূর্তে তাঁদের অন্তরে যে সত্য বা জ্ঞানের উপলব্ধি হয়েছিল গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ বেদ তাঁদের সেই অপরোক্ষ অনুভূতির প্রকাশ মাত্র। তাই ঋষিরা বলেছেন দুই রকম বিদ্যা জ্ঞাতব্য পরাবিদ্যা ও অপরা বিদ্যা এবং ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ—এই সব অপরা বিদ্যা। যার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষ বা ব্রহ্মকে জানা যায় তা পরা বিদ্যা। (মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৪-৫) সুতরাং পুঁথিগত বিদ্যা বা শাস্ত্র জ্ঞান অপরাবিদ্যা আর যে অপরোক্ষ অনুভূতি দ্বারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা বা জানা যায় তা পরাবিদ্যা। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমাদের দেশের ঋষিরা কোন বিশেষ শাস্ত্র বা গ্রন্থকে আক্ষরিক অর্থে অভ্রান্ত মনে না করে পরাবিদ্যা বা অপরোক্ষ অনুভূতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, কারণ—

"ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতব্য ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।"

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ; ৪।৯)

[সমগ্র বেদ, বিভিন্ন যাগ, ব্রত, কালত্রয় এবং আর যা কিছু বেদ প্রকাশ করেছেন, তা সমস্তই এই অক্ষর ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন ।]

সুতরাং ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা বা জানাই হচ্ছে আসল কথা, অপরা বিদ্যা যতটুকু পরাবিদ্যা লাভের সহায়ক হয় ততখানিই এর সার্থকতা । তাই তাঁরা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন –

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যস্তইস্যষ আত্মা বৃণুতে তনূংস্বাম্ ।। (কঠ ; ২/২৩)

[এই পরমাত্মাকে বেদাধ্যায়ন বা মেধা বা বহু শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না । যে সাধক তাঁকে প্রার্থনা করেন, তিনি তাঁকেই বরণ করেন, তাঁর নিকট তিনি স্বকীয়তনু অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশ করেন ।]

কিন্তু কিভাবে তাঁকে জানবো ? ঋষিরা বলেছেন "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।১) অর্থাৎ মনের দ্বারাই তাঁকে দর্শন করতে হবে । কিন্তু যে মন কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে আবদ্ধ, চঞ্চল বা অশান্ত, সেই মন দিয়ে তো তাঁকে জানা যাবে না । (কঠ ; ২।২৪) তাই ঋষিরা বলেছেন – "জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মান্ । "(মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।৮)

[জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যান যুক্ত হয়ে নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন ।]

সুতরাং হৃদয় মনকে শুদ্ধ করে পবিত্র করে শান্ত ও মুক্ত মনের অধিকারী হয়ে একাগ্র মনে মননের দ্বারা সেই পরম পুরুষকে উপলব্ধি করে তাঁর প্রেরণার বশবর্তী হওয়া যায় । এই জানা সমগ্র জীবন দিয়ে জানা, জীবনের পরিপূর্ণতাই এই সাধনার মূল কথা । যিনি পূর্ণ স্বরূপ তাঁকে উপলব্ধি করতে হলে, দেহ, মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের সাহায্যে নিজেরও পূর্ণতা সাধন করে যেতে হবে । সেই জন্যই ঋষিরা বলেছেন, "ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।২।৯) অর্থাৎ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে বলে ব্রহ্ম ভাবাপন্ন হতে হবে । তাই যীশুখৃষ্টও বলেছেন ; **"Be ye therefore perfect even as your Father which is in heaven is perfect". St Mathew 6/48** [তোমার স্বর্গস্থ পিতার মত পূর্ণ হও] । সুতরাং নিজের জীবনের পূর্ণতা সাধন করে ক্রমে সেই মহাজাগতিক চৈতন্যময় পরম সত্বার সঙ্গে একাত্ম হতে হবে । তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।৪।৫) যাজ্ঞবল্ক্য কথিত "শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন"ই সব সাধনার মূল কথা । যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে বলা হয়েছে ।

"তরুরোপি হি জীবন্তি, জীবতি মৃগ পক্ষিণঃ
স জীবতি, মনো যস্য মননেনহি জীবতি ৷"

[তরুলতাও জীবন ধারণ করে, পশু, পক্ষীও জীবন ধারণ করে। কিন্তু সেই প্রকৃত জীবন ধারণ করে, যে মননের দ্বারা জীবন ধারণ করে]। এই "মননের" মধ্যেই রয়েছে মানুষের মনুষ্যত্ব, তা না হলে তরুলতা ও পশু পক্ষীর সঙ্গে তার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সৃষ্টির আদি যুগ থেকে ক্রমবিকাশের ধারা বেয়ে প্রটোপ্লাজম্ এমিবা, প্রটোজোয়া প্রভৃতি অবস্থা থেকে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে উদ্ভিদ, প্রাণী ও পূর্ণাঙ্গ মানব যখন পৃথিবীতে এলো তখন দেখা গেল যে পূর্ববর্তী প্রাণধারা থেকে (অর্থাৎ অন্যান্য স্তরের প্রাণী থেকে) তার একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। যে বিশেষ গুণগত বা মানসিক বৈশিষ্ট্য মানুষকে শিম্পাঞ্জী বা গরিলা জাতীয় উন্নত ধরণের প্রাণীদের জান্তব অস্তিত্ব থেকে ক্রমোত্তরণ করে মানবিক অস্তিত্বের পৌছে দিয়েছে, তা হলো এই "মনন" ক্রিয়া। এই মনন ক্রিয়ার ফলে ক্রমে লক্ষ লক্ষ বছরের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে শিল্প, সাহিত্য বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি, দর্শন প্রভৃতি অপরা বিদ্যা ও অপরোক্ষ অনুভূতি প্রসূত অধ্যাত্ম চিন্তা বা পরাবিদ্যা যার পরিচয় পাওয়া যায় বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, বাইবেল, কোরাণ, ত্রিপিটক, জেন্দাবে,স্তা গ্রন্থ সাহেব প্রভৃতি শাস্ত্রে এবং বিভিন্ন দেশের সাধুসন্ত প্রমুখ মনীষীদের জীবনে।

বৈজ্ঞানিকদের মতে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাবের পর থেকেই ক্রম-বিকাশ বা বিবর্তনবাদের লীলা শুরু হয়েছে। অনেক আলোচনা ও বিতর্কের পর পরবর্তী কালে চার্লস ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ বা বিবর্তনবাদ কিছুটা পরিবর্তিত ও পরিশোধিত হলেও তার মূল সিদ্ধান্ত আজও স্বীকৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। অনেকে একে নব-ডারউইনবাদ বা আধুনিক অভিব্যক্তিবাদ বলেন। তাঁদের মতে এটি সৃজনকারী প্রক্রিয়া যার মধ্যে ক্রমশঃ জটিলতর ও উন্নততর জীব সৃষ্টি করার প্রবণতা দেখা লক্ষ্য করা যায়। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলীর মতে পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমশঃ কমে যাওয়া অর্থাৎ পরিবেশের প্রভাব ক্রমে মুক্ত হওয়া এবং আরো উন্নত হওয়ার সম্ভাবনাকে অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা ও ক্ষমতাই অভিব্যক্তি বাদ অনুযায়ী প্রগতির মাপকাঠি। তিনি বলেছেন, "Human history and human destiny are part of larger process. Only by getting some overall view of reality, in its dual aspect of self-transforming pattern and continuing process, can man

hope to get a clearer view of his place—his unique-place—in the process and steer a better course into the future."

(Evolution in Action ; Julian Huxlay, 1965 ed. p. 161)

[মানুষের ইতিহাস এবং পরিণতি একটি বৃহত্তর প্রক্রিয়ার অংশ। কেবলমাত্র আত্মরূপান্তরও উন্নয়নের দ্বারা ক্রমবিবর্তনের দ্বৈত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামগ্রিক ভাবে বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে মানুস ক্রম বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় তার নিজের বিশিষ্ট স্থান সম্পর্কে সচেতন হতে পারে ও ভবিষ্যতে আরও উন্নতির পথে নিজেকে পরিচালিত করতে পারে।] যে "মনন" ক্রিয়া মানুষকে তার পূর্ববর্তী স্তরের প্রাণী থেকে পৃথক করেছে তারই সাহায্যে মানুষ ক্রমে প্রজ্ঞার আলোকে অপরোক্ষ অনুভূতিতে উত্তোরিত হয়ে সেই চৈতন্যময় মহাসত্তার সঙ্গে একাত্ম হতে পারে অভিব্যক্তিবাদের মধ্য দিয়ে প্রাণধারাকে আরো উন্নত স্তরে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় যিনি রত। তাই মানুষ তার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে পূর্ণতার প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করে বার বার এবং এই আকর্ষণই তাকে অমৃতের দিকে, শান্তির সন্ধানে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগায়, যার ফলে সে তার বাস্তব পরিবেশকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অতিক্রম করে যেতে চায়। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তার কেবলই মনে হয় "হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনখানে" যেখানে "সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।" পরবর্তীকালের একজন খ্যাতনামা কবিও বলেছেন,

"তবু অগনন অর্ধসত্যের
উপরে সত্যের মত প্রতিভাত হয়ে নব নবীন ব্যাপ্তির
স্বর্গে সঞ্চারিত হয়ে মানুষ সবার জন্যে শুভ্রতার দিকে
অগ্রসর হতে চায়—অগ্রসর হয়ে যেতে পারে।"

(পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে—জীবনানন্দ দাস)

পাশ্চাত্য কবিদের অনেকের চেতনায়ও এই তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। এডিশন (Addison 1672-1719) বলেছেন,

" 'Tis the Divinity that stirs within us,
'Tis heaven itself that points out an hereafter
And intimates eternity to man.—" (Soliloquy on the immortality of Soul)

ভল্টেয়ারের (Voltaire—1694-1778) মতে,

"I am a puny part of the Great Whole

... ...

Seeking light amid the deepening gloom"

(Selecbeb Works of Voltaire, 1911, p. 3-5)

রোমান্টিক কবি শেলী (Shelley – 1702-1822) বলেছেন,

"Life, like a dome of many coloured glass

Stains the white radiance of Eternity."

(Adoneis : 462-63)

বিংশ শতাব্দীর আধুনিক কবিদের পথিকৃৎ টি. এস. এলিয়েটের (Eliot – 1888-1965) কবিতাতেও এই আকুতি শোনা যায় :

"We must be still and still moving

Into another intensity

For a further union, a deeper Communion."

(Four Quartets, East Coker : VI)

আমাদের দেশের প্রাচীন কালের মুনি ঋষিদের প্রজ্ঞার আলোকেও এই তত্ত্ব প্রতিভাত হয়েছিল। তাই তাঁরা বলেছিলেন, "যা ভূমা বা মহান্ তাতেই সুখ, অল্পে সুখ নেই, ভূমাকে জানবার ইচ্ছা করতে হবে" (ছান্দগ্যোপনিষৎ ৭।২৩।১)। তাই তাঁরা বলেছেন।

"চরণ্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।

সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্ ॥ চরৈবেতি, চরৈবেতি।"

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।১৫।৫)

[চলাটাই হল অমৃতত্ব লাভ, চলাটাই তার স্বাদু ফল, চেয়ে দেখ ঐ সূর্যের আলোক সম্পদ, যে সৃষ্টির আদি হতে চলতে চলতে একদিনও ঘুমিয়ে পড়ে নি। অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।] এই এগিয়ে চলা অবশ্যই মনন ক্রিয়ার সাহায্যে প্রজ্ঞার আলোকে অপরোক্ষ অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আত্মিক ভাবে এগিয়ে চলা ও ক্রমে মহাজাগতিক চৈতন্যময় মহাসত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মানবত্ব থেকে দেবত্বে তথা উন্নত স্তরে উত্তরোরিত হওয়া, যে কথা বর্তমান যুগে স্যামুয়েল বাটলার, ফকনার থেকে শুরু করে জুলিয়ান হাক্সলী, বাঁগর্স, বানার্ডশ, ফাদার তিলার্ড ত্যশারদাঁ প্রমুখ বিভিন্ন মনীষীগণ 'নব-ডারুইনবাদ' বা 'অভিব্যক্তি বাদ' বা সৃজনশীল প্রক্রিয়ার (creative Principle) মাধ্যমে ইঙ্গিতে বলার চেষ্টা করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের এক অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের আত্মজীবনী 'জীবন-বেদ' মননক্রিয়ার সাহায্যে জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞার আলোকে অপরোক্ষ অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরমপুরুষকে উপলব্ধি করে সাধারণ মানুষ থেকে দৈবী মানুষে উত্তোরণের ইতিহাস, যার সহজ সরল ভাষা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির ফলশ্রুতি পাঠকদের মনে এক অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার করে। রাজা রামমোহন রায় যে নবজাগরণ আন্দোলনের পূরোধা ছিলেন যুগ পুরুষ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ছিলেন সে আন্দোলনের অন্যতম প্রাণ পুরুষ। এই বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন মহাপুরুষটি ছিলেন একাধারে ঈশ্বরোপলব্ধি পরায়ণ ভক্ত সাধক, ধর্ম প্রচারক, বাগ্মী, সাহিত্য শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক, মানব প্রেমিক, দেশসেবক ও সমন্বয়াচার্য। বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে সব জনহিতকর ও প্রগতিশীল আন্দোলন দেখা যায় তার প্রত্যেকটিতেই কেশবচন্দ্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি, এক সময়ে যাঁরা তাঁর বিরোধী ছিলেন, তারাও পরবর্তী কালে তাঁর আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি। আমাদের দেশে যে সব মনীষীগণ অধ্যাত্ম সাধনায় রত থাকেন তাঁরা সাধারণতঃ জনসমাজ থেকে দূরে সরে কোন নির্জন স্থানে বা গুহায় সাধন ভজনে রত থাকেন। কোন আগ্রহী খোঁজ খবর পেয়ে জিজ্ঞাসু হয়ে তাঁদের কাছে যদি উপস্থিত হন তাহলে তাঁরা উপযুক্ত মনে করলে তাঁদের শিষ্য করে নিজস্ব সাধক সম্প্রদায় গঠন করে আশ্রমবাসী মঠ প্রতিষ্ঠা করে লোকালয় থেকে দূরে সাধনা ও ধ্যান ধারণায় মগ্ন থাকেন। ধর্ম সাধনার সঙ্গে সমাজতত্ত্ব বা লোকস্থিতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, এই তত্ত্ব বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকলেও, তাঁরা ঠিক এ নিয়ে বিশেষ চিন্তা করেন নি। বৃহত্তর সমাজকে লোকাচার, দেশাচার ও নানারকম বিধি নিষেধের হাতে ছেড়ে দিয়ে, তাঁদের ভক্ত বৃন্দকে আধ্যাত্মিক সাধনার গজদন্ত-মিনারের উচ্চ শিখরে নিয়ে গেছেন।

কিন্তু কেশবচন্দ্রের 'ধর্মপিতামহ' রামমোহন প্রবর্তিত নবজাগরণ আন্দোলনের সময় থেকে এই দৃষ্টি ভঙ্গির পরির্তন দেখতে পাওয়া যায়। রামমোহন মনে করেন "actions of moral merit" (English Works of Rammohun Roy : Burman & Nag, Part II, P. 100-101) চিত্ত শুদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় আচারের বেড়াজাল নয়। তিনি যে "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থে"র পরিকল্পনা করেছিলেন তার সংজ্ঞা সম্পর্কে বলেছেন, "যে যে উপায় দ্বারা লোকের শ্রেয় প্রাপ্তি হয়, তাহাই

কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠের কর্তব্য, এই ধর্ম সনাতন হয়।" (চারি প্রশ্নের উত্তর, ১৮২২) আর একটু ব্যাখ্যা করে রামমোহন বলেছেন, "ইন্দ্রিয় দমনে যত্ন অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তকরণকে এরূপে নিয়োগ করিতে যত্ন করিবেন যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে। বস্তুত যে ব্যবহারকে আপনার প্রতি অযোগ্য জানেন তাহা অন্যের প্রতিও অযোগ্য জানিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতে যত্ন করিবেন।" (অনুষ্ঠান, ১৮২৯, ৯ম প্রশ্নের উত্তর) রামমোহনের এই ব্যাখ্যার মধ্যে বুদ্ধদেব, মহাবীর তীর্থংকর ও গীতার বাণীর যুগোপযোগী রূপায়ন দেখা যায়। মননক্রিয়ার সাহায্যে এই সাধনায় প্রবৃত্ত হলে স্বার্থবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে অনাসক্তভাবে কর্ম করা সম্ভব হয় এবং ক্রমে সর্বভূতে সমদৃষ্টি ও প্রেমে মনের সম্প্রসারণ হয়। নবযুগের কর্মযোগের এই হল মূলসূত্র এবং রামমোহনের পাণ্ডিত্য, তত্ত্বালোচনা এবং দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করার মূল উৎসও এই ব্যাখ্যার মধ্যে পাওয়া যায়। কেশবচন্দ্রের ধর্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম বীজে বলেছেন, ঈশ্বরের উপাসনার দ্বারা শুধু 'পারত্রিক' নয় 'ঐহিক' মঙ্গলও হয় অর্থাৎ আধ্যাত্ম-সাধনার সঙ্গে পার্থিব জীবনের যে বিচ্ছেদ ছিল তার সেতুবন্ধন করা হয়েছে এই বীজ মন্ত্রে। ঐ বীজমন্ত্রের চতুর্থ ধারার মহর্ষিকৃত সংস্কৃত অনুবাদ "তস্মিন্ প্রীতি তস্য প্রিয়কার্য সাধনঞ্চ তদুপাসনামেব" (তাঁকে প্রীতি ও তাঁর প্রিয় কার্য করাই তাঁর উপাসনা) শুনে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত মনীষী বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর প্রিয়কার্য কি তা ব্যাখ্যা করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন, "তাঁহারা (সাধু ব্যক্তিরা) নিজে যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা যতক্ষণ না অন্যকে দিতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহাদের তৃপ্তি নাই ; অন্ন পান দীন দরিদ্রের সঙ্গে বিভাগ করিয়া গ্রহণ না করিলে তাঁহাদের মনের পরিতোষ হয় না" (ব্রাহ্মধর্মের ১৪শ ব্যাখ্যান্)।

এঁদের দুজনের ভাব শিষ্য ও উত্তরসূরী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই ভাবকেই আরো পরিস্ফুট করে বলেছেন, "Self must be altogether forgotten and all our thought and affections absorved in the interest of humanity. Deep sympathy makes us one with the World."
(Anniversery lecture : Behold the light of Heaven in India ; 23rd January, 1875)

[সম্পূর্ণভাবে স্বার্থবোধ বিসর্জন দিয়ে, আমাদের সব চিন্তা ও অনুভূতিকে সামগ্রিকভাবে মানব সমাজের মঙ্গল কর্মে নিমজ্জিত করতে হবে। গভীর সহানু-

ভূতি আমাদের সমগ্র জগতের সঙ্গে একাত্ম করতে পারে।] অন্য আর একটি উপদেশে কেশবচন্দ্র বলেছেন, "উপকারী আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া যাহার উপকার করেন, তাহাকে আপনা অপেক্ষা নীচ মনে করেন, এইজন্য পরোপকার এই কথা ভক্তিশাস্ত্রে নাই, কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে ইহার প্রতিশব্দ আছে। সেই শব্দ পরসেবা, জীবে দয়া অর্থ পরসেবা। এই পরসেবা ব্রহ্মের প্রতি প্রেমের অনিবার্য ফল। এই সেবা প্রেম প্রসূত এবং মধুময়।... সেই ভূমি হইতে সকলকে ভালবাসিবে এবং পরসেবা করিবে।" (ব্রহ্মগীতোপনিষৎ ; ৬ষ্ঠ সং, পৃ. ১৯৮-৯৯) নব জাগরণ আন্দোলনের শেষপর্বে আবির্ভূত আর একজন মণীষী স্বামী বিবেকানন্দও এই ভাবকে পরিস্ফুট করে বলেছেন, "সকল উপাসনার সার এই... শুদ্ধ চিত্ত হওয়াও অপরের কল্যাণ সাধন।...যিনি পিতাকে সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাহার সন্তানগণের সেবা অগ্রে করিতে হইবে।—এইভাবে পরের সেবা শুভ কর্ম।" (ভারতে বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১৩৭০, ১৪শ সং, পৃ. ৬২-৬৩) তাঁর বহু উদ্ধৃত কবিতার পংক্তিতে এই ভাবকেই তিনি রূপায়িত করেছেন :—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ।।"

এইভাবে রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মণীষীগণ উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মকে সামাজিক জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে কর্মযোগের একটি নতুন যুগোপযোগী ভাব তুলে ধরেছেন। এই ভাব অনুযায়ী খাপছাড়াভাবে দু-একটা সৎকর্ম করা লোকশ্রেয় বা কর্মযোগ নয় কিন্তু যে সব আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি, ব্যবস্থা ইত্যাদি দ্বারা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবন পরিচালিত হয় সেগুলোকে সংস্কার ও পরিশোধিত করে সামগ্রিক ভাবে জন সমাজ ও দেশকে উন্নত করাই এই কর্মযোগের আদর্শ।

এইভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতি গঠনের জন্য সমাজ ও কর্মসংস্কার জাতিভেদ বিরোধী আন্দোলন, সমগ্র দেশজুড়ে সংহতি ও ঐক্যের বাণী প্রচার, মাদকদ্রব্য বিরোধী অভিযান, স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন, সুস্থ সাংবাদিকতার মাধ্যমে জনমত সংগঠন, জনসাধারণ ও শ্রমজীবিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে তাদের চরিত্রের মান উন্নয়ন ইত্যাদি বহুমুখী কর্মযজ্ঞে নিমজ্জিত হয়েও কেশবচন্দ্রের পক্ষে মনন ক্রিয়ার সাহায্যে প্রজ্ঞার আলোকে অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করে পরমপুরুষের স্পর্শ লাভ করতে কোন অসুবিধা হয় নি।

ষোলটি পরিচ্ছদ বিশিষ্ট কেশবচন্দ্রের আত্মজীবনী 'জীবনবেদ' আত্মার ঈশ্বরান্বেষণ তথা পূর্ণতার প্রতি আকর্ষণ ও পার্থিব জীবন থেকে উত্তোরিত হয়ে দিব্য প্রেরণায় সার্থকতা লাভ করে পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধির অন্তরঙ্গ ইতিহাস তাঁর বহুমুখী কর্মজীবনের পরিচয় এখানে নেই। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগুর তপস্যা ও পঞ্চকোষের স্তর ভেদ করে ক্রমে আনন্দ স্বরূপের উপলব্ধি; বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর আত্মতত্ত্ব, কৌষীতুকি উপনিষদে আরুণির চিত্রের কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ, কঠোপনিষদের যম ও নচিকেতার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মানব জীবন থেকে দিব্য জীবন উত্তরোণের মতই কেশবচন্দ্রের আত্মোপলব্ধির এই অন্তরঙ্গ ইতিহাস অনুপ্রেরণামূলক, শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য। প্রত্যেকেই কি ভাবে ক্রমে তাঁর জীবনকে দিব্য জীবনে পরিণত করে 'বেদে' পরিণত করতে পারেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের 'জীবন বেদ' আমাদের সেই পথেরই সন্ধান দেয়। ১৮৮০ সালের ২১শে নভেম্বর 'জীবন-গ্রন্থ' নামে একটি উপদেশে কেশবচন্দ্র বলেছেন, "লোকের চরিত্র পুণ্য প্রেমে গঠন করিয়া জীবন গ্রন্থ হইতে ঘটনা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিবে এবং তদ্বারা জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার করিবে। জীবন হইতে জীবন জন্মিবে।... জীবন্ত দৃষ্টান্ত লোকের চক্ষের সম্মুখে ধারণ করিতে হইবে, জীবনরূপ বেদ বেদান্ত প্রস্তুত করিয়া মানুষের হাতে হাতে দিতে হইবে।" (সেবকের নিবেদন, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৭-২২৯) পরবর্তীকালে এ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য; "গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিতে পারি, গ্রন্থের উপর অন্ধ বিশ্বাস যত কম হয়, ততই আমাদের মঙ্গল। আপনি নিজে প্রত্যক্ষ কি অনুভব করিয়াছেন, তাহাই প্রশ্ন। ঈশা, মূশা, বুদ্ধ কি করিয়াছেন, বলিলে কি হইবে—তাহাতে আমাদের কিছুই হইবে না, যতদিন না আমরা নিজেরাও সেগুলি জীবনে পরিণত করিতেছি।" (ভক্তি রহস্য, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১৩শ সং, পৃ. ৫৫) কোন একটি বিশেষ শাস্ত্র বা গ্রন্থের তত্ত্বে অন্ধভাবে বিশ্বাস করার চেয়ে বিশ্বাসী সাধকের জীবনের অধ্যাত্ম উপলব্ধি আমাদের পরমার্থিক জ্ঞান লাভের বেশী সহায়তা করে। তাই যে জীবন ঈশ্বরোপলব্ধিতে ধন্য তাই সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বা বেদ।

শাস্ত্রের অভ্রান্ততাতে বিশ্বাসী না হলেও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ভারতীয় সংস্কৃতির মহান্ ঐতিহ্য সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করতেন যে বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রকৃত শিক্ষা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার না করলে দেশের উন্নতি হবে না। তাই তাঁর আত্ম-জীবনীর নাম

"জীবনবেদ" ; যোগ-ভক্তি-জ্ঞান ইত্যাদি সাধনার উপদেশাবলীর নাম "ব্রহ্মোগীতা-পনিষৎ।" তাঁরই উৎসাহে তাঁর অনুগামী উপাধ্যায় গৌর গোবিন্দ রায় ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে "বেদান্ত সমন্বয় ভাষ্য", "গীতা সমন্বয় ভাষ্য" প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত করেছিলেন। ১৮৬১ সালে Revelation নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় কেশবচন্দ্র বলেছেন : "যখন উপনিষদাদি অনুপ্রেরণামূলক বাচন ভঙ্গিতে অধ্যাত্ম জগতের মহান্ পবিত্র অবস্থা বর্ণনা করে, তখন এমন কারো হৃদয় আছে কি যা অশুচিতার মধ্যে নিমগ্ন হতে পারে? ১৮৬৩ সালে The Brahmo Somaj Vindicated নামক বক্তৃতায় বলেছেন, "বর্তমান ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের ভিত্তি হল স্বাভাবিক যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদান্তের সত্য সমূহ…।" ১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে "ভক্তি-শ্রীচৈতন্য" নামক ভাষণে বলেছেন, "হিন্দু শাস্ত্র রত্নাকর সদৃশ তাহাতে কিছুরই অভাব নাই। জ্ঞান চাও পাইবে, ভক্তি চাও পাইবে—কেবল ধর্মের জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে। যদি ব্যাকুল হৃদয়ে অন্বেষণ কর তবে এত রত্ন লাভ করিবে যে তদ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে সুশোভিত করিতে পারিবে।" (আচার্যের উপদেশ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮-৯) ১৮৭০ সালের ইংল্যাণ্ডে বিভিন্ন ভাষণে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার মাহাত্ম্য ও বেদান্ত-উপনিষদের শিক্ষার শ্রেষ্ঠতার কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ ও বেদান্ত-উপনিষদের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলেই ভারতবর্ষ অধঃপতন ও দুর্দশায় পতিত হয়েছে। ১৮৭৮ সালে মহারাষ্ট্রের বিদুষী মহিলা পণ্ডিতা রমাবাই কেশব-চন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন ও মহিলাদের উন্নতির জন্য কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন কেশবচন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন তিনি বেদ পড়েছেন কি না। রমাবাই এর কাছ থেকে নেতিবাচক উত্তর পেয়ে কেশবচন্দ্র মৃদু হেসে তাঁকে একখণ্ড বেদ উপহার দিয়ে বলেছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতিকে ভাল করে জেনে তিনি যেন ঐ কাজ আরম্ভ করেন। ১৮৮১ সালের ৩রা জানুয়ারী "মাতৃভূমি" নামক উপদেশে বলে-ছেন ; "মা, এদেশের প্রাচীন ব্যবহার প্রাচীন শাস্ত্র অনেক। আমরা প্রাচীন গ্রন্থ, প্রাচীন শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব পুরুষদিগকে প্রণাম করি।" (মাঘোৎসব, ১ম ভাগ পৃঃ ১০) দেশকে 'মাতৃভূমি' বলে কেশবচন্দ্র যখন সম্বোধন করেছিলেন তখন তাঁর বন্ধু ও সহপাঠী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয় নি। (ঐ গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকাল, ডিসেম্বর ; ১৮৮২) (১৮৮১ সালের ২১শে এপ্রিল "নিউ ডিস্‌পেনসেশান" পত্রিকায় কেশবচন্দ্র লিখেছিলেন, "আমরা এই শতাব্দীতে বৈদান্তিক ভাবের প্রতি আগ্রহ স্তিমিত হওয়া জাতীয় দুর্ভাগ্য বলে মনে করি।

বর্তমানে শিক্ষিত ভারতবাসী যে ভাবে উপনিষদকে উপেক্ষা করেন তা দেশদ্রোহীতার তুল্য ও ক্ষমার অযোগ্য। আর্য ঋষিদের এই ভাণ্ডারে মহা মূল্য মণি মাণিক্য সঞ্চিত আছে।...বেদান্ত দর্শনকে ক্রমে পরিস্ফুট করা আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।" এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ১৮৮৩ সালের জানুয়ারীতে 'বৈদিক বিদ্যালয়' স্থাপন করেছিলেন। ঐ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিন খ্যাতনামা পণ্ডিত মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন বলেছিলেন, বাংলাদেশের পণ্ডিত সমাজ বেদ-উপনিষদের পুনরুজ্জীবন ও চর্চার উদ্যোগের জন্য কেশবচন্দ্রের কাছে চিরঋণী থাকবেন। (১৮৮৩ সালের ৭ই জানুয়ারীর 'নিউ ডিসপেনসেশান' পত্রিকা দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের যীশু খৃষ্টের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা সম্পর্কে দেশী বিদেশী অনেক পণ্ডিতই নানা রকম মন্তব্য করেছেন। কিন্তু স্বয়ং কেশবচন্দ্র যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার পরিপ্রেক্ষিতেই খৃষ্টের শিক্ষা ও সাধনাকে গ্রহণ করার পক্ষপাতি ছিলেন, তা তাঁর উক্তি থেকেই বেশ বোঝা যায়। ইংল্যাণ্ডে একটি ভাষণে কেশবচন্দ্র বলেছেন, "আমি নিজেকে কখনই খৃষ্টান বলে মনে করি না এবং কখনও করবোও না, কিন্তু আমার মধ্যে খৃষ্টের অধ্যাত্মভাব উপলব্ধি করার আকাংক্ষা আছে। খৃষ্টের অধ্যাত্মভাব বললে আমি ঈশ্বরের সঙ্গে সেই সত্য ও মধুর যোগ বুঝি যা খৃষ্ট নিজ জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন।" (Lectures in England, 3rd ed. p, 289) খৃষ্টের পিতা অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে "সত্য ও মধুরযোগ" কে কেশবচন্দ্র সম্পূর্ণভাবে বেদান্ত ভিত্তিক সাধনা বলে মনে করতেন। ১৮৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল কলকাতার টাউন হলে তাঁর বিখ্যাত ভাষণ "India Asks Who is Christ"এ তিনি বলেছেন, "আপনারা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন, যে দিব্য মানবত্বের তত্ত্বটি মূলতঃ হিন্দু তত্ত্ব এবং খৃষ্টের জীবন ও চরিত্রের যে চিত্রটি আমি তুলে ধরেছি তা আদর্শ হিন্দু জীবনের চরিত্র। পরম সত্তার উপলব্ধিতে গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে যাওয়ার আদর্শটি অবশ্যই বৈদান্তিক হিন্দুধর্মের আদর্শ যা ভারতবর্ষে বিশেষভাবে প্রচলিত আছে এবং ঐ আদর্শের মাধ্যমেই ভারতবর্ষ খৃষ্টকে গ্রহণ করবে।" যীশু খৃষ্টকে তিনি যোগীশ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন এই জন্যই। ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষে তাঁর বিভিন্ন ভাষণে কেশবচন্দ্র যীশু খৃষ্টকে অবতার বা স্বয়ং ঈশ্বর রূপে উপাসনা করার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন ও তার ফলে প্রচলিত খৃষ্ট ধর্মে বিশ্বাসীদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর উত্তরসূরী নব-বেদান্ত আন্দোলনের নেতা বিবেকানন্দের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর একটা মৌলিক পার্থক্য ছিল। ১৮৭০ সালের ২৮শে মে ইংল্যাণ্ডে "খৃষ্ট ও খৃষ্টধর্ম" নামক ভাষণে

কেশবচন্দ্র বলেছেন, "আমরা যদি ঈশ্বরকে এবং মানবকে ভালবাসি তবে আমরা খৃষ্ট সদৃশ হয়ে অনন্ত জীবন লাভ করতে পারি। খৃষ্ট কখনই সেই পূজা বা শ্রদ্ধা দাবী করেন নি, যা বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের প্রাপ্য। শাস্ত্রে তিনি নিজেকে একজন পথ-প্রদর্শক রূপে উপস্থিত করেছেন, লক্ষ্য হিসাবে নয়।...আমরা যদি তাঁর প্রদর্শিত পথে চলি তাহলে তাঁর পিতা রূপী ঈশ্বরের সন্নিধানে, খৃষ্টের সন্নিধানে নয়, পৌঁছে যাব।" (Lecture in England, 3rd Ed. p, 231) ১৯০০ সালে ডিসেম্বরে আমেরিকার কালিফোর্নিয়ায় "ঈশদূত যীশুখৃষ্ট" নামক ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "যদি প্রাচ্যবাসী হিসাবে আমাকে ন্যাজেরথের যীশুকে পূজা করতে হয় তাহলে একটি মাত্র পথই আমার আছে, তা হচ্ছে তাঁকে ঈশ্বর বোধে পূজা করা অন্য কোন ভাবে নয়।" (Christ, The Messenger, Udbodhan Office, 5th ed, p, 16) জীবনবেদের পঞ্চম অধ্যায়ে (স্বাধীনতা) কেশবচন্দ্র এ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আরো বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

মানুষের পূর্ণতার প্রতি আকর্ষণ তথা সৃজনশীল অভিব্যক্তিবাদ সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে বহু উক্তি করেছেন। বস্তুতঃ এই ছিল তাঁর সমন্বয়বাদের ভিত্তি। ১৮৬২ সালের ১১ই জানুয়ারী 'The Destinty of Human Life' ভাষণে কেশবচন্দ্র বলেছেন, "জীবনের সব অংশকেই সত্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, মনের সব শক্তি ও আবেগ পরিশীলিত ও উন্নত করতে হবে।... আমাদের অগ্রগতি হবে পরিপূর্ণ এবং একমুখীণ। এইভাবে সত্যিকারের ধর্মজীবন প্রবাহিত হয়ে চলে অসীম অনন্ত অসীম পুরুষের প্রতি।...এরই মধ্যে আছে প্রকৃত মনুষ্যত্ব।" ২৮৬৮ সালের ২৪শে জানুয়ারী Regenerating Faith নামক ভাষণে বলেছেন, আমরা চাই নবজীবন, এক ধরণের দিব্য পবিত্রতার জীবন।... তা লাভ করতে হলে আগেকার পশু জীবন থেকে নূতন ও উচ্চতর সত্তায় উন্নীত হতে হবে।" বিবর্তনবাদের মধ্য দিয়ে কি ভাবে মানব জীবন থেকে দিব্য জীবনে প্রবেশ করতে হবে সে বিষয়ে কেশবচন্দ্র বলেছেন, "তোমাদের বিবর্তনবাদ যেন মানবতাতেই আবদ্ধ হয়ে না থেকে আরো অগ্রসর হয়ে চলে। বিবর্তনবাদের যে বিধি তোমাদের জড় ও পশু জীবনে অতিক্রম করিয়েছে, সেই বিধিই মানবতাকেও অতিক্রম করে তোমাদের দিব্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবে। বিবর্তনবাদের সর্বোচ্চ অবস্থা হল নবজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিম্নস্তরের মানবতার বিলোপ ও নূতন ধরনের দেব মানবতার বিবর্তন,---মানব জীবনের বদলে দিব্যজীবন।" কিভাবে মানব জীবনকে অতিক্রম করে দিব্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় সে বিষয়ে কেশব-

চন্দ্র বলেছেন, "মানুষের একমাত্র করণীয় হল, ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণ আত্ম সমর্পণ, তবেই তার অন্তরে দিব্য করুণার ক্রিয়া আরম্ভ হবে ও তাকে দিয়ে তার নিজের মুক্তির ব্যবস্থা করিয়ে নেবে। এই হল মানবাত্মার রূপান্তরের গোপন কথা।" (Essays – Theological and Ethical, God's grace and man's efforts) ১৮৮২ সালের ২১শে জানুয়ারী That Marvellous Mystery--- The Trinity নামক ভাষণেও এ সম্পর্কে কেশবচন্দ্র বলেছেন, "পশু জীবন থেকে মানবতায় উত্তোরিত হয়ে এর পরিপূর্ণ বিকাশ হয় মানবে। মানবে বিবর্তনই সৃষ্টির শেষ কথা নয়। এটা ক্রমাগত এগিয়ে চলে মানবতার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে---শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে সে ক্রমে মানবতার উচ্চ স্বরে উন্নীত হয় ও ঈশ্বরের পুত্রে রূপান্তরিত হয়।"

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পূর্বপুরা মহাত্মা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাণীতেও এই ভাবের আভাষ পাওয়া যায়। ১৮২৫ সালে প্রকাশিত On diffe-rent Modes of Worship নামক পুস্তিকায় রামমোহন বলেছেন, "আত্মিক উপাসনা দু'রকমের। প্রথমতঃ আত্মার দিব্য উৎস ধ্যান করা, ক্রমাগত ধ্যান করার ফলে আত্মা সব রকমের মানবিক অনুভূতি থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমে বর্ণনাতীত মূল দিব্য জীবনের পরিপূর্ণতায় উন্নীত হয়। এই অবস্থাকেই সাধারণতঃ সমাধি বলে। দ্বিতীয়তঃ উপাস্যকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান প্রভৃতি পূর্ণ স্বরূপ ভাবাপন্ন মনে করে আত্মার বর্তমান অবস্থায় তাঁর থেকে স্বতন্ত্র অথচ তাঁর প্রতি নির্ভরশীল মনে করা।"

"ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস" গ্রন্থের দ্বিতীয় উপদেশে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই জগৎ সংসারের সমুদয় ব্যাপারই উন্নতির ব্যাপার।...মনুষ্য জাতির অবস্থা বিশেষ উন্নতিশীলা। তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের উন্নতি হইতেছে এবং সামাজিক অবস্থারও উত্তরোত্তর হইয়া আসিতেছে।.. সেই প্রকার প্রতি মনুষ্য অনন্ত কালের মধ্যে যে কত উন্নত হইবে তাহা কে বলিতে পারে?" কেশবচন্দ্রের অনুগামী আচার্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, যিনি ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করে ভারতীয় সংস্কৃতির উদার বাণী প্রচার করেছিলেন ও ১৮৯৩ সালের শিকাগো ধর্মমহাসভায় ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মানিত প্রতিনিধি হিসাবে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন,---তাঁর একটি উপদেশে বলেছেন, "ক্রমাগত মানুষের শারীরিক মানসিক ও অধ্যাত্মিক অবস্থাতে পরিবর্তনের পর পরিবর্তন, উন্নতির পর উন্নতি হইতেছে। এই প্রকারে অসীম পরিবর্তন ও উন্নতির প্রভাবে মানুষ যতই

ভ্রম মায়া বর্জিত হইবে, ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মে অবস্থিতির যাবতীয় অন্তরায় যতই চলিয়া যাইবে, ততই জীবাত্মার সঙ্গে ব্রহ্মের অভেদ ও নিত্যযোগের উপায় সুনির্দিষ্ট হইবে।" (১৮৯৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী 'শান্তিকুটীরে' প্রদত্ত উপদেশ) ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আর একজন অনুগামী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন "জড় হইতে চেতন সর্বত্র বিচিত্রতা আশ্চর্যশক্তি ও কার্যের ভিতর দিয়া অনন্তের সত্তা ও জ্ঞান প্রকাশিত হইতেছে। জগৎ উন্নতির দিকে, বিকাশের দিকে চলিয়াছে। নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরের দিকে সকল জীব ও জগৎ ক্রিয়া করিতেছে। সর্বত্র উর্দ্ধমুখীনতা, উঠিয়া আসা, নামিয়া যাওয়া নয়।---Evolutionএর ধারা simplicityহইতে Complexity-এর দিকে অগ্রসর হইতেছে।" (১৩১৬ সালে মাঘোৎসবের উপদেশ, স্মৃতিপূজা গ্রন্থমালা, ১মখণ্ড, ১৩৫৫. শ্রীহরিদাস রামানন্দ পৃঃ ৮৫-৮৬)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তিতে ও এই ভাব দেখা। তিনি বলেছেন, "ব্রাহ্ম ধর্মের ভাবাত্মক লক্ষণটি কি? তাহা একটি মোটা কথা, তাহা অনন্তের ক্ষুধাবোধ, অনন্তের রসবোধ।···রামমোহন রায় হইতে কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত সকলেরই জীবনে আমরা এই অনন্তের ক্ষুধা বোধের আনন্দ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। "(সঞ্চয় ১৯৭০ সং পৃঃ ৭০-৮০)

আর একটু ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "জগতের বিপুল অভিব্যক্তিতে প্রথম অর্থ দেখলুম প্রাণকণায়, তারপরে জন্তুতে, তারপরে মানুষে। বাহির থেকে অন্তরের দিকে একে একে মুক্তির দ্বার খুলে যেতে লাগলো। মানুষ এসে যখন ঠেকলো তখন যবনিকা উঠতেই জীবকে দেখলুম তার ভূমায়। দেখলুম রহস্যময় যোগের তত্ত্বকে, পরম ঐক্যকে। আলোকের মতই মানুষের চৈতন্য মহাবিকিরণের দিকে চলেছে জ্ঞানে, কর্মে, ভাবে।" (মানুষের ধর্ম; ১৯৬০ সং, পৃঃ ৭১) পূর্ণতার প্রতি আকর্ষণের ফলে মানবাত্মার ক্রমবিকাশ ও দিব্য জীবনের উত্তোরণ প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও পূর্বোদ্ধৃত অন্যান্য মনীষীগণ যা বলেছেন, পরবর্তী কালে নব-বেদান্ত আন্দোলনের নেতা স্বামী বিবেকানন্দ ও 'দিব্যজীবন' (Life Divine) ও 'পূর্ণ যোগ' (Purna yoga) এর প্রণেতা শ্রীঅরবিন্দের ভাষণ ও উপদেশেও তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। ১৮৯৬ সালের ১৮ই নভেম্বর লণ্ডনে 'কর্ম-জীবনে বেদান্ত' বিষয়ে ভাষণ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন, "ইহা যদি সত্য হয় যে মানুষ মাংসল জন্তু বিশেষের পরিণাম মাত্র, তবে সেই জন্তু ও মানুষ একই পদার্থ, কেবল মানুষ সেই জন্তু বিশেষের বহু পরিমাণ বিকাশ মাত্র।···অতএব সীমাবদ্ধ

জীবাত্মাকেও ব্যক্তি বলা যাইতে পারে, তিনি ক্রমশঃ পূর্ণ ব্যক্তিত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। পূর্ণ ব্যক্তিত্ব তখনই লাভ হইবে, যখন তিনি অনন্তে পঁহুছিলেন, কিন্তু সেই অবস্থা লাভের পূর্বে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ক্রমাগত পরিনাম, ক্রমাগত বিকাশ হইতেছে।" (জ্ঞানযোগ; উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯ সং পৃঃ ৩৮৬) শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Life Divine গ্রন্থে বলেছেন, "এক আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ বা অভি-ব্যক্তি জড়ের মধ্যে চৈতন্যের অভিব্যক্তির মাধ্যমে এক চিরন্তন আত্মোন্নতি যতক্ষণ না তা অন্তর্নিহিত পরমাত্মাকে প্রকাশ করে, এই হল পার্থিব জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট বা চাবিকাঠি।" (The Life Divine; Vol II. P-24) তাঁর বিখ্যাত আধ্যাত্মিক রূপক কাব্য 'সাবিত্রী'তে শ্রীঅরবিন্দ এই তত্ত্বটি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট করেছেন;

"This transfiguration is earth's due to heaven
A natural debt binds man to the Supreme
His nature we must put on as he put ours;
We are sons of God and must be even as he
His human portion, we must grow Divine,"

(Book, I Canto Iv)

অথবা "Nature must live to manifest secret God
The spirit shall take up the human play
This earthly Life become the life Divine."

(Book XI, Canto I)

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ধর্মপিতামহ রামমোহন, ধর্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে তাঁর অনুগামী আচার্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী ও পরবর্তী কালের রবীন্দ্রনাথ, নব-বেদান্ত আন্দোলনের নেতা স্বামী বিবেকানন্দ বা 'দিব্য জীবন' ও 'পূর্ণযোগ' এর প্রবক্তা শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ মনীষীদের সকলেরই প্রধান বক্তব্য হল আচার অনুষ্ঠান বা কোন বিশেষ শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের চেয়ে জীবনের উৎকর্ষ সাধনই দেবত্বে উন্নীত হয়ে চৈতন্যময় পরমসত্তার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার উপায়।

এই তত্ত্বই পরিস্ফুট হয়েছে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবনী 'জীবন বেদে।' ক্রমাগত আত্মবিচার ও আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে কেশবচন্দ্র আত্মমগ্ন হয়ে নিরাসক্তভাবে নিজের জীবনের অধ্যাত্ম অনুভূতির উন্মেষ, ক্রমবিকাশ ও পরিণতির

কথা বর্ণনা করেছেন এই গ্রন্থে। তাঁর কর্মময় জীবনের বাহ্য কোন ঘটনার উল্লেখ এখানে নেই। শেষ পৃষ্ঠায় 'জীবনবেদ' রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেশবচন্দ্র বলেছেন, "আমার 'জীবনবেদ' পড়িয়া পৃথিবী যে তোমারই পাদপদ্মে প্রণত হয়, তোমার প্রেম-ভক্তিতে প্রমত্ত হয়, কৃপা করিয়া তুমি এই আশীর্বাদ কর।" ১৮৮৩ সালের জানুয়ারীতে 'জীবনবেদ' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তার আগে ১৮৮২ সালের ২৩শে জুলাই থেকে আরম্ভ করে প্রতি রবিবারে 'জীবনবেদে'র এক একটি অধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দিরের বেদী থেকে উপাসনার নিবেদন রূপে বিবৃত করা হয়েছিল। শেষ নিবেদনটি দেওয়া হয়েছিল, ১৮৮২ সালের ২৪শে ডিসেম্বর। প্রথম প্রকাশের পর 'জীবনবেদে'র অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল এবং হিন্দী, উর্দ্দু, সংস্কৃত, তেলেগু, উড়িয়া, মারাঠি, ইংরাজী (৪টি) ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদিত হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে এক সময়ে এই গ্রন্থটি যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। যদিও এর প্রতিটি অধ্যায় অমূল্য ও গুরুত্বপূর্ণ তবু এর মর্মবাণী বা মূল সুরটি 'বিয়োগ ও সংযোগ' নামে দ্বাদশ অধ্যায়ে পাওয়া যায়।---

"···কিন্তু সামঞ্জস্যের দিকেই যাইতেছি, নববিধানের দিকেই যাইতেছি। আংশিক ধর্ম ছাড়িয়া হৃদয় এখন পূর্ণতার দিকে গিয়াছে। এখন আর আংশিক উন্নতি সাধন করিতে পারি না। স্বদেশ, মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য ঈশ্বর যে নববিধান দিয়াছেন ইহার অর্থ পূর্ণতা। এই পূর্ণতা মনের মধ্যে ছিল। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন ঈশ্বরের মত পূর্ণ হও।·· ভগবান হৃদয়ের নারদকে শিখাইয়াছেন যখন এক জনকে নিমন্ত্রণ করি, এক সত্যকে আহ্বান করি, তখনই নারদ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত সাধুকে, সত্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন।···একটিকে আনিতে গেলেই সকলগুলিকে আনিতে হয়।···এই দেখিয়াই নববিধান নামে অখ্যাত করিলাম নব ব্রাহ্মধর্মকে।···সত্যের তোড়া বাঁধা হইয়াছে। কোনদিন ঋষি আসিলেন, কোনদিন পাঞ্জাবের নানক আসিলেন, কোনদিন অযোধ্যার কবীর আসিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলেই আসিতে লাগিলেন ঈশা, গৌরাঙ্গ সকলেই আসিলেন।···বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্রের স্বর মিলিয়া এক সুমিষ্ট স্বর উৎপন্ন হইল। এখন পূর্ণতা চাই। পূর্ণতার দিকেই এখন যাইতেছি। ক্রমাগত চলিতেছি।···বাল্যকালে চলিয়াছি, যৌবনে ভ্রমণ করিয়াছি, মৃত্যুর পরেও দৌড়াতে হইবে। নববিধানে পূর্ণতা হইবেই হইবে। ···ভাই, বন্ধু, ঈশ্বরের পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। আর অংশ লইয়া ঈশ্বরের অপমান করিও না ;···পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে পূর্ণতা না পাইলে নিস্তার দেখি না।---দয়াসিন্ধু পরমেশ্বর

দয়া করিয়া এই আশীর্বাদ কর, পূর্ণ ধর্ম লইয়া যা কিছু অভাব যেন দূর করি, পূর্ণ পবিত্রতার আনন্দে যেন মগ্ন হই।"

কি ভাবে আরো উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পূর্ণতার সাধন তথা সমন্বয়বাদ কেশবচন্দ্রের জীবনে ক্রমে বিকশিত হয়ে উঠেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন উক্তির মাঝে। ১৮৬০ সালের আগস্ট মাসে প্রেমের ধর্ম (Religion of Love) পুস্তিকায় কেশবচন্দ্র বলেছেন, প্রকৃত ধর্মের উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িকতা বর্জন বিভিন্ন মতাবলম্বী মানব সমাজে ঐক্য স্থাপন ও সমস্ত মানব সমাজে শান্তি ও ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠা করে ঐক্য স্থাপন করা। ১৮৬১ সালের মে মাসে Revelation পুস্তিকায় বলেছেন সব ধর্মের শাস্ত্রেই মানবাত্মার মুক্তিপ্রদ মহান, পবিত্র সত্য আছে, আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে তা গ্রহণ করা উচিত। ১৮৬২ সালের জানুয়ারী মাসে The Destiny of Humen life ভাষণে বলেছেন, বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতাকে ভিত্তি করে, মানবাত্মার সব বৃত্তিকেই, ক্রমাগত শোধন ও সামগ্রিক ভাবে উন্নত করে, ঈশ্বরের পূর্ণতার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে যেতে হবে। এই ভাবে অগ্রসর হয়ে যাওয়াই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। মানবাত্মা কতখানি মহৎ ও উন্নত হতে পারে তা বোঝাবার জন্য মহাপুরুষরা প্রায়ই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। ১৮৬৩ সালের Brahmo Samaj Vindicated ভাষণে বললেন, সব সত্যই ঈশ্বরের, কারণ সবই তাঁর কাছ থেকে আসছে। ১৮৬৫ সালের মাঘোৎসবের ভাষণে বলেছেন, জগতের সমস্ত সাধুরাই আমাদের নেতা ও গুরু স্থানীয়। ১৮৬৬ সালের Great Men নামক ভাষণে বলেছেন, (১) ঈশ্বরের প্রকাশ কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডে বা প্রকৃতিতে (২) ঈশ্বরের প্রকাশ ইতিহাস, তিনি জাতি ও সভ্যতার উত্থান পতন নিয়ন্ত্রণ করে নানা রকম প্রগতিশীল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানব সমাজকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে চলেছেন (৩) ঈশ্বরের প্রকাশ মানুষের আত্মায়; মানুষের অন্তরে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাঁর প্রকাশই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। প্রত্যেক মহাপুরুষই ঈশ্বরের বাণীবাহক হয়ে এক একটি বিশেষ বাণী প্রচার করে মানব সমাজকে উন্নত করার জন্য পৃথিবীতে আসেন। আমাদের উচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে সকলের মূল বক্তব্যকে গ্রহণ করা। ১৮৬৯ সালের জানুয়ারীতে The future Church নামক ভাষণে বললেন, কোন ধর্মই সর্বতোভাবে উল্লেখণীয় নয়, সকলেরই অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে কিছু তত্ত্ব বা আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ভবিষ্যতের ধর্ম সব ধর্মের মূল তত্ত্বকে আত্মস্থ করে গড়ে উঠবে, যদিও দেশ কাল-ভেদে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে।

এই ভাবে ১৮৭০ থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে ও ভারতে বিভিন্ন ভাষণ ও প্রার্থনায় তাঁর এই উপলব্ধিকে তিনি নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ১৮৭৪ সালের ৮ই মার্চ 'বিধাতা পূজা – বিশেষ বিধানে বিশ্বাস' এই উপদেশে বলেছেন, "জগতে যত ধর্ম সম্প্রদায় হইয়াছে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই এক একটি বিশেষ বিধানের উপর সংস্থাপিত।...যখনই মঙ্গলময় বিধাতা দেখিলেন যে একটি ধর্মসম্প্রদায় ক্রমে নির্জীব হইতে লাগিল—তখনই জগতের পরিত্রাণের জন্য কতগুলি অগ্নিময় শাস্ত্র দিয়া নূতন কতকগুলি সতেজ গুরু প্রেরণ করিলেন, যখন তাহারাও পুরাতন হইল আবার এক নূতন বিধান প্রেরিত হইল।... আমরা বিশ্বাস করি আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজ তাঁহারই বিশেষ বিধান।" এ সবের ফলশ্রুতি হিসাবে ১৮৮০ সালের ২০শে জানুয়ারী ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দিরের বেদী থেকে নববিধান ঘোষণার দিন তাঁর যে উপলব্ধিকে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন' 'জীবনবেদের দ্বাদশ অধ্যায়ে সেই পূর্ণতা সাধনের কথা তথা সকল ধর্মের মর্মবাণী ও সকল মহাপুরুষের জীবন সত্যকে আত্মিকরণের (assimilisation) মধ্য দিয়ে মানুষ জীবন থেকে দিব্য জীবনে উত্তরোরিত হয়ে চৈতন্যময় পরমসত্ত্বার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার কথাই বলেছেন। এই হল জীবনবেদের মর্মবাণী।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের একজন জীবনীকার স্বর্গীয় মণি বাগচি বলেছেন, "কেশবচন্দ্রের অধ্যাত্ম জীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস যাঁহারা গভীর ভাবে অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা দেখিয়াছেন যে তাঁহার ধর্মমত তাঁহার ধর্ম-জীবনের আরম্ভ হইতেই বিবর্তনের দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতেছিল। কেহ যেন মনে না করেন নববিধান কেশবচন্দ্রের একদিনের বা এক মুহূর্তের চিন্তার ফল।...অনেকের ধারণা কেশবচন্দ্র অন্যর নিকট ঋণ করিয়া ধর্মজীবন ও ধর্ম-সমাজ গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহার বুঝি কোন মৌলিকতা ছিল না। কেশবচন্দ্র নিজেই ইহার উত্তর দিয়াছেন।" (কেশবচন্দ্র, জিজ্ঞাসা, ১৩৬৬ সং, পৃঃ ১৬৬-৬৭) ১৮৮০ সালে ব্রহ্মমন্দিরের বেদী থেকে নববিধান ঘোষণার দিন কেশবচন্দ্র তাঁর অধ্যাত্ম অনুভূতির যে পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি সকলের কাছে তুলে ধরেছিলেন ১৮৬০ সাল থেকে কি ভাবে ক্রমে বিকশিত হয়ে উঠেছিল তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমরা বর্ণনা করেছি। ১০৮০ আগেই ১৮৭৫ সালের ২৩ শে জানুয়ারী কলকাতা টাউনহলে প্রদত্ত তাঁর বিখ্যাত ভাষণ "Behold the Light of Heaven in Indiaতেই তার পরিপূর্ণ রূপটি আমরা পাই। ঐ ভাষণে তিনি বলেছেন, "সত্য এক, কিন্তু প্রভু বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবে তাকে প্রতিভাত করেছেন। সুতরাং একটি নূতন

বিধান আমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছে যা কোন একটি বিশেষ ধরণের নূতন মতবাদ নয়, কিন্তু পূর্ববর্তী সকল বিধানের উন্নত নবভাব।...ধ্বংসের জন্য এর আগমন নয় কিন্তু পূর্ববর্তী মহাপুরুষদের শিক্ষার পূর্ণতা সাধনাই এর উদ্দেশ্য। এক দিক দিয়ে এটি যেমন অতীতের সব সাধনার পরিপূর্ণতা, তেমনি এর মধ্যে ভবিষ্যৎ বিধানের বীজ আছে।"

এর প্রায় দুমাস পরে ১৮৭৫ সালের ১৫ই মার্চ দক্ষিণেশ্বরের খ্যাতনামা মহামানব, যিনি প্রায় নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও অতি উচ্চ অধ্যাত্ম অনুভূতিসম্পন্ন ও সর্বধর্মের প্রতি সমদৃষ্টি ভাবাপন্ন ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বেলঘরিয়া তপোবনে এসে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ধর্ম প্রসঙ্গ করেছিলেন। তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় এই প্রথম, কিন্তু এর আগে (আনুমানিক ১৮৬৪-৬৫ সালে) শ্রীরামকৃষ্ণদেব আদি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় কেশবচন্দ্রকে দেখে বলেছিলেন "এরই ফাৎনা ডুবেছে।" বেলঘরিয়া উদ্যানে প্রথম সাক্ষাৎকারের পর শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব "ব্যাঙাচির লেজ খসে যাওয়ার" উপমা দিয়ে বলেছিলেন, "মানুষের যতদিন অবিদ্যায় ল্যাজ না খসে ততদিন সংসার জলে পড়ে থাকে। অবিদ্যার ল্যাজ খসলে—জ্ঞান হলে তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা হলে সংসারেও থাকতে পারে।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম ভাগ ১৮৮৪ ; ২৬শে অক্টোবর) খ্যাতনামা দেশনায়ক বরিশালের শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত (যিনি বরিশালের "কেশবচন্দ্র সেন" বলে পরিচিত ছিলেন) তাঁকে যে প্রশ্ন করেছিলেন তার উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন :

"কেশববাবু কেমন লোক ?

ঠাকুর—ওগো সে দৈবী মানুষ" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ১ম ভাগ, ১৯ সং পরিশিষ্ট পৃঃ ২৬২)

কি ভাবে কেশবচন্দ্র 'ফাৎনা ডুবিয়ে' 'অবিদ্যার ল্যাজ খসিয়ে' ক্রমে 'দৈবী মানুষে' পরিণত হয়েছিলেন, তাঁর আধ্যাত্মিক আত্মজীবনী 'জীবনবেদ' তারই অন্তরঙ্গ সুলিখিত ইতিহাস যা পাঠ করলে একটি বিশেষ অনুভূতিতে আমাদের অন্তর আপ্লুত হয়ে ওঠে। ভাব ও ভাষার দিক দিয়ে এটি বাংলা সাহিত্যে একটি অমূল্য সম্পদ হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। 'জীবনবেদ' এই কথাটি কেশবচন্দ্রই প্রথম বাংলা সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যে কোনো সম্প্রদায়ের ঈশ্বর বিশ্বাসী উদারমনা মানুষ এই গ্রন্থটি পাঠ করে উপকৃত ও তৃপ্ত হবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। 'জীবনবেদে'র প্রথম পরিচ্ছদ

'প্রার্থনা'। ধর্মজীবনের প্রথম কথাও এই। ধর্মজীবনের প্রারম্ভে ধর্মার্থীর সামনে কত শাস্ত্র, কত মতবাদ, কত সম্প্রদায়, কত সাধু মহাপুরুষ উপস্থিত। কাকে ছেড়ে কাকে গ্রহণ করা উচিত এ এক মহা সমস্যা। প্রচলিত ধারণা এই যে এ সমস্যার সমাধানের জন্য সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী সাধন ভজনে রত হওয়া উচিত। কিন্তু কে সদ্‌গুরু বা সত্যিকারের গুরু, যিনি চৈতন্যময় পরম সত্তার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার পথের সন্ধান দিতে পারবেন? 'গুরু গীতা' প্রভৃতি শাস্ত্রে সদ্‌গুরুর যে লক্ষণ বলা হয়েছে, সে রকম গুরু পাওয়া অতি দুর্লভ। কোন শাস্ত্র বা কোন মহাপুরুষের উপদেশ অনুসারে চলা উচিত, তাও এই অবস্থায় বোঝা খুব কঠিন, কারণ বিভিন্ন মত ও আদর্শের বেড়াজালে মন বিভ্রান্ত হয়। তখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মনে হয়,

"তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না, করে শুধু মিছে কোলাহল
সুধা সাগরের তীরেতে বসিয়া পান করে শুধু হলাহল"

... ...

আমি কোথা যাব, কাহারে শুধাব, নিয়ে যায় সবে টানিয়া"

সুতরাং সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পন্থা হল সর্ব শাস্ত্র, সর্ব ধর্মের প্রসূতি যিনি তাঁর শরণ নেওয়া, তাঁর কাছেই নিজেকে নিঃশেষে সোঁপে দেওয়া। কারণ সেই অবস্থাতেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—

"শূন্য করিয়া রাখ তোর বাঁশী, বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি"

তাই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলেছেন, "গির্জায় যাইব, কি মসজিদে যাইব, দেবালয়ে যাইব, কি বৌদ্ধদিগের দলে যোগ দিব—তাহার কিছুই ভাবিতাম না। প্রথমেই বেদ, বেদান্ত কোরান পুরান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা, তাহাই অবলম্বন করিলাম"। (জীবনবেদ, ১ম অধ্যায়) কারণ "প্রার্থনা কর বাঁচিবে, চরিত্র ভাল হইবে, যাহা কিছু অভাব পাইবে—এই কথাই জীবনের পূর্বদিক হইতে পশ্চিমে, উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইত।" ঋগ্বেদের ৩য় মণ্ডলের ৬২ সূক্তের ১০ম শ্লোকে বিখ্যাত গায়ত্রী মন্ত্রে সূর্যের অন্তর্যামী তেজঃ স্বরূপ সর্বব্যাপী পরমাত্মাকে অন্তর্যামী রূপে চিন্তা করতে বলা হয়েছে, যিনি আমাদের সব বুদ্ধি বৃত্তি প্রেরণ করছেন। কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ২য় বল্লীর নবম শ্লোকে বলা হয়েছে তর্ক দ্বারা, বেদাধ্যায়ন বা মেধা দ্বারা পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না, যাঁকে ইনি বরণ করেন তিনিই এঁকে লাভ করেন। তাই গীতাতেও অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে আমাদের সকলকে গীতাকার বলেছেন "হে ভারত সর্বতোভাবে তাঁরই শরণ নাও; তাঁর প্রসাদে পরম

শান্তি ও নিত্যস্থান পাবে।" (১৮।৬২) পরে ৬৫ শ্লোকে ঈশ্বরের উক্তি রূপে বলেছেন, "তুমি আমাতেই চিত্ত রাখ, আমাকে ভক্তি কর, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তুমি আমাকেই পাবে।" যীশু-খৃষ্টও বলেছেন, "চাও তাহলে দেওয়া হবে, সন্ধান কর তাহলে পাবে, করাঘাত কর, তাহলে তোমার জন্য দরজা খুলে যাবে।" (মথি ৭ : ৭) মহানির্বাণ লাভের আগে বুদ্ধদেবও বলেছিলেন তাঁর শিষ্যদের, "আত্মদীপোভব—তুমি নিজেই তোমার আলোকবর্তিকা হও। তোমার প্রজ্ঞাদৃষ্টিই তোমাকে পথ দেখাবে···" (ধৰ্ম্মপদ ; হরফ প্রকাশনী, ১ম সং, পৃঃ ৮৭) সহজ, সরল প্রার্থনার মাধ্যমেই ক্রমেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র অন্তরে এই প্রজ্ঞার আলো লাভ করেছিলেন। তাঁর ধর্মপিতামহ রামমোহন কেনোপনিষদের ইংরাজী ভূমিকায় (১৮২৩) বলেছেন সর্বশক্তিমান পুরুষের মঙ্গল ইচ্ছার উপর একান্তভাবে নির্ভর করা উচিত, কারণ আমরা একান্ত মনে যা চাই, তা তিনিই কেবল আমাদের পাইয়ে দিতে পারেন। কেশবচন্দ্রের ধর্মবন্ধু সাধকশ্রেষ্ঠ মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও বলেছেন, "ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁকে প্রার্থনা করো আর কাঁদো। এইরূপে চিত্ত শুদ্ধি হয়ে যাবে। নির্মল জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত : ১ম ভাগ, ১৮৮৪, ১৯শে অক্টোবর) ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র অধ্যয়নশীল ও তৎকালীন পাশ্চাত্য দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে সুপণ্ডিত। 'বেদ, বেদান্ত, কোরাণ, পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা' তাতে ডুব দিয়ে প্রত্যক্ষ ঈশ্বরোপলব্ধির পথে অগ্রসর হয়ে সব সন্দেহ দূর করার সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। তাই তিনি বলেছেন, "প্রার্থনা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, দেখিতে চাহিলে দেখা যায়, শুনিতে চাহিলে শোনা যায়— এই জানিতাম।···প্রার্থনা করিয়া আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতাম।···যে প্রার্থনা করিয়া আদেশের জন্য অপেক্ষা করে না সে প্রবঞ্চক।" (জীবনবেদ ; ১ম অধ্যায়)

জীবনবেদের দ্বিতীয় অধ্যায় 'পাপবোধ'। প্রার্থনার উদ্দেশ্য অধ্যাত্ম অনুভূতি ও বল সঞ্চয়। অধ্যাত্ম অনুভূতির ফলে সাধক যত অধ্যাত্ম জীবনে অগ্রসর হন ততই তাঁর নিজের অপূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতার প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে এবং পাপবোধও তীক্ষ্ম হতে থাকে, কারণ মনের শূন্যতা যাতে পাপচিন্তায় ভরে না যায়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। এ সম্পর্কে কোনো কোনো মহলে বিশেষতঃ গত শতাব্দীর শেষ ভাগে অভ্যুদিত হিন্দু পুনরুত্থান আন্দোলন বা নব-বেদান্ত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কিছু ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। তাঁরা মনে করেন কেশবচন্দ্রের "পাপবোধ" খৃষ্টীয় প্রভাবের ফল, ভারতীয় ধর্ম সাধনায় এর কোনো স্থান নেই। তাই স্বামী

বিবেকানন্দ বলেছেন, "শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতের ভিতর পাপ বা অশুভ কিছু দেখতে পেতেন না, কাজেই সেই মন্দ দূর করার জন্য চেষ্টা করারও কোন প্রয়োজন বোধ করতেন না। আর কেশবচন্দ্র একজন মস্ত নৈতিক সংস্কারক, নেতা এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।" (দেববাণী ; উদ্বোধন কার্যালয় : ১২শ সং ; পৃঃ ৪৯) যদিও এই সরল প্রাণ সাধকশ্রেষ্ঠ মহামানব প্রায়ই ও কথা বলে সকলকে উৎসাহিত করতেন যে নিজেকে পাপী মনে করা উচিত নয়, ঈশ্বরের নাম করলে আর পাপ থাকে না ইত্যাদি, কিন্তু নিজের বেলা পাপকে উপেক্ষা করেন নি। তাই চিন্ময়ী জগত মাতার কাছে প্রার্থনা করার সময় বলেছিলেন ; "আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম।...বলেছিলাম 'মা এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও' "। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ; ১ম ভাগ ; ১৮৮২, ২৭শে অক্টোবর) তা ছাড়া এক সময় যারা অসৎ জীবন যাপন করেছিল তিনি তাদের পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতে দিতেন না। ভগবতী দাসী নামে একজন স্ত্রীলোক, প্রথম দিকে যার স্বভাব-চরিত্র ভাল ছিল না, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে দর্শন করতে এসে, তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার পর ; "বৃশ্চিক দংশন করিলে যেমন লোক চমকিয়া উঠে ও অস্থির হইয়া পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরূপ অস্থির হইয়া 'গোবিন্দ গোবিন্দ' এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঘরের কোনে গঙ্গাজলের একটি জালা ছিল—এখনও আছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে যেন ব্যস্ত হইয়া সেই জালার কাছে গেলেন। পায়ের যেখানে দাসী স্পর্শ করিয়াছিল গঙ্গাজল লইয়া সে স্থান ধুইতে লাগিলেন।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ; ২য় ভাগ ; ১৮৮৩ ৫ই জুন)

কেশবচন্দ্রের ধর্মপিতামহ রামমোহন বলেছেন, "পাপী মনস্তাপ করিলে ঈশ্বর করুণাশক্তি দ্বারা মার্জনা করেন..." ব্রাহ্মণ সেবধি, সাহিত্য পরিষদ সং ; পৃঃ ১৩) তাঁর ধর্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন—"পাপেতে ভীত হইয়াছ, তাঁহার শরণাপন্ন হও, তাহা হইতে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা কর, ঈশ্বরের নিকটে ক্রন্দন কর।... অনুতাপিত হৃদয়ে তাঁহার নিকট অশ্রুপাত করুন তাহা হইলেই তাঁহার হৃদয়ের যন্ত্রণা যাইবে, পাপের আকর্ষণ থাকিবে না..." (ব্রাহ্মধর্মের ৩য় ব্যাখ্যান) সুতরাং যাঁরা মনে করেন কেশবচন্দ্রের আগে ব্রাহ্মসমাজে পাপবোধ সম্পর্কে সচেতনতা একেবারেই ছিল না, তাঁদের ধারণা সঠিক নয়। পাপ ও তা থেকে মুক্ত হওয়ার আকাংখা ও প্রচেষ্টা ধর্মার্থী ও সাধকদের জীবনের চিরন্তন সমস্যা। বৃহদারণ্যক

উপনিষদে বলা হয়েছে "এই প্রেতাত্মা জন্ম গ্রহণ করার সময় শরীর ধারণ কালে পাপ রাশির সঙ্গে সংসৃষ্ট হন।" (৪।৩।৮) ঐ উপনিষদেই এ কথাও বলা হয়েছে "তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে কর্মণা পাপকেন।" (৪।৪।২৩) [তাঁর স্বরূপ বা মহিমা জানলে কেউ পাপ কর্মের দ্বারা লিপ্ত হয় না।] কেনোপনিষদের ৪র্থ খণ্ডের ৯ম শ্লোকেও পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে ; "যিনি এই ব্রহ্ম বিদ্যা অবগত হন, তিনি পাপ থেকে মুক্ত হয়ে অনন্ত ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হন।" মুণ্ডকোপনিষদের ৩য় মুণ্ডকের ২য় খণ্ডের নবম শ্লোকে বলা হয়েছে, যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্ম স্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং তিনি "তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং" অর্থাৎ শোক ও পাপ থেকে উত্তীর্ণ হন। কৌষীতকি উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকেও ঋষি অন্তর থেকে ব্যাকুল প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছিল, "তুমি বিশেষভাবে পাপ বিনাশক, বিশেষভাবে আমার পাপ বিনাশ কর।" গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৬ নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের ব্যাকুল প্রশ্ন সর্ব-যুগের সাধকদেরই চিরন্তন আকুতি ফুটে উঠেছে, "হে কৃষ্ণ লোকে কার দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হয়ে পাপাচরণ করে ?" পরবর্তী শ্লোকে গীতাকার শ্রীকৃষ্ণের জবানীতে বলেছেন, রজোগুণোৎপন্ন কাম ও ক্রোধের ফলেই এরকম হয়। কিন্তু এর চরম উত্তরটি দিয়েছেন ১৮ দশ অধ্যায়ের ৬৬নং শ্লোকং "সর্ব ধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইত্যাদি অর্থাৎ সব ধর্ম পরিত্যাগ করে তুমি একমাত্র আমারই শরণ নাও ; আমি তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত করবো। মনুসংহিতায়ও বলা হয়েছে :

"কৃত্বা পাপং হি সন্তপং তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে
নৈবং কুর্য্যাৎ পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ ॥" (১১।২৩১)

[পাপ করে তার জন্য অনুতাপ করলে সেই পাপ থেকে সে মুক্ত হয়। 'এ কর্ম আর করবো না' এই প্রতিজ্ঞা করে তা থেকে নিবৃত্ত হলে সে পবিত্র হয়।] মহাভারতের আদি, শান্তি ও উদ্যোগ পর্বেও পাপপুণ্য সম্পর্কে অনেক কথা আছে। সর্বজনবিদিত সূর্য প্রণাম মন্ত্রে দিবাকরকে 'সর্ব পাপঘ্নং' অর্থাৎ সর্ব পাপহারী বলা হয়েছে। সুতরাং অনুতপ্ত হয়ে ব্যাকুল প্রাণে পরমপুরুষের শরণাপন্ন হলে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমে পবিত্র হওয়া যায়, এই ভাব খৃষ্টধর্ম থেকে এসেছে, প্রাচীন ভারতের শাশ্বত ধর্মে এর কোন স্থান ছিল না ; এই ধারণা সত্যি নয়। প্রচলিত খৃষ্টধর্ম অনুযায়ী মানুষের আদি পিতামাতা আদম্ এবং ইভ্ নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে যে পাপ করেছিলেন, তার ফলে মানুষ মাত্রেই জন্ম পাপী অর্থাৎ পাপেতেই তার জন্ম। যীশুখৃষ্টকে ঈশ্বরের

একমাত্র পুত্র ও অবতার বলে বিশ্বাস করে তাঁর শরণাপন্ন হলে পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। যীশু খৃষ্টকে 'প্রফেটদের মধ্যে অন্যতম' মনে করে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করলেও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পাপ সম্পর্কে ধরণা এই ভাব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি বলেছেন, "শরীর যখন আছে, কাম ক্রোধাদির মূলও আছে—এ কথা বলিতেছি বটে, কিন্তু সে মত মানি না, যে মতে পাপই মানুষের জন্ম নির্দেশ করে। পাপের সম্ভাবনায় জন্ম ইহা মানি। শারীরিক প্রবৃত্তি যখন আছে, পাপের মূল সেইখানে।" (জীবনবেদ, ২য় অধ্যায়) আধুনিক মনোবিজ্ঞানও বলে যে মানুষের অবচেতন মনে অনেক বাসনা কামনা 'ছাইচাপা' দেওয়া অবস্থায় থাকে। উপনিষদের ঋষি এবং গীতাকারের মতো কেশবচন্দ্রও মনে করেন ব্রহ্ম সহবাস অর্থাৎ অনুতাপ ও প্রার্থনা সহযোগে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হলে ক্রমে পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই কেশব-চন্দ্র বলেছেন, "বন্ধু যেমন অন্ধকারের কথা বলিলাম, তেমনি আলোকের কথাও বলিলাম। যদি পাপ করিয়া থাকো, তোমার প্রাণ ছট্‌ফট্ করুক। যেমনই ছট্‌ফট্ করিবে অমনি শান্তিদেবী নিকটে আসিয়া তোমাকে শান্তি দান করিবেন। (জীবন-বেদ, ঐ) কারণ যে মাকে প্রাণ দিয়াছে সে কি পাপকে ভয় করে" (ঐ)। ১৮৮১ সালের ১লা মে 'পাপাসুর জয়' নামে উপদেশে (সেবকের নিবেদন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৩—১২৩) কেশবচন্দ্র বলেছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে ইচ্ছা পোষণ করা হয় তাই পাপ। এ জাতীয় সব রকম পাপ প্রলোভন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনার সাহায্যে ধর্মবল ও সৎসাহস সঞ্চয় করতে হবে।

জীবনবেদের তৃতীয় অধ্যায় 'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা।' প্রার্থনা ও পাপবোধের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হওয়ার পর সাধক জীবনের যে উৎসাহ ও প্রেরণার সঞ্চার হয় তাকেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা বলেছেন। কেশবচন্দ্র চিরদিনই নির্জীবতা ও স্থবিরত্বের বিরোধী। তাঁর যোগ, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মের সম্মিলিত জীবন দ্বারা তিনি তরুণ ও যুবকদের চিরদিনই নিত্য নূতন আদর্শ ও কর্মযজ্ঞে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছিলেন। তাঁর তেজোপূর্ণ বক্তৃতা ও উপদেশ তৎকালিন যুব সমাজকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল এ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ; "... that the genuine orator (Keshub), exercised a sort of hypnotism over the audience. I have listened to many orators, Indian, English and American, but Keshub Chandra Sen was easily the greatest of them all" ('লাহোরের, ট্রিবিউন 'পত্রিকার সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্মৃতি কথা, ৭ই জানুয়ারী, ১৯২৬ সংখ্যায় 'নববিধান'

পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত) কেশবচন্দ্র বলছেন "ক্রমাগত নূতন ভাব লইবার, নূতন সম্ভোগ করিবার ইচ্ছা হইতেছে। এ লোক ক্রমাগত নূতন সম্ভোগ করিবার ইচ্ছা হইতেছে। এ লোক ক্রমাগত নূতন দিকেই দৌড়াইতেছে। নূতন মাত্রই উত্তাপবিশিষ্ট ; পুরাতন অর্থই শীতল।...এইরূপ তেজ, উৎসাহ, উত্তাপ, অগ্নি প্রত্যেককেই রাখিতে হইবে। উৎসাহদাতা, প্রাণদাতা যিনি তাঁহাকেই ডাকি, উৎসাহের সহিত অগ্নি স্বরূপকে ডাকি।" (জীবনবেদ : ৩য় অধ্যায়) খ্যাত-নামা কবি মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন, "এই যে উত্তাপের অবস্থা, ইহাই কেশবজীবনের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য।...ইহারই ফলে আমরা নব যুগের নূতন কালচার সৃষ্টি করিয়াছি—রাষ্ট্রে, সমাজে ও সাহিত্য, বিষম আদর্শের মিলন ঘটাইয়া সমগ্র ভারতের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় ঘোষণা করিয়াছি।...কেশবের অব্যবহিত পরবর্তীকালে যে আর এক মহাপুরুষ এই জাতির জীবন যজ্ঞে শেষ আহুতি দিয়াছিলেন, সেই বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহার প্রচার প্রণালী ও কর্মপদ্ধতিতে কেশবের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেলেন ; যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষার কথা কেশব তাহার 'জীবনবেদে' উল্লেখ করিয়াছেন, ভাবের সেই উৎসাহ, কর্মোন্মাদনার সেই উত্তাপ বিবেকানন্দের জীবনেও অপরিমিত।" (বঙ্গশ্রী, ফাল্গুন, ১৩৪০)

জীবনবেদের চতুর্থ পরিচ্ছদ—"অরণ্যবাস ও বৈরাগ্য।" এ বিষয়ে কেশবচন্দ্র বলেছেন, "বন ছিল না, বনে গেলাম না। গৈরিক বস্ত্রের ভাব ছিল না, তাহাও পরিলাম না।...যে বাড়িতে ছিলাম সেই বাড়িকে যে ঘরে ছিলাম সে ঘরকে শ্মশানের মত বনের মত করিলাম।...সংসারের টাকাকড়ির মধ্যে থাকিয়াও আমি সামান্য বস্ত্র পরিয়াই সময় কাটাইতাম।...যদি দ্বিজ হইবার বাসনা কর, ঈশ্বরের হাতে যদি আপনাকে দেখিতে চাও, অন্তরের ভিতরে যে জন্তু আছে তাহাকে মারিতে হইবে কুপ্রবৃত্তি সকলকে তাড়াইতে হইবে। কিছুদিন শোকের অশ্রু পরিবে...অবশেষে চমৎকার ভাগবতী তনু লাভ হইবে। (জীবনবেদ, ৪র্থ অধ্যায়) বাহ্যিক কৃচ্ছ্রসাধন বা চিহ্ন ধারণ নয় কিন্তু সংসারে থেকেই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়ে অনাসক্ত জীবনযাপন করাই প্রকৃত 'অরণ্যবাস ও বৈরাগ্য'। গেরুয়া বা ভস্ম নয় কিন্তু "স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং।" এই সাধনার ফলে পরে সংসারের সঙ্গে কি রকম সম্পর্ক গড়ে ওঠে সে বিষয়ে কেশবচন্দ্র বলেছেন "স্ত্রী পুত্রকে আগে ভয়ানক ভাবিয়াছিলাম এখন তাহাদিগকে চরি ধারে বসাইয়া কত আনন্দ করিতেছি। মনে হয় এই পৃথিবীতে স্বর্গ দেখিতেছি।' (জীবনবেদ ৪র্থ অধ্যায়) তাঁর ধর্মপিতামহ রামমোহন "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থে"র আদর্শ সম্পর্কে

বলেছেন, "তাবদ্বস্তুর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন ; এইরূপ চিন্তনের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহস্থেরা তৎ তৎ কর্ম নিষ্পন্ন করেন।" (ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ) তাঁর ধর্মবন্ধু শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবও বলেছেন, "লুকোচুরি খেলায় যেমন বুড়ী ছুঁলে চোর হয় না, সেই রকম ভগবানের পাদপদ্ম ছুঁলে আর সংসারে বদ্ধ হয় না। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ২৬শ সং, পৃ. ৪২)

জীবনবেদের পঞ্চম অধ্যায় স্বাধীনতা'। স্বাধীনতার সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করে কেশব-চন্দ্র বলেছেন, "আমার ইষ্ট দেবতা যখন আমাকে মন্ত্র দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহা স্বাধীনতা মন্ত্র নিবিষ্ট ছিল।···স্বেচ্ছাচারের অধীন হওয়া হইবে না··· কোনো এক পুস্তককে কেন অভ্রান্ত ভাবিব? কেন একটি মানুষকে অবলম্বন করিব? মহামান্য ঈশা মহীয়ান হউন, শ্রীগৌরাঙ্গকেও যথেষ্ট ভক্তি করি, কিন্তু তাঁহাদিগকে জীবনের আদর্শ করিনা। অহঙ্কারী বলিতে চাও বল। দুরাচার বলিবে তাহাও বল। কিন্তু কোন মানুষকে জীবনের আদর্শ কখনও মনে করি নাই, করিবও না। পূর্ণ আদর্শ মানুষ হইতে পারে না। যেখানে ঈশার আলোক পৌঁছিতে পারে না, ঈশ্বর আদর্শ হইয়া নিজ আলোকে সে স্থান প্রকাশ করেন। কোন পুস্তক নাই, যাহাতে পূর্ণ জ্ঞান পাইতে পারি, এইজন্য বইকে আদর্শ করিয়া লই নাই। ঈশ্বরের পুত্র সকলকে আমি যেমন ভালবাসি কে এমন ভালবাসিয়া থাকে? অথচ আমিই বলি তাহাদিগকে জীবনের আদর্শ ভাবিয়া পিতার অপমান করিব না।···ঈশ্বরের কাছেই আমি থাকিব। স্বর্গে কি পৃথিবীতে কাহারও দাস হইব না। (জীবনবেদ ৫ম অধ্যায়) মুণ্ডকোপনিষদে (৩।২।৯) বলা হয়েছে 'ব্রহ্মবেদব্রহ্মৈব ভবতি' অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হন। গীতাতেও বলা হয়েছে—

"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।

বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ।।" (৯।১৭)

[আমি এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা, পিতামহ, যা কিছু জ্ঞেয় এবং পবিত্র বস্তু আমিই। আমি ব্রহ্মবাচক ওঙ্কার, আমিই ঋক, সাম ও যজুর্বেদ স্বরূপ।]
সুতরাং সেই পূর্ণ স্বরূপ পরব্রহ্মকেই আদর্শ করে ক্রমে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়ে যেতে হবে, বিভিন্ন শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণ এই পূর্ণতার প্রতি অগ্রসর হয়ে যাওয়ার সহায়ক মাত্র। তাই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র অন্যত্র বলেছেন, "আমরা কোন সাধুকে ঈশ্বরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অপরাধী হইতে পারি না। আমরা সর্বাগ্রে মাকে ভালবাসিয়াছি এবং মার কথাতেই তাঁর সাধু সন্তানদের সেবা করিয়াছি। যদি মা বলিয়া না দিতেন, যদি মা দেখাইয়া না দিতেন তাহা হইলে আমরা এসকল

সাধুদিগের নামও করিতাম না।" (১৮৮০, ২২শে আগষ্ট জগজ্জননী এবং তাঁর সাধু সন্তানগণ; সেবকের নিবেদন, ১ম ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৫) কেশবচন্দ্র এই সর্বাঙ্গিন স্বাধীনতা চেতনা তৎকালীন জাতীয় জীবনে কি ধরণের প্রভাব বিস্তার করেছিল তা বিশ্লেষণ করে বিখ্যাত স্বদেশী আন্দোলনের নেতা মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, "বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী যে স্বাধীনতা মন্ত্র সাধন করিয়া আসিয়াছে, বলিতে গেলে কেশবচন্দ্রই সেই মন্ত্রের প্রথম দীক্ষাগুরু। জাতীয় স্বাধীনতা জগতের সর্বত্রই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যেখানেই জাতীয় স্বাধীনতার প্রচেষ্ট হইয়াছে, সেখানেই তাহার গোড়ার একটা ধর্মের প্রেরণা জাগিয়াছে এবং সেই ধর্মের প্রেরণায় মানুষ আগে ভিতরের বাঁধন কাটিয়াছে, নিজের চিন্তা ও চিত্তকে বাহিরের বন্ধন মুক্ত করিয়াছে, পরিবারে ও সমাজে এই আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে গিয়াছে, এবং পরিণামে এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই নিজের রাষ্ট্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে।... এই দিক দিয়া ভারতের বিশেষতঃ বাংলার বর্তমান স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহার মূলে একরূপ প্রথম শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু রূপে কেশবচন্দ্র ও তাহার প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে দেখিতে পাই।" (বাংলার নবযুগের কথা, বঙ্গবাণী পত্রিকা, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ)

জীবনবেদের ষষ্ঠ অধ্যায় 'বিবেক' এ বিষয়ে কেশবচন্দ্র বলেছেন, '... কিন্তু 'আমি'র মধ্যে তুমি বলিয়া সম্বোধন করে, যাহা আমি নই, এমন একজনকে স্পষ্ট অনুভব করি, তাহার কথা শুনিয়াই ধর্মকার্য করিতে চাই। একজন যে ভিতরে কথা কয়, এই পরীক্ষিত সত্য বার বার অনুভূত হইয়াছে।... আমি ইহাকে ভূতের বাণী বলি না, ব্রহ্মবাণী বলি।... যতই যোগ সাধন করিলাম, মনোবিজ্ঞান আলোচনা করিলাম, মনের ভিতর ততই বুঝিলাম— জীবরূপ বাড়ী দোতলা নীচে জীব, উপরে ব্রহ্ম। জীব বৃক্ষে দুইটি পাখী, এক ছোট পাখী জীবাত্মা, আর এক বড় পাখী পরমাত্মা।... একটি বেদ বেদান্ত বলে, আর একটি মরণের কথা বলে। এক স্থূল রসনা আসার কথা বলে, আর সূক্ষ্ম রসনা 'হরি হরি' বলে।... শুভক্ষণে ব্রহ্মবাণী মানিয়াছি, তাই এতদিনে এত সঞ্চয় করিয়াছি।" (জীবনবেদ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়) শাস্ত্র নয়, তথাকথিত গুরুর উপদেশ নয়, কিন্তু অন্তরবাসী ঈশ্বরের আদেশই যে দেশাচার ও লোকাচারের উর্ধে মানুষের জীবনের নিয়ন্ত্রক, উপনিষদ ও গীতাদ এই মহান্ শিক্ষাকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রার্থনা পরায়ণতা ও বিবেক-বাণী সাধনার মধ্য দিয়ে নিজের জীবনে রূপায়িত করে তুলেছিলেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে, "এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট" (৪।১৭) [পরমেশ্বর বিশ্বকর্মা ও মহাত্মা, ইনি সকলের হৃদয়ে সর্বদা অবস্থান করছেন ।] মুণ্ডকোপনিষদে (৩।১।১) আছে, "দ্বা সুপর্না সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষ পরিষস্বজাতে ।" অর্থাৎ দুইটি সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করে আছেন। তাঁরা সর্বদা একত্রে থাকেন এবং উভয়ে পরস্পরের সখা। তাই কেশবচন্দ্র বলেছেন, 'জীব বৃক্ষে দুইটি পাখী, এক ছোট পাখী জীবাত্মা, আর বড় পাখী পরমাত্মা।" গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬১ নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঈশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। কেশবচন্দ্রের ধর্মপিতামহ রামমোহন তাঁর একটি সঙ্গীতে বলেছেন, "তোমাতে যে আত্মারূপে প্রকাশ, সেই ব্যপ্ত চরাচরে ।" কিন্তু অন্তরবাসী ঈশ্বরের আদেশ বা ব্রহ্মবাণী শুনতে হলে মনকে শুদ্ধ ও পবিত্র করে অন্য স্তরে নিয়ে যেতে হবে। কঠোপনিষদে আছে মনন ও সংশয় রহিত বুদ্ধি দ্বারা যে হৃদয় নির্মল হয়, তিনি তাতে প্রকাশিত হন। (২।৩।৯) তখন অন্তরে যে তাঁর আদেশ শোনা যায় সে সম্পর্কে ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞতং বিজ্ঞমিতি ॥" (৬।১।৩) অর্থাৎ আদেশ হল তাই যার দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়ে যায়, যার সম্বন্ধে ধারণা নাই তার সম্বন্ধে ধারণা হয়, যা অবিজ্ঞাত তা জ্ঞাত হয়। কেশবচন্দ্রের ধর্মপিতা মহর্ষি দেবন্দ্রনাথ গায়ত্রী মন্ত্রের সাধনার দ্বারা ব্রহ্মে মগ্ন হয়ে কি ভাবে ব্রহ্মবাণী শুনেছিলেন সে সম্পর্কে বলেছেন, "তাঁহার দর্শন পাইলাম, তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিলাম এবং একেবারে তাঁহার সঙ্গী হইয়া পড়িলাম। তিনি আমার হৃদয়ে আসীন হইয়া আমাকে চালাইতেছেন তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম।" আত্মচরিত; ১১শ পরিচ্ছদ) কেশবচন্দ্রের অনুগামী আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, "প্রার্থনা করিতে করিতে হৃদয়ে দুইটি পরিবর্তন দেখিতে পাইলাম। প্রথম দুর্বলতার মধ্যে বল আসিল।··· আমি ধর্মের আদেশ ও হৃদয়বাণী ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে চলিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।" (আত্মচরিত ; ৩য় সং ; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ; পৃ ২০৮) কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মবাণী শ্রবণ প্রসঙ্গে আচার্য শিবনাথ মন্তব্য করেছেন ; "In this he was a true follower of the Gayatri mantra of the Hindus, which says 'He propels our thought." (History of the Brahmo Samaj ; 2nd ed ; P. 270) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, "আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে আপনাকে ত্যাগ না করে, আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্র আছে— তিনি নিখিল মানবের

আত্মা।" (মানুষের ধর্ম, ১৯৬০ সং পৃ. ৮৯) কেশবচন্দ্রের ধর্মবন্ধু সাধকশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, "সেইদিন থেকে আর এক রকম হয়ে গেলুম। নিজের ভিতরে আর একজনকে দেখতে লাগলুম।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম ভাগ, ১৮৮৫, ২৬শে অক্টোবর) "শুদ্ধ মনে যা উঠবে, সে তাঁরই বাণী। শুদ্ধ মনও যা, শুদ্ধ বুদ্ধিও তা— শুদ্ধ আত্মাও তা।" (ঐ, ৪র্থ ভাগ, ১৮৮৩ ১লা জানুয়ারী)

জীবনবেদের সপ্তম অধ্যায় "ভক্তি সঞ্চার"। এ বিষয়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলেছেন, "এই জীবনে প্রথমে ভক্তি ছিল না, প্রেমের ভাবও অধিক ছিল না, অল্প অনুরাগ ছিল ; ছিল বিশ্বাস , ছিল বিবেক, ছিল বৈরাগ্য। তিনেরই প্রথম অক্ষর 'ব' স্মরণের পক্ষে সুযোগ। তিন লইয়া সাধক ধর্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল, ক্রমে আর যাহা যাহা প্রয়োজনীয় সমস্তই দেখা দিল।··· আমার যেমন হইয়াছে এইরূপ সকলেরই হয়।···প্রথমে কঠোর, পরে সুকোমল ; প্রথমে পিতা পরে মাতা। ব্রহ্মের প্রস্ফুটিত ভাব জীবনে দেখিলাম। আমার জীবনের সঙ্গে ব্রহ্ম খেলা করিতে লাগিলেন। আগে "ব্রহ্ম" নাম একটি নাম ছিল, বস্তুটি রূপান্তর হইয়া কত নামই ধরিল।" (জীবনবেদ, ৭ম অধ্যায়) ব্রাহ্মসমাজ ও কেশবচন্দ্রের জীবনে কিভাবে ভক্তিভাবের সঞ্চার ও ক্রম পরিণতি হল সে ইতিহাস না জানার ফলে অনেকেই 'জীবনবেদ'র এই অধ্যায় পাঠ করে নানা রকম ভুল সিদ্ধান্ত করেন।

আমাদের দেশের ধর্ম সাধনায় সাধারণতঃ জ্ঞানযোগ, রাজযোগ বা ধ্যানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযেগে, এই কয়েকটি সাধনমার্গের উল্লেখ দেখা যায়। এইগুলির মধ্যে ভক্তিযোগই সাধারণতঃ সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়। ভক্তি সম্পর্কে 'শাণ্ডিল্য সূত্রে' বলা হয়েছে "সা পরানুক্তিরীশ্বরে" অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি পরম অনুরক্তিই ভক্তি। ঈশ্বরের জন্য যে অসীম চির-অতৃপ্ত ও সুতীব্র আকুতি এবং বাসনা, যা কেবলমাত্র তাঁকেই চায় অন্য কিছুকে নয়, তাকেই ভক্তি বলে। ঐ সূত্রেই অন্যত্র বলা হয়েছে "স ঈশ্বরোনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ," অর্থাৎ ঈশ্বর অনির্বচনীয় প্রেম স্বরূপ। কিভাবে ভক্তির উদয় হয় সে সম্পর্কে 'শাণ্ডিল্য সূত্রে'ই (১।২) বলা হয়েছে, ভূতসমূহের উৎপত্তি বিনাশ গতি অগতি বিদ্যা অবিদ্যা যিনি অবগত আছেন তিনিই ভগবান। এটি সম্যক বোধগম্য হওয়ার ফলে তাঁর প্রতি আন্তরিক ভক্তির উদয় হয়। বিষ্ণু-পুরাণে (১।১০।১৯) প্রহ্লাদের উক্তিতেও ভক্তির একটি সুন্দর সংজ্ঞা পাওয়া যায় ; "বিবেকহীন ব্যক্তিদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সমূহের প্রতি যে রকম প্রগাঢ় প্রীতি, তোমার ব্যাকুল আমার এই হৃদয় থেকে সেরকম প্রীতি যেন কখনও দূর না হয়।" ভক্তির আবেদন ও আবেশ সহজেই আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে তাই ভক্তিযোগের

প্রতি সাধারণতঃ সকলেই আকৃষ্ট হয়। ঈশ্বরের প্রেমে গভীরভাবে মত্ত হয়ে নিত্য নূতন ভাবে তাঁর বিভিন্ন স্বরূপের মধ্যে মগ্ন হয়ে তাঁর সান্নিধ্য উপলব্ধি করে, ক্ষণে ক্ষণে তাঁকে নূতন করে আবিষ্কার করাই ভক্তি। অনন্ত প্রেম ও আনন্দ সাগরে ভাসতে ভাসতে ভক্ত যত নিত্য নূতনভাবে তাঁকে উপলব্ধি করেন তত তাঁর আনন্দ ও মত্ততা বেড়ে যায়। ভক্তির কয়েকটি লক্ষণ হল; **ঐকান্তিকী** অর্থাৎ ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন কিছুতেই আকর্ষণহীনতা; **সর্বসমর্পিতা** অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে অহং বোধ লোপ করে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের কাছে সমর্পণ করা; **অহৈতুকী** অর্থাৎ পার্থিব কোন কিছুতে দূরের কথা, ভক্ত স্বর্গ বা মুক্তি কোন কিছুই কামনা করেন না, তাঁর সান্নিধ্যই ভক্তের একমাত্র কামনার বিষয়।

ভক্তি সম্পর্কে ১৮৬৯ সালের ১৬ই জুলাই সঙ্গত সভার অধিবেশনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলেছেন, "যখনই তাঁহার করুণা ও প্রীতি মনে পড়ে তখনই ভক্তির উদয় হয়।··· সর্বদা তাহার মধুর ভাব স্মরণ করিয়া মনে যে স্থায়ী ভাব থাকে তাহাই প্রকৃত ভক্তি।··· প্রেম ও বিশ্বাস মিলিত হইয়া যে ভাব আনে যাহা পবিত্রতার সহিত সংযুক্ত তাহারই নাম ভক্তি।··· যখন এই ভক্তি ব্যাপ্ত ও প্রগাঢ় হয় তখন তাঁহার নামে ভক্তি হয়। প্রথমে যেমন তাঁহার করুণা, প্রেম, মহিমা প্রভৃতি গুণ সকল ধ্যান করিলে ভক্তি হয়, ইহার পরের অবস্থায় ক্রমাগত এইরূপ সাধন করিতে করিতে তাঁহার নাম শুনিবা মাত্র ভক্তি উদ্দীপন হইতে থাকে।" (সঙ্গত, ১ম ভাগ পৃঃ (২২-২৩) অন্যত্র কেশবচন্দ্র বলেছেন, "হৃদয়ের কোমল অনুরাগই ভক্তি।···ফলতঃ ভক্তি ভাব বিশেষ। সত্য, শিব, সুন্দর এই তিন গুণ উহার উদ্দাপক। ভক্তি এই তিন গুণ ভিন্ন আর কিছু চায় না।··· ভক্তি অবিকৃত কোথায়? সেইখানে যেখানে একজন পুরুষ, যিনি সত্য, মঙ্গল ও সুন্দর, তাঁহাতে উহা অর্পিত হইয়াছে। এই পুরুষ কিসে সুন্দর? মঙ্গল ও দয়াতে। সেই দয়া কাহার? যিনি একমাত্র সৎ পদার্থ তাঁহার।" (ব্রহ্মোগীতোপনিষৎ, ৬ষ্ঠ সং পৃঃ ১২)

বেদে 'ভক্তি' কথাটির উল্লেখ নেই, কিন্তু শ্রদ্ধার কথা (ঋগ্বেদ; ১০।১৫১।১) বলা হয়েছে, আরো বলা হয়েছে যে হৃদয়ের ব্যাকুলতাতেই এই শ্রদ্ধা লাভ করা যায় (ঋগ্বেদ; ১০ ১৫১।৪)। তাছাড়া ঈশ্বরকে পিতা (ঋগ্বেদ ১০।৮২।৩; যজুর্বেদ ৩৭।২০); বন্ধু ও সখা (শুক্ল যজুর্বেদ সং ৩২।১০; অথর্ববেদ সং ৯।১।২০); জ্যেষ্ঠভ্রাতা, কনিষ্ঠভ্রাতা এমন কি পুত্র (অথর্ববেদ সং ১০।৮।২৮) বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। অগ্নিতে আহুতি দিয়ে দেবতাকে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টার বাহ্যিক অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত আধ্যাত্মিক সাধনা এইভাবেই শুরু হয়েছিল।

এর মধ্যেই ভক্তির বীজ আছে। পরবর্তী কালে উপনিষদের যুগে একমাত্র শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে 'ভক্তি' কথাটির উল্লেখ আছে এবং ঐ অধ্যায়ের ১৮নং শ্লোকে বলা হয়েছে, যিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করে বেদ সকল প্রদান করেছেন, মুমুক্ষু হয়ে তাঁর শরণ নিতে। কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ২য় বল্লীর ৩নং শ্লোকে বলা হয়েছে, বেদ অধ্যয়ন বা মেধা দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না, তিনি যাঁকে বরণ করেন তিনিই তাঁকে লাভ করেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদের দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া বল্লীর পঞ্চকোষ তত্ত্বে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় কোষ অতিক্রম করে এক অখণ্ড আনন্দময় পরমাত্মার অনুভূতিতে মগ্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৫।৬) যাজ্ঞবল্ক্যের আত্মতত্ত্বে বলা হয়েছে আত্ম প্রেমই পতি, জায়া, পুত্র ইত্যাদির প্রতি প্রেমের উৎস এবং শ্রবণ, মনন ও নিধিধ্যাসনের সাহায্যে প্রেম স্বরূপ পরমাত্মাকে স্মরণ করার কথা বলা হয়েছে। এসবের মধ্যেই ভক্তির বীজ আছে। নানক, দাদু, কবীর প্রমুখ মধ্যযুগীয় সাধকগণ, সুফী সম্প্রদায় ও আউল বাউল, দরবেশ প্রমুখ সকলেরই মধ্যেই ভক্তির বিভিন্ন স্তরের স্ফুরণ দেখা যায়। তবে এঁরা সকলেই সাকারবাদ বা প্রতিমা পূজা থেকে মুক্ত ছিলেন।

আমাদের দেশে শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য এই সব সম্প্রদায় ভক্তিপন্থী হলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই প্রধান ভক্তিমার্গী সম্প্রদায় বলে প্রসিদ্ধ এবং ঐ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তি ধর্মের প্রধান প্রবর্তক বলে খ্যাত। সর্বভূতে ও সর্বজীবে হরিকে উপলব্ধি করে তাঁর প্রেমে মগ্ন হয়ে তাঁর গুণগানে মত্ত হয়ে নিজেকে তৃণের মত দীন মনে করা, যে মান পাওয়ার উপযুক্ত নয় তাকে মান দান করা ও সর্বজীবে দয়া বা প্রেম বিস্তার; এই হল শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি ধর্মের মর্মবাণী। বৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ে ও ১১শ স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, শুধু অর্চ্যমূর্তিকে অর্থাৎ প্রতিমাতে যিনি হরি পূজা করেন, তার চেয়ে যিনি সর্বভূতে হরিকে উপলব্ধি করে সকলের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন ও প্রেমবিস্তার করেন তিনিই উত্তম ভাগবত বা বৈষ্ণব। শ্রীচৈতন্যদেবও বলেছেন, প্রকৃত প্রেমের উদয় হলে ভক্ত সর্বভূতে তাঁর ইষ্টদেব বা উপাস্যকে দর্শন করেন, কোন বিশেষ স্থান বা বিগ্রহতে আবদ্ধ মনে করেন না (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত; মধ্যলীলা; ৮ম পরিচ্ছদ)। ভাগবতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই কয়েক প্রকার ভক্তির কথা বলা হয়েছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ৮ম পরিচ্ছদে রায় রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্যদেবের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ভক্তি সাধনার ঐ স্তরভেদ খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ঈশ্বরকে প্রিয়তমরূপে সর্বভূতে উপলব্ধি করে প্রগাঢ় প্রেমে মগ্ন হয়ে সর্বভূতে সমভাব, শান্ত ভক্তের লক্ষণ। উপনিষদের দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ঋষিগণ এই ভাবের সাধক। বুদ্ধদেব যদিও ঈশ্বর সম্পর্কে নীরব ছিলেন কিন্তু সর্বভূতে মৈত্রী ও 'ব্রহ্ম-বিহারের' কথা বলেছেন বলে তাঁকে শান্তভাবের সাধক বলা যায়। ঈশ্বরকে প্রভু ও নিজেকে দাস মনে করে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে তাঁর সেবায় নিজেকে সমর্পণ করা দাস্য ভক্তির উদাহরণ। ভক্ত তাঁর ঐশ্বর্য ও গৌরব উপলব্ধি করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে আপ্লুত হন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে এই ভাবের সাধক অনেক দেখা যায়। বৈষ্ণবদের মধ্যে উদ্ধব প্রমুখ এই ভাবের সাধক, রামায়ণে হনুমানকে এই ভাবের শ্রেষ্ঠ সাধক বলা যায়। হজরত মহম্মদ প্রমুখ মহাপুরুষগণ এই ভাবের সাধক। ঈশ্বরকে পরম বন্ধু বা সখা রূপে উপলব্ধি করে সর্বদা তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করে তাঁর সঙ্গে অনুরাগ মান-অভিমানের সম্পর্ক সখ্য ভক্তির লক্ষণ। বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রীদাম, সুদাম প্রমুখ সখ্য ভক্তির দৃষ্টান্ত। মধ্যযুগীয় সাধক সম্প্রদায়, কবি হাফেজ প্রমুখ সুফী সম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্দ এই ভাবের উচ্চ সাধক। বাৎসল্য ভক্তি সাধারণতঃ দুরকম, ঈশ্বরকে পিতা বা মাতা বলে স্নেহে প্রেমে ও শ্রদ্ধায় তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করা, দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরকে প্রিয় সন্তান রূপে স্নেহে আপ্লুত হয়ে তাঁর উপাসনা করা। আমাদের দেশে শৈব, শাক্ত প্রমুখ কিছু সম্প্রদায় প্রথম ভাবের বাৎসল্য ভক্তির উদাহরণ। যীশুখৃষ্টও অন্যান্য খৃষ্টান সাধক-সাধিকাবৃন্দ এই ভাবের সাধক। শ্রীরামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ সাধকবৃন্দকেও এই ভাবের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় রকমের বাৎসল্য ভাবের সাধনা বৈষ্ণবধর্ম ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ে বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু এই ভাবে ঈশ্বরের প্রতি মানবত্ব আরোপ (Anthropomorphism) করার সম্ভাবনা খুব বেশী, যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যশোদার হয়েছিল। সবশেষ স্তর হল ঈশ্বরকে পতি বা প্রিয়তম রূপে সাধনা অর্থাৎ মধুর বা কান্তা ভাব। রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে ম্যাডাম গেঁয়ো প্রমুখ কোন কোন সাধিকার মধ্যে এই ভাব দেখা যায়। মধুর ভাবের মধ্যে শান্ত, দাস্য সখ্য ইত্যাদি সব ভাব গুলিরই সংমিশ্রণ দেখা যায়। বৈষ্ণব ধর্মে ব্রজলীলার সাহায্যে এই মধুর বা কান্তা ভাবের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কিন্তু এমন সুন্দর সাধন পন্থা ক্রমে সাকারবাদ, অভ্রান্ত গুরুবাদ, অবতারবাদ প্রভৃতি মতবাদের আবর্তে পড়ে ভাবুকতা বা ভাববিশেষের চরিতার্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। প্রতীকোপাসনার অর্থ হল এমন কোন বস্তুর সাহায্যে ব্রহ্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করা যা ব্রহ্ম নয় অথচ অনেকাংশে ব্রহ্মের সন্নিহিত (ব্রহ্মসূত্র ৪।১।৫ ;

শ্রীরামানুজ ভাষ্য)। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৮শ খণ্ডের প্রথম শ্লোকে মন ও আকাশে ব্রহ্মের অধ্যায় করে(অর্থাৎ ব্রহ্মভাব আরোপ করে) উপাসনার কথা বলা হয়েছে। এই হল প্রতীকের সাহায্যে উপাসনা। আবার কুলার্ণব তন্ত্রের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৭২ নং শ্লোকে এবং মহানির্বাণ তন্ত্রের ৪র্থ উল্লাসের ১২ নং শ্লোকে বলা হয়েছে সাধকের হিতার্থে অর্থাৎ দুর্বল সাধকের ধারণার জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হয়েছে বা ব্রহ্ম উপলব্ধি উত্তম অবস্থা, স্তুতি ও জপ অধম অবস্থা মূর্তি পূজা বা বাহ্য পূজা অধমের থেকেও অধম। অর্থাৎ সাধনায় কিছুটা অগ্রসর হলে প্রতিমা পূজা বা বাহ্য পূজার প্রয়োজন নাই। গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ২২ নং শ্লোকে বলা হয়েছে ; "যে জ্ঞানদ্বারা কোন একটি দেহে বা প্রতিমাতে সম্পূর্ণ আত্মা বা ঈশ্বর আছেন,—এই অভিনিবেশ হয় সেই অযৌক্তিক, অযথার্থ তুচ্ছ জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞান বলে।" (গীতা ; স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ; উদ্বোধন প্রকাশিত ; ১৩৮৭ সং) কিন্তু দুঃখের বিষয় যদিও বৈষ্ণবদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ ভাগবতে (৩।২৯ ২০-২৫) বলা হয়েছে সাধক যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈশ্বরকে সর্বভূতে এবং স্বীয় হৃদয়ে উপলব্ধি করতে না পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিমা বা অর্চা পূজা করতে পারেন ; কিন্তু সর্ব-জীবে ও সর্বভূতে তাঁকে উপলব্ধি করতে না পারলে প্রতিমা পূজা নিরর্থক এবং শ্রীচৈতন্যদেবও বলেছেন প্রকৃত ভক্ত তাঁর উপাস্যকে সর্বভূতে উপলব্ধি করেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ; মধ্যলীলা ; ৮ম পরিচ্ছদ) ;—বর্তমানে শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্ম-ধারী শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ এবং বৃন্দাবনের ননীচোরা কৃষ্ণই তাঁদের উপাস্য এবং প্রতিমাকে ব্রহ্মত্ব আরোপের বদলে তাঁরা মানবত্ব আরোপ করেন। (বিগ্রহে ভোগ নিবেদনে, স্নান করানো, শয্যায় শোয়ানো ইত্যাদি) যে ব্রজলীলা জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্ক বোঝানোর একটি উৎকৃষ্ট রূপক তা সাকার কৃষ্ণের নরলীলায় রূপক নয় আক্ষরিক অর্থে সত্য বলে বিবেচিত। এর কুফল সম্পর্কে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচিত "কৃষ্ণ-চরিত" গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৭ম পরিচ্ছদে আলোচনা করেছেন। একজন আধুনিক গবেষকও আক্ষেপ করে বলেছেন ; "এই বিপদজনক রাধা-কৃষ্ণ কাহিনী যার উপর সমগ্র ভক্তিতত্ত্বের ভিত্তি, তা প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয় না কিন্তু সত্য বলে গণ্য করা হয়…এ কখনো রূপক হিসাবে গণ্য করা হয় না।" (শ্রীসুশীলকুমার দে রচিত Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal গ্রন্থে পৃঃ ৪১৭-১৯)।

অন্যান্য ভক্তিমার্গী সম্প্রদায় সম্পর্কেও এ কথা সত্য। মার্কেণ্ডেয় চণ্ডী অনুযায়ী যে চিন্ময়ী পরমা শক্তি সর্বভূতে চেতনা, শক্তি ও মাতৃরূপে অবস্থিত (শ্রীশ্রীচণ্ডী ;

৫ম অধ্যায় ; ১৯, ৩৪, ৭৩) বা শ্রীরামপ্রসাদ প্রমুখ ভক্ত শাক্ত সাধকের কাছে "মা বিরাজে সর্ব ঘটে", "তারা আমার নিরাকারা" অথবা "মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে" এই রূপে প্রতিভাত সাধারণ শিক্ষিত জনতার দ্বারা তিনিই পৌরাণিক শিবের পত্নী বা হিমালয়-মেনকার কন্যা পার্বতী, উমা দুর্গা বা কালী রূপে চতুর্ভুজা বা দশভুজা প্রতিমাতে পূজিত হন। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী তিনি তিনদিনের জন্য শিবধাম কৈলাশ পর্বত থেকে কার্তিক-গণেশ, লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রভৃতি পুত্র কন্যাসহ বঙ্গদেশে পূজা নিতে আসেন ও তিনদিন পরে আবার সেখানে ফিরে যান। (শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত আদ্যাশক্তির সঙ্গে ঐ কাহিনীর কোন সম্পর্ক নাই।) সুললিত আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতে, কলা-বৌ স্নান করানো প্রতিমা বরণ ও বিসর্জনের সময় সিঁদুর খেলা, ভোগ নিবেদন ইত্যাদির সাহায্যে প্রতিমাতে মানবত্ব আরোপ করা হয়— কারণ ঐ পৌরাণিক কাহিনীকে সত্য বলে গণ্য করা হয়, ব্রহ্ম বা চিন্ময়ী পরমাশক্তিকে উপলব্ধি করার সোপান হিসাবে প্রতিমাকে গণ্য করা হয় না। শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায় সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কেশবচন্দ্রের ধর্মপিতামহ রামমোহন বলেছেন, "পূর্বে যে সকল অধিকারী দুর্বল ছিলেন তাঁহারা মনস্থিরের নিমিত্ত যে কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিতেন সেই রূপকে পরব্রহ্ম প্রাপ্তির কেবল উপায় জানিতেন ··· পরন্তু সেই কাল্পনিক রূপকে বিভু ও নিত্যধামবাসী করিয়া জানা ইহা অল্পকাল পরম্পরা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে····" (রামমোহন গ্রন্থাবলী, গোস্বামীর সহিত বিচার) এর অনেক পরে নব-বেদান্ত আন্দোলনের নেতা স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন, "···কিন্তু আমাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বইজন সারাজীবন প্রতীকোপাসনাতেই লাগিয়া থাকে।···এই সকল প্রতাক উপাসনায় ইহাই বড় বিপদ। লোকে মুখে বলিবে যে এগুলি সোপান মাত্র—এই সকল সোপানের মধ্য দিয়া তাহারা অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু বৃদ্ধ হইলেও দেখা যায়—তাহারা সেই সকল সোপান অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে।" (ভক্তি-রহস্য ; ১৩ শ সং ; ১৯৮২ পৃঃ ৫২)

অন্যত্র বিবেকানন্দ বলেছেন—"এই প্রকার প্রতিমা পূজাতে সাধক সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বস্তুতে আত্মসমর্পণ করে, সুতরাং মূর্তি বা কবর, মন্দির বা স্মৃতি-স্তম্ভের এইরূপ ব্যবহারই প্রকৃত পুতুল পূজা।" (ভক্তিযোগ ; উদ্বোধন প্রকাশিত ; ২২শ সংখ্যা ; পৃঃ ৩৯)

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ১৮৮১ সালের ৩রা জুলাই "ভয় ও প্রেম" এই উপদেশে বলেছেন, "ভূমা মহান্ বিরাট ঈশ্বরকে সঙ্কীর্ণ করিয়া কোন একটি পুতুল কিম্বা

একটি বৃক্ষে প্রতিষ্ঠিত মনে করাই পৌত্তলিকতা। কিন্তু হরিময় জগৎ ইহা স্বীকার করিলে আর পৌত্তলিকতার ভয় থাকে না।" (সেবকের নিবেদন; ৩য় খণ্ড; পৃঃ ২১৪-২১৫) কেশবচন্দ্রের ধর্মপিতামহ রামমোহন প্রধানতঃ জ্ঞানমার্গী হলেও পারিবারিক বৈষ্ণব প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত ছিলেন না। তাঁর ব্রহ্মোপাসনা পুস্তিকাতে পরমেশ্বরে নিষ্ঠার লক্ষণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে তাঁকে "সমুদয় সৌভাগ্যের কারণ জানিয়া সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক তাঁহার নানাবিধ সৃষ্টি রূপ লক্ষণের দ্বারা তাঁহার চিরন্তন করা এবং তাঁকে ফলাফল ও শুভাশুভের নিয়ন্তা জেনে সর্বদা তাঁর সমীহা করা।" ভক্তি না বলে রামমোহন এখানে শ্রদ্ধা ও প্রীতির কথা বলেছেন। একে ঐশ্বর্যমূলা দাস্য ভক্তির বীজ বলা যেতে পারে। কেশবচন্দ্রের ধর্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দাস্য ও সখ্য ভক্তি শান্ত ভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ১৮৪৯ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুগামী মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু ফরাসী ভক্ত ফেনেলোঁর একটি স্তোত্র অনুবাদ করেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাতে কিছু যোগ করে ১১ই মাঘ উপাসনার পর ভাবগম্ভীর স্বরে পাঠ করেন। তারপর দেখা গেল "অনেক ব্রাহ্ম ভাবে মগ্ন হইয়া অশ্রুপাত করিতেছেন।" (মহর্ষির আত্মচরিত; ২৫ অধ্যায়।) এই দিন থেকেই জ্ঞান প্রধান ব্রাহ্মধর্মে কিছুটা ভক্তিভাব সঞ্চারিত হয়েছিল।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ (পরে আদি ব্রাহ্মসমাজ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেশবচন্দ্র যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংগঠিত করলেন তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে কেশবচন্দ্রও তাঁর অনুগামীগণ অন্তরে অত্যন্ত শুষ্কতা (spiritual barrenness) অনুভব করতে লাগলেন। কেশবচন্দ্রের ভাষায়, "মরুভূমির বালি উড়িতে লাগিল, কতদিন এরূপ চলিবে? তখন বুঝিলাম এ তো ঠিক নয়, অনেকদিন এই রূপে কাটান গেল, আর চলে না।" (জীবনবেদ, ৭ম অধ্যায়) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে এ কথা জানানো হলে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের তেতলার ঘরে একদিন সকলকে আহ্বান করলেন। তাঁরা সকলে সমবেত হলে, তাঁরা তখনও ব্রহ্ম দর্শন করেন নি, একথা শুনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আশ্চর্য হলেন এবং বল্লেন যদিও ব্রহ্মদর্শন বিনা ব্রাহ্ম হওয়া যায় না তবু যাঁরা ব্রহ্মদর্শন করার জন্য ব্যাকুল, তাঁরাও ব্রাহ্ম; "বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, তিনি হাতখানি প্রসারিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই তো চারি দিকে ব্রহ্ম···একটি দীপ দেখাইয়া বলিলেন, এই দীপটি যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি তিনি আমার কাছে প্রত্যক্ষ।" (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ; অজিতকুমার চক্রবর্তী, ১৯১৬ সং, পৃ. ৪১৮) তাঁর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মোপলব্ধির কথা শুনে তাঁরা নূতন করে উৎসাহিত বোধ

করলেন। এর কিছু পরেই (১৮৬৭ সালের সেপ্টেম্বর) ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁর কলুটোলার বাড়ীতে তাঁর অনুরাগীদের নিয়ে নূতন পদ্ধতিতে দৈনিক উপাসনা আরম্ভ করলেন। সংস্কৃতের পরিবর্তে মাতৃভাষায় হৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুলতা উজাড় করে ঈশ্বরকে নিবেদন করে তাঁর কাছে সব কিছু সোঁপে দেওয়া, এই ভাব উপাসনার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠলো। যদিও আরাধনার মন্ত্র সংস্কৃতই (বিভিন্ন উপনিষদ থেকে চয়ন করা) রইল ; কিন্তু উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা এবং নিবেদন এ সবই মাতৃভাষায় অন্তরের ব্যাকুলতা থেকে করা হতে লাগলো এবং তাঁকে সামনে উপলব্ধি করে তাঁকে সম্বোধন করে উপাসনা করা হতে লাগলো। এভাবে প্রতিদিন তিন থেকে চার ঘণ্টা ধরে উপাসনা হোত। ক্রমে সকলেই একটা পরিবর্তন অনুভব করলেন, উপাসনার ভাব ও ভাষা পরিবর্তন হয়ে বিনয় ও প্রেমে বিগলিত হয়ে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণের ভাবটি প্রবল হয়ে উঠলো ; সকলেরই অন্তর প্রেম ও ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে গেল। তাই কেশবচন্দ্র বলেছেন, "ভক্তির ভাব দেখা যাইতে না যাইতে, কি রূপে ও গুপ্তভাবে একজন ভিতর হইতে রসনাকে ভক্তের ঠাকুরের দিকে টানিলেন। পরিবর্তন হইল বুঝিলাম— যাহা না থাকে, তাহাও পাওয়া যায়।" (জীবনবেদ, ৭ম অধ্যায়) শ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণবধর্মের প্রতি সকলেই আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন, যদিও তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণবরা অপাংক্তেয় ছিলেন এবং কীর্ত্তনকে সকলে অশ্লীল মনে করতেন। কেশবচন্দ্রের অন্তরঙ্গদের মধ্যে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের সহযোগী অদ্বৈত গোস্বামীর বংশধর। তাঁর দাদার মুখে কীর্ত্তন শুনে বৈষ্ণব বংশোদ্ভব কেশবচন্দ্রের মনে হল ঐ সুরে ও ভাবে একেশ্বরবাদমূলক কীর্তনের প্রচলন করলে তা নব ভক্তিভাবের সহায়ক হবে। তার নির্দেশে বিজয়কৃষ্ণ কয়েকটি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসংকীর্ত্তন রচনা করলেন এবং খোল, করতাল ও একতারা সহযোগে সেগুলো সুন্দরভাবে গাওয়া হলো।

১৮৬৭ সালের ২৪শে নভেম্বর প্রথম দিনব্যাপী ব্রহ্মোৎসবের আয়োজন করা হল। এই উৎসব ভোর ৪টে থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত সংকীর্তন, সঙ্গীত, উপাসনা, প্রার্থনা, ধ্যান ইত্যাদির মাধ্যমে পালন করা হল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যদিও বৈষ্ণবভাবের পক্ষপাতি ছিলেন না, তবু কেশবচন্দ্রের আহ্বানে তিনিও এসে এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন এবং সান্ধ্য উপাসনা তিনিই করেছিলেন। ব্রহ্মে ভক্তি ও সেই উপলক্ষে উৎসব এদেশে নূতন ব্যাপার। এ নিয়ে 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকায় নানা·রকম সমালোচনা হল এবং ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে বৈষ্ণবদের মত "নেড়া-নেড়ী"র দলে পরিণত হতে চলেছে এমন আশংকাও প্রকাশ করা হল। কিন্তু

কেশবচন্দ্র এ সবে ভ্রূক্ষেপ না করে ব্রহ্মোৎসব করে যেতে লাগলেন। ক্রমে এই উৎসব উপলক্ষে খোল-করতাল সহ নগর-সংকীর্তন প্রচলিত হল। শ্রদ্ধেয় খগেন্দ্র নাথ মিত্র তাঁর রচিত "কীর্তন" গ্রন্থে বলেছেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রই উনবিংশ শতাব্দীতে নগর কীর্তনকে শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে প্রথম আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। ১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কেশবচন্দ্র নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে একটি ভাষণে বললেন, "চৈতন্য যে মুক্তির সহজ উপায় ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়াছেন আমরাও সেই পথ অবলম্বন করি।" (আচার্যের উপদেশ ; ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮) সভায় সমবেত বৈষ্ণবগণ ভাষণান্তে মুগ্ধ হয়ে অশ্রুপাত করেছিলেন। ঐ বছরেই মুঙ্গেরে ভক্তিভাব এমন প্রবলভাব ধারণ করেছিল যে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে অনেকে অপরের চরণ ধরে ক্রন্দন, কেশবচন্দ্রের চরণ ধরে প্রার্থনা, কীর্তনের সময় অচেতন হয়ে পড়া ইত্যাদি আরম্ভ করলেন। এ থেকেই 'নর পূজা'র আন্দোলন হয়েছিল এবং কেশবচন্দ্রের উপর প্রায় অবতারবাদের ছায়া পড়বার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও যদুনাথ চক্রবর্তীর তীব্র প্রতিবাদ ও স্বয়ং কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টায় এই উচ্ছ্বাসের আতিশয্য দূর হয়ে এর সুফল ক্রমে ফুটে উঠলো।

কেশবচন্দ্র বলেছেন, "আমার জীবনের সঙ্গে ব্রহ্ম খেলা করিতে লাগিলেন। আগে 'ব্রহ্ম' একটি নাম ছিল ; বস্তুটি রূপান্তরিত হইয়া কত নামই ধরিল।" (জীবনবেদ ; ৭ম অধ্যায়) ১৮৮১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর "যিনি ব্রহ্ম তিনিই হরি" এই উপদেশে কেশবচন্দ্র বলেছেন, "দেহধারী রূপধারী, চঞ্চলস্বভাব, মানবচরিত্র বিশিষ্ট হরিকে তো আমরা মানি না, পূজা করি না। কিন্তু যথার্থ হরিকে মানি। যিনি 'হরিওঁ' তাঁহাকে মানি।···ব্রহ্মই হরি, তিনিই মা, লীলাকর্তা ও লীলাকর্ত্রী। আমরা বেদান্তের ব্রহ্মকেই হরি বলি। নতুবা 'ওঁ' কারের সঙ্গে হরি কেন ?" (সেবকের নিবেদন ; ৪র্থ খণ্ড ; পৃঃ ৪৪-৪৫)। শ্রীরামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রমুখ আমাদের দেশের সাধক ও ভক্তগণ চিন্ময়ী পরমাশক্তিকে মাতৃরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই শ্রীরামপ্রসাদ চরম উপলব্ধির পর গেয়ে উঠেছিলেন, "মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে" কারণ তাঁর মতে "মা বিরাজে সর্বঘটে," সাধক কমলাকান্তও বলেছিলেন "এক ব্রহ্মে দ্বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাজী," শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন "এই সব ভাবের পর বললুম, মা এসবে বিচ্ছেদ আছে। যার বিচ্ছেদ নাই, এমন অবস্থা করে দাও। তাই কতদিন 'অখণ্ড সচ্চিদানন্দ' এই ভাবে রইলুম। ঠাকুরদের ছবি ঘর থেকে বার করে দিলুম।

তাঁকে সর্বভূতে দর্শন করতে লাগলুম। পূজা উঠে গেল।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ; ২য় ভাগ ; ১৮৮৪, ২৭শে ডিসেম্বর)।

"কেবল পিতাকে ডাকিতাম ; মার অন্তপুরের দ্বার তখন খোলা হয় নাই। কেহ বলিয়াও দেয় নাই, কোন পথে গেলে মাকে দেখা যায়।...অবশেষে মাতৃ মন্দির স্থাপন করিলাম, কি রূপে আশ্চর্য।" (জীবনবেদ ; ৭ম অধ্যায়) কেশবচন্দ্রের ধর্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের শান্তভাবের সাধক হলেও ব্রহ্মকে মাতৃরূপে উপলব্ধি করেছিলেন ; "যেন আবরণ ভেদ করিয়া অনন্ত ঈশ্বর আমাকে দেখা দিলেন, যবনিকার এক পার্শ্ব হইতে মাতার প্রসন্ন বদন দেখিতে পাইলাম।" (আত্মজীবনী ; পরিশিষ্ট ৬) "তাঁহার দৃষ্টি মাতৃস্নেহের ন্যায়। মাতৃস্নেহের ন্যায় সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টি সকল জগৎকে সিক্ত রাখিয়াছে ;" (ব্রাহ্মধর্মের ৫ম ব্যাখান) ; "তিনি আমাদিগকে সর্বদাই আপন ক্রোড়ে, আহ্বান করিতেছেন ; আমরা সেই মাতৃস্নেহের আহ্বান শ্রবণ করি না।" (ব্রাহ্মধর্মের ৯ম ব্যাখ্যান)। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ঈশ্বরানুভূতিতে প্রথমে পিতৃভাবের সঙ্গে মাতৃভাবও ছিল ; "তুমি আমাদের পিতামাতা, তুমিই আমাদের সুহৃদ।" (১৮৬২ সালের, ২রা জানুয়ারীর উপদেশ) ; "ঈশ্বর যে পরিবারে পিতামাতা, সে পরিবার ক্রমে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে।" (১৮৬৫ সালের ২৩শে জানুয়ারীর উপদেশ)। ক্রমে মধুর হরিনামের মত মাতৃভাবও কেশবচন্দ্রের অন্তরে প্রতিভাত হল। ১৮৭০ সালের একটি উপদেশে তিনি বলেছেন, "ভক্ত সন্তান একবার মাতৃ-ক্রোড়ে স্থান পাইল, অমনই শান্তি, তৃপ্তি লাভ করিল।...তিনি সেই পরম মাতার নিকট যতই মনের কথা বলেন ততই পরিতৃপ্ত হন এবং যতই পরিতৃপ্ত হন ততই আরও তৃপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন।" (আচার্যের উপদেশ ; ১ম খণ্ড ; পৃঃ ২১২)। ১৮৭২ সালের ২৭শে জানুয়ারী ব্রাহ্মিকাদের প্রতি উপদেশে বলেছেন, "যাদের মা আনন্দময়ী তাদের কেন নিরানন্দ। তোমরা এমন স্নেহময়ী মাতার ঘরের কাছে থাকিয়া কেন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাও।" (আচার্যের উপদেশ, ৩য় খণ্ড ; পৃঃ ৫৩) ১৮৭৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারীর উপদেশে বলেছেন, 'জননীর ইচ্ছা এই যে আমরা সুখী হই... " (ঐ ; ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৯) ১৮৭৪ সালের ১লা মার্চ, "স্বর্গীয় সম্বন্ধের সৌন্দর্য" উপদেশে বলেছেন, "ঈশ্বরের সঙ্গে যে মা সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে, তাহার কি সামান্য সৌভাগ্য ? (ঐ ; ৫ম খণ্ড ; পৃঃ ২০১), ১৮৭৫ সালের, ২৪শে জানুয়ারী "ঈশ্বর ভিখারী" এই উপদেশে বলেছেন ; "মা হয়ে শিখাইয়া দিচ্ছ বৎস! বল, মা, তোর এই ভক্তিজল ফুরাইবে না।" (ঐ ; ৬ষ্ঠ খণ্ড ; পৃঃ ১২৪-২৫) ঐ বৎসরেই ২৫শে জানুয়ারী "জগজ্জননীকে উপদেশে" বলেছেন, "মাকে যদি

তোমরা না দেখিলে তবে যে তোমরা মাতৃহীন।...তাঁহাকে চিনিয়া, তাঁর অঞ্চল ধরিয়া অনন্তকাল তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া সুখী হইতে পারিবে।" (ঐ; পৃঃ ১৩৪-৩৫) ব্রহ্মের এই চিন্ময়ী মাতৃরূপ সম্পর্কে কেশবচন্দ্র ১৮৮০ সালের ৮ই আগষ্টের উপদেশে বলেছেন, "অনন্ত ব্রহ্ম অনন্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। ক্ষুদ্র কি বৃহৎ কোন আকারে তাঁহাকে তুমি বদ্ধ করিতে পার না।...আমরা ঈশ্বরের কোমল প্রেমের জন্য তাঁহাকে মা বলি বটে। কিন্তু যাঁহাকে আমরা মা বলিতেছি, তিনি অসীম আকাশে পরিব্যাপ্ত। আমাদের মা কি ক্ষুদ্র মা?" (সেবকের নিবেদন, ১ম ও ২য় খণ্ড; পৃঃ ৭৯) তাই কেশবচন্দ্রের মতে "যখন মা আমাদের বন্ধু হইলেন, তাঁহার সঙ্গে আমরা তাঁহার সমুদয় ভক্ত সন্তানদিগকে পাইলাম।... আজ শাক্যের মা, মৈত্রেয়ীর মা, ঈশার মা, মহম্মদের মা, শ্রীগৌরাঙ্গের মা'কে আমরা মা বলিয়া ডাকিলাম।" (১৮৮১ সালের ২৬শে জানুয়ারী "ঈশ্বরের সখ্যভাব" উপদেশ: সেবকের নিবেদন; ৩য় খণ্ড; পৃঃ ৪০) বড়ই আশ্চর্য ও বিস্ময়ের বিষয় যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে হরি ও মাতৃরূপে উপলব্ধি করে ভক্তি রসে মগ্ন হচ্ছিলেন (১৮৬৭ থেকে ১৮৭৫ সাল) ঠিক সেই সময় (১৮৭৫ সালের ১৫ই মার্চ) পরম ভক্ত ও মাতৃভাবের সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে তাঁর প্রথম যোগাযোগ হয় এবং তাঁরা দুজনে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ হন। এ সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের একজন প্রধান অনুগামী উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় বলেছেন, "পরমহংস ও কেশবচন্দ্রের মিলন এক শুভ সংযোগ। এ সংযোগ দুইদিন পরে বা দুইদিন পূর্বে কখন সম্ভবপর ছিল না। কেশবচন্দ্রে যখন যেভাবের উদয়, তখনই তাহার অনুরূপ আয়োজন স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রে যখন ভক্তির সঞ্চার হয়, তখন ভক্তি উদ্দীপনের জন্য যে সকল আয়োজন, সে সকল এক এক করিয়া আসিয়া জুটিয়াছিল। কেশবচন্দ্র বিধাতার আনীত উপায় সকলের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন; ...যোগ, বৈরাগ্যাচরণ, ও মাতৃভাব কেশবচন্দ্রের মনকে আসিয়া অধিকার করিয়াছে, এ সময়ে এই সমুদয় ভাবের পরিপোষক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত; সুতরাং কেশবচন্দ্র বুঝিলেন কে তাঁহাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। একদিনে সম্বন্ধ এমন গাঢ় হইয়া গেল যে এ সম্বন্ধ আর কোনদিন বিনষ্ট হইবে, তাহার পন্থা থাকিল না।" (আচার্য কেশবচন্দ্র; শতবার্ষিকী সং; ২য় খণ্ড; পৃঃ ১০৪৩)

তাঁর আর একজন অনুগামী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল (চিরঞ্জীব শর্মা, যাঁর কণ্ঠে সুললিত ব্রহ্মসঙ্গীত শুনতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব খুব ভালবাসতেন) বলেছেন, "কেশবচন্দ্র

যেমন বর্তমান সময়ে শিক্ষিত ধর্মপিপাসু নব্যদলের সহিত ঈশা মুসা গৌর শাক্য সক্রেটিস মহম্মদের পরিচয় করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহাদের মনে সাধুভক্তির সঞ্চার করিয়াছেন, তেমনি পরমহংসকে তিনিই বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের নিকট ডাকিয়া আনিয়াছেন।" (কেশবচরিত্র; ৩য়; পৃঃ ২৪৭) জীবন-বেদের পরবর্তী অধ্যায়ে (৮ম অধ্যায়; লজ্জা ও ভয়) ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলেছেন, কিভাবে ক্রমে জগজ্জননীর সংস্পর্শে এসে তিনি ক্রমে সঙ্কোচ অতিক্রম করে ভক্তি ও বিশ্বাসে 'নির্লজ্জ ও সাহসী' হয়ে উঠলেন তা বর্ণনা করেছেন।

'জীবন-বেদে'র পরবর্তী অধ্যায় 'যোগের সঞ্চার' (৯ম অধ্যায়)। এ সম্পর্কে কেশবচন্দ্র বলেছেন: "ভক্তি যখন বাড়িতে লাগিল তখন বুঝিলাম—ভক্তিকে স্থায়ী করিবার জন্য যোগ আবশ্যক।...ঈশ্বরে যদি বিশ্বাস থাকে, তবে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হওয়া আবশ্যক। দুই থাকিবে কেন? হৃদয় যেমন ভক্তের হৃদয়, নয়নটা তেমনি যোগীর নয়ন হইবে। ভক্তি ও যোগ উভয়ের প্রতিই আমার দৃষ্টি পড়িল; সাধনে প্রয়াস জন্মিল মনে হইল— ভক্তি, যোগ ব্যতীত ব্রাহ্ম জীবন কোন কার্যের নয়।" (জাবনবেদ; ৯ম অধ্যায়) স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন, "যে চরিত্রে জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ সমন্বিত হইয়াছে, সেই চরিত্রই সর্বাপেক্ষা মহৎ।...জ্ঞান ও ভক্তি দুইটি পক্ষ, সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য যোগ ইহার পুচ্ছ।" (ভক্তিযোগ; ২২ম সং উদ্বোধন কার্যালয়; পৃঃ ৮) যোগ-সাধন আমাদের দেশে একটি ধরনের সাধনা যার একটি বিশেষত্ব ও গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে। অবশ্য এর বিকৃতিও আছে যথেষ্ট। নানা রকম গুপ্ত বিদ্যা, ভেল্কিবাজী ইত্যাদি এর আধ্যাত্মিক দিকটি বিকৃত করেছে। এ বিষয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন; "ভারতবর্ষে নানা কারণে ইহা এমন সব লোকের হাতে পড়ে যাহারা এই বিদ্যার শতকরা নব্বই ভাগ নষ্ট করিয়া বাকী অংশটুকু অতি গোপনে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল।...এই সব যোগ প্রণালীতে গুহ্য ও অদ্ভুত যাহা কিছু আছে, তাহা বর্জন করিতে হইবে। যাহা কিছু বলপ্রদ তাহাই অনুসরণীয়।" (রাজযোগ; উদ্বোধন কার্য্যালয় ১৭ম সং; পৃঃ ১২-১৩)।

১৮৮৩ সালে আমেরিকার বুদ্ধিজীবী ও ধর্মতত্ত্ববিদদের মনে ভারতবর্ষের যোগ-সাধনা সম্পর্কে বেশ কিছু আগ্রহ ও কৌতূহলের সঞ্চার হওয়ায় ওখানকার তৎকালিন বিখ্যাত সংবাদপত্র "নিউইয়র্ক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট"এর সম্পাদক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কাছ থেকে এ বিষয় কিছু জানতে চান। তখন কেশবচন্দ্র যোগের আধ্যাত্মিক দিক সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে ওদের পাঠিয়েছিলেন এবং ঐ বছরের অক্টোবর মাসের কয়েকটি সংখ্যায় ঐ পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ও তাঁদের কৌতূহল

অনেকটা তৃপ্ত করেছিল। পরের বছর ঐ প্রবন্ধটি "yoga Objective and Subjective" নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধের প্রথমদিকে কেশবচন্দ্র বলেছেন, "যোগ হিন্দুর ধর্মজীবনের একটি বিশেষ দিক উদ্ঘাটিত করে এবং এটি প্রাচ্য ধর্ম বিশ্বাসের এমন একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব যা পাশ্চাত্য কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের বিশ্বাস ও সাধন পদ্ধতির সঙ্গে মেলে না।...খৃষ্টীয় যুক্তিবাদীর কাছে এটা অখৃষ্টীয় জনিত বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। হিন্দু যোগ সাধনার সঙ্গে যে ভ্রম ও অলৌকিকতা ইত্যাদি মিশ্রিত আছে তা কেউই অস্বীকার করেন না।... কিন্তু বিচ্যুতি বা ত্রুটি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।...যাঁরা প্রাচীন ও মহান্ হিন্দু-জাতির ধর্মজীবনের প্রতি সুবিচার করতে চান, তাঁদের ভাসা ভাসা ভাবে কোন ধারণা না করে বাইরের খোলস ভেদ করে ভিতরে দৃষ্টিপাত করে মূলভাব বা নীতিকে গ্রহণ করতে হবে।" (yoga; Objective and Subjective 6th ed P. 1.)

আমাদের দেশে সাধারণত এই কয়েকটি যোগ প্রচলিত আছে ; (১) তান্ত্রিক যোগ, (২) পতঞ্জলি যোগসূত্র বা যোগ দর্শন ; (৩) উপনিষদ ও গীতার অধ্যাত্ম যোগ। তান্ত্রিক যোগের মতে কুলকুণ্ডলিনী নামে শক্তি মানুষের দেহের সবচেয়ে নীচে মূলাধার চক্রে নিদ্রিত সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে নত মুখে থাকে। ত্রিভুজাকৃতি এই চক্র চার পাপড়ি বিশিষ্ট সোনার পদ্মরূপে কল্পিত। মূলাধার চক্রের ঠিক উপরে স্বাধিষ্ঠান-চক্র, ছয় পাপড়ি বিশিষ্ট আগুনের মত উজ্জ্বল পদ্ম। তার উপরে নাভির বিপরীত দিকে আছে মণিপুর চক্র ; দশ পাপড়ি বিশিষ্ট পদ্ম, তাতে নানা মাণিক্যের জ্যোতি আছে। এর উপরে হৃদয়ে আছে দ্বাদশ পাপড়ি বিশিষ্ট অনাহত চক্র। এর উপরে আছে ষোড়শ পাপড়ি বিশিষ্ট বিশুদ্ধ চক্র বা আকাশ চক্র। আরো উপরে দুই ভ্রূর মাঝখানে আছে আজ্ঞা চক্র। এই হল ষটচক্র; প্রাণায়াম ও ধ্যানের সাহায্যে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে, তার কুণ্ডলাভাব মুক্ত করে, ঊর্দ্ধমুখী করে একের পর এক চক্রকে ভেদ করে ক্রমে তাকে আজ্ঞা চক্রে নিয়ে আসতে হয়, এই হল তান্ত্রিক যোগ সাধনার উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, সমস্তটাই রূপক, মনকে ক্রমে ক্রমে উন্নত স্তরে নিয়ে আসাই এর উদ্দেশ্য। প্রাণায়াম একটি প্রক্রিয়া, এতে নিশ্বাসের বায়ু গ্রহণ ও বর্জন করতে হয়। মেরুদণ্ডের দুই পাশে ইড়া ও পিঙ্গলা দুই নাড়ী কল্পনা করা হয়, এ ছাড়া সুষুম্না নাড়ী মূলাধার থেকে মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। ইড়া দিয়ে বায়ু গ্রহণ, পিঙ্গলা দিয়ে বর্জন ও সুষুম্নায় ধারণ করতে হয়। প্রাণায়ামের এই প্রক্রিয়াকে যথাক্রমে পূরক, কুম্ভক ও

রেচক বলে। ১৮৮১ সালের ১৬ই অক্টোবর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র "তীর্থ-চতুষ্টয়" নামক উপদেশে মনকে ক্রমে স্তরে স্তরে উন্নত করার কথা বলেছেন (সেবকের নিবেদন : ৪র্থ খণ্ড ; পৃঃ ৮২)। তবে তিনি দু'টি স্তরের না বলে চারটি স্তরের কথা বলেছেন। (বিখ্যাত কবি শেলী তাঁর বিখ্যাত নাট্যকাব্য "প্রমেথিয়াস্ আনবাউণ্ড" এর চতুর্থ অংকের শেষের দিকে ডেমোগর্গনের উক্তিতে মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে কুণ্ডলী পাকানো সাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যা সুপ্রবৃত্তির দ্বারা চাপা আছে।) কিন্তু দুঃখের বিষয় বিভিন্ন চক্রকে বিশেষ বিশেষ দেব দেবীর অধিষ্ঠান হিসাবে গ্রহণ করায় এবং প্রাণায়াম প্রভৃতি বহিরঙ্গ সাধনের উপর (নাটকের সাহায্যে ধ্যান ইত্যাদি) অতিরিক্ত জোর দেওয়ার ফলে, রূপক ভুলে গিয়ে সাধক আধ্যাত্মিকতা থেকে বিচ্যুত হয়ে যান।

পতঞ্জলির যোগসূত্র বা যোগদর্শন অষ্টাঙ্গ যোগ নামে প্রসিদ্ধ, কারণ এতে আটটি অঙ্গ আছে ; যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। (১) অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি বা বলপূর্বক অন্যের দ্রব্য গ্রহণ না করা), ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ (কষ্টের সময়েও কাহারও দান গ্রহণ না করে স্বাবলম্বী ও বৈরাগী হওয়া), এগুলোকে বলে যম। (২) শৌচ অর্থাৎ স্নান, হস্ত-পদ-প্রক্ষালন দ্বারা শরীরকে পরিষ্কার রাখা রূপ বাহ্য শৌচ এবং সৎ চিন্তা দ্বারা চিত্তকে প্রসন্ন ও নির্মল রাখা তথা সর্বজীবের সুখে সুখী, দুঃখে করুণা, পূণ্যে আনন্দ ও পাপে উপেক্ষা এই ভাবে সর্বদা মনকে পূর্ণ করে রাখা অন্তঃশৌচ। (পতঞ্জলের যোগসূত্র ; সমাধিপাক ; ১৩)। সন্তোষ—যথা লাভে তৃপ্ত থাকা। তপস্যা—দেহ ও মনের সংযম। স্বাধ্যায়—কোন মন্ত্রজপ বা বেদাদি অধ্যয়ন। ঈশ্বর প্রণিধান—ঈশ্বরের স্মরণ ও মনন,—এই সবগুলিকে নিয়ম বলে। (৩) আসন—যে ভাবে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে বসে থাকা যায়, তাকেই আসন বলে। পতঞ্জলের যোগসূত্রের সাধন পাদের ৫৬ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, 'স্থিরসুখাসনং।' (৪) প্রাণায়াম সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে, এটা নিতান্তই বহিরঙ্গ সাধন। (৫) প্রত্যাহার—ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বহির্বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলোকে জোর করে ফিরিয়ে আনার নাম প্রত্যাহার। (৬) কোন একটি বিশেষভাব বা আদর্শতে চিত্তকে আবদ্ধ রাখার নাম ধারণা। যা ধারণা করা হয় সে দিকে চিত্তকে এক ভাবে অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মত প্রবাহিত হতে দেওয়ার নাম (৭) ধ্যান। ধ্যানের খুব গভীর অবস্থাই, যখন ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছুর অনুভূতি হয় না তাকে সমাধি (৮) বলে। নিয়মের বাহ্যশৌচ, স্বাধ্যায়, আসন ও প্রাণায়াম ছাড়া এই যোগের অন্য সব অঙ্গগুলিই আধ্যাত্মিক ও সকল সাধনার ভিত্তি স্বরূপ। প্রাণায়ামকে একটি

অঙ্গ হিসাবে গণ্য করলেও পতঞ্জলি প্রাণায়ামের উপর বিশেষ ঝোঁক (emhasis) দেন নি, একে চিত্তবৃত্তি নিরোধের অন্যান্য পদ্ধতির মত একটি পদ্ধতি মাত্র বলে উল্লেখ করেছেন। পতঞ্জলের এই অষ্টাঙ্গ যোগের শেষ চারটি অর্থাৎ প্রত্যাহার, ধ্যান ও সমাধি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে সাধকপ্রবর শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ীর গুরুদেব শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ ক্রিয়াযোগ শিক্ষা দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ তাঁর "রাজযোগ" পতঞ্জলীর যোগসূত্রের উপর ভিত্তি করেই উপস্থাপনা করেছেন এবং বহিরঙ্গ সাধন (প্রাণায়াম) গ্রহণ করলেও আধ্যাত্মিকতার উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। 'রাজযোগ' নামটি তিনি সম্ভবতঃ গীতার নবম অধ্যায় 'রাজ গুহ্যযোগ' বা 'রাজবিদ্যা' বলে পরিচিত, তা থেকে নিয়েছেন। বিবেকানন্দের মতে সাধনার প্রথম সোপান হল ; "শরীরকে সোজাভাবে রাখিয়া উপবেশন কর। সর্ব প্রথমে জগতে পবিত্র চিন্তার একটি স্রোত প্রবাহিত করিয়া দাও। মনে মনে বল 'জগতে সকলে সুখী হউক, সকলেই শান্তি লাভ করুক।'…যতই এ রূপ করিবে, ততই তুমি নিজে ভালবোধ করিবে।…অপর সকলে সুখী হউক এরূপ চিন্তাই নিজেকে সুখী করিবার উপায়।" (রাজযোগ ; উদ্বোধন কার্যালয় ; ১৭ম সং ; পৃঃ ২৭) বুদ্ধদেবের (যাঁর সম্পর্কে বিবেকানন্দ যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন) 'মেত্তি ভাবনা'র সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সাধনার প্রথম সোপান হিসাবে এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে অন্যকোন বহিরঙ্গ সাধনের (প্রণায়াম বা নাটকের সাহায্যে ধ্যান প্রভৃতি) প্রয়োজন হয় না।

"অধ্যাত্মযোগ" কথাটি কঠোপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে ; "যাঁকে সহজে দেখা যায় না, মূঢ় প্রতি বিষয়ান্তরে প্রবিষ্ট, হৃদয়ে অবস্থিত ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম জ্ঞান মাত্র গ্রাহ্যস্থানে অবস্থিত পুরাতন দেবতাকে অধ্যাত্মযোগ ঘাটত জ্ঞান দ্বারা জেনে জ্ঞানী ব্যক্তি হর্ষ শোকের অতীত হন।" (কঠ ২।১২) আবার ৬ষ্ঠ বল্লীর ১২ নং শ্লোকে বলা হয়েছে ;

"তাং যোগমিতিমন্যন্তে স্থিরাম্রিয়ধারণাম্।"

[সেই স্থির ইন্দ্রিয় ধারণাকে যোগ বলে।] ৪র্থ বল্লীর ১১ নং শ্লোকে বলা হয়েছে মনের দ্বারাই তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এ কথাও বলা হয়েছে "যে দুষ্কার্য থেকে বিরত নয়, ইন্দ্রিয় লোলুপতার জন্য যার মনে শান্তি নেই, আকাংখা বশতঃ যার মন সদা অশান্ত সে ব্যক্তি কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা দ্বারা আমাকে লাভ করতে পারে না," (কঠ ; ২।২৪) তাই ৬ষ্ঠ বল্লীর ৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে "হৃদয়ের সংশয় রহিত বুদ্ধির দ্বারাই ইনি প্রকাশিত হন, যাঁরা তাঁকে এভাবে

জানেন তাঁরা অমর হন ;" মুণ্ডকোপনিষদে (৩।১।৮) বলা হয়েছে "জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ সত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যান যুক্ত হয়ে নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।" হৃদয়ের সংশয়-রহিত বুদ্ধি বা জ্ঞান দ্বারা শুদ্ধ সত্ত্ব লাভ করতে হলে যোগ-সাধককে শান্ত, দান্ত, (মুক্তমন), উপরত (নর্মুক্ত), তিতিক্ষু (দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু), সমাহিত, এই ছয়টি অবস্থা (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২৩) অর্জন করতে হয়। কি ভাবে তা অর্জন করা যায়, এ সম্পর্কে কঠোপনিষদে (২।১-২) বলা হয়েছে "শ্রেয় অর্থাৎ পরিণামে মঙ্গলজনক এবং প্রেয় বা আপাত সুখকর এই উভয়, জীবকে নানাভাবে আবদ্ধ করে। বিচক্ষণ ব্যক্তি সম্যক আলোচনা করে শ্রেয়কে উত্তম জেনে শ্রেয়কে গ্রহণ করেন আর অল্প বুদ্ধি ব্যক্তি প্রেয়কে গ্রহণ করে।" আরো বলা হয়েছে "আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে লাগাম রূপে ধারণা করে সমাহিতমনা ও বিবেকী হয়ে উত্তম সারথির অশ্বের মত ইন্দ্রিয় সমূহকে বশে রাখতে হবে" (৩।৩।৬১)। এও বলা হয়েছে যে "প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনে সংযত করবেন, মনকে বুদ্ধিতে সংযত করবেন, বুদ্ধিকে জীবাত্মায় সংযত করবেন এবং জীবাত্মাকে শান্ত, বিকারশূন্য পরমাত্মাকে সংযত করবেন।" (৩।১২) মুণ্ডকোপনিষদে (২।২।৪) ওঁ-কারকে ধনু-স্বরূপ, জীবাত্মাকে শর-স্বরূপ ও ব্রহ্মকে লক্ষ্য স্বরূপ ধারণা করে, প্রণব ধনুর সাহায্যে জীবাত্মা শরদ্বারা পরব্রহ্ম লক্ষ্যকে বিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ২য় অধ্যায়ের ৮ম থেকে ১৫ দশ শ্লোকে অধ্যাত্ম যোগের বিভিন্ন পর্য্যায় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে আসন সম্পর্কে বলা হয়েছে কি রকম স্থানে আসন গ্রহণ করলে শরীর ও মন সাধনার অনুকূল হবে। পরে ওঁ-কার ভেলার দ্বারা সংসার সমুদ্রের স্রোতে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং ইন্দ্রিয় ও মনকে হৃদয়ে সন্নিবেশিত করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পরে প্রাণ বায়ুকে সংযত করে মনস্থির করার কথা উল্লেখ করে, সাধনার কয়েকটি স্তরের কথা বলে শেষের দুটি শ্লোকে বলা হয়েছে "যেমন মৃত্তিকা দ্বারা মলিন ধাতুখণ্ড উত্তমরূপে ধৌত করলে আবার উজ্জ্বল দেখায়, তেমনি আত্মতত্ত্ব দর্শন করে যোগী কৃতার্থ হন এবং সাধক আত্মতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করে কৃতার্থ হন।" অন্যান্য উপনিষদেও বলা হয়েছে ব্রহ্মলাভ করতে হলে ব্রহ্মস্বরূপের নিকটবর্তী হতে হবে অর্থাৎ পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে হবে, তখনই তাঁর সঙ্গে পূর্ণ যোগ সম্ভব।

গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১৬-১৭ নং শ্লোকে বলা হয়েছে "যিনি অত্যধিক আহার করেন বা একান্ত অনাহারী তাঁর যোগ হয় না; বেশি নিদ্রালু বা অতি জাগরণশীলেরও যোগ হয় না। সব বিষয়ে যিনি পরিমিত থাকেন,

তাঁর যোগ দুঃখ নিবর্তক হয়।" ৫ম অধ্যায়ের ২৩-২৫ নং শ্লোকে বলা হয়েছে "যিনি এই সংসারে মরণের পূর্ব পর্যন্ত কাম, ক্রোধ, ইত্যাদি প্রতিরোধ করতে পারেন তিনিই যোগী; যাঁর অন্তরে সুখ, অন্তরেই আরাম ও শান্তি, অন্তরে যিনি আলোক লাভ করেন, সেই যোগী ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মেই নির্বাণ লাভ করেন। যাঁরা নিষ্পাপ, সংশয় শূন্য, সংযত চিত্ত, সর্বভূত হিতে রত, সেই ঋষিরা ব্রহ্ম নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।" ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ২৯-৩২ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, "এই রূপে যোগযুক্ত পুরুষ সর্বত্র সমদর্শী হয়ে আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করেন। যিনি আমাকে সর্বভূতে অবস্থিত দেখেন এবং আমাতে সর্বভূত অবস্থিত দেখেন, আমি তাঁর অদৃশ্য হই না তিনিও আমার অদৃশ্য হন না। যে যোগী সমস্ত বুদ্ধি অবলম্বন করে সর্বভূতে ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করে সর্বভূত স্থিত আমাকে ভজনা করেন, তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থান করেন। হে অর্জুন, সুখই হোক আর দুঃখই হোক, যে ব্যক্তি আত্ম সাদৃশ্যে সর্বত্র সমদর্শী সেই যোগীই সর্বশ্রেষ্ঠ।" এ কথা শুনে অর্জুন বলেছিলেন মন অত্যন্ত চঞ্চল মন নিয়ে এই সমত্ব ভাব আয়ত্ব করা কঠিন। তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের জবানীতে গীতাকার বলেছেন; "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।" (৬।৩৫) অর্থাৎ হে কৌন্তেয় অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়। গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ে সর্বভূতে ভগবদ্ভাব বা ব্রহ্ম উপলব্ধির কথা নানাভাবে ('ব্রহ্মভাব', 'ব্রাহ্মীস্থিতি', সাম্যবুদ্ধি', 'স্থিতপ্রজ্ঞ' ইত্যাদি) বলা হয়েছে। যদিও ৫ম অধ্যায়ের ২৭-২৮ নং শ্লোকে বহিরঙ্গ সাধন সম্পর্কে বলা হয়েছে, "বাহ্য বিষয় মন থেকে বের করে দুটি ভ্রূ-যুগলের মধ্যে স্থির করে, নাসিকার মধ্যে বিচরণ-শীল প্রাণ ও অপান বায়ুর উর্ধ ও অধোগতি রোধ করে এবং ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযম পূর্বক ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধশূন্য হয়ে যে মুনি সর্বদা বিরাজ করেন তিনি জীবন্মুক্ত", তবু আধ্যাত্মিক দিকের উপরই বেশী emphasis দেওয়া হয়েছে বিশেষতঃ ১৮শ অধ্যায়ে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এসব যোগেরই আধ্যাত্মিক দিক অবলম্বন করে নূতন করে যুগোপযোগী ভাবে যোগ সাধনা ব্যাখ্যা ও সাধন করেছেন। Yoga Objective and Subjective পুস্তিকায় তিনি বলেছেন, "The created Soul in its worldly and sinful condition, lives seperate and estre-nged from the supreme soul. A reconciliation is needed; nay more then mere reconciliation. A harmonious union is

sought and realiged. This union with Deity, is the real secret of Hindu yoga. It is a spiritual unification; it is consciousness of two in one; duality in unity. To the philosophical and thoughtful Hindu this is the highest heaven. He pants for no other salvation; he seeks no other mukti or deliverance (P. 1) এর মধ্যে ভক্তি ও যোগের সমন্বয়ের ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। কেশবচন্দ্র আরো বলেছেন; "We see in the earliest or Vedic period communion with God in Nature; this is the Objective Yoga. Then we have in the Vedantic period communion with God in the soul, this is subjective yoga. Thirdly, in the Puranic period we find communion with God in History or with the God of providence; this is Bhakti or Bhakti Yoga." (P. 1)

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন; "ঈশ্বরের এই যে প্রকাশ, উপনিষদ ইহাকে তিন ভাগ করিয়া দেখিয়াছেন। একটি প্রকাশ জগতে, আর একটি প্রকাশ মানব সমাজে, আর একটি প্রকাশ মানবাত্মায়। একটি শান্তং, একটি শিবং, একটি অদ্বৈতং।" (ধর্ম, ১৩১০ পৃঃ ১০১) অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহ চন্দ্র তারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ।" (মানুষের ধর্ম; ১৯৬০, পৃঃ ৮৯) এই Subjective বা Vedantic যোগের মধ্যেই কেশবচন্দ্র বিভিন্ন যোগের আধ্যাত্মিক দিকের সমন্বয় করেছেন। ১৮৭০ সালে (বাংলা কার্তিক মাসে) "আত্মা ও পরমাত্মার যোগ" উপদেশে কেশবচন্দ্র বলেছেন, "জীবাত্মা উপযুক্ত সাধন দ্বারা পরমাত্মাতে বদ্ধমূল হইয়া, তাঁহার প্রসাদবারি সিঞ্চনে আপনার পুষ্টিসাধন করেন এবং অনন্তকাল বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। ইহাই যথার্থ যোগ, অনুষ্ঠানাদি বাহ্যিক ধর্ম ইহার ফল মাত্র। এই যোগ সাধন করিতে পারিলে জীবন সার্থক হয়।...যোগ ভিন্ন ঈশ্বরকে অনন্তকালের জন্য লাভ করা যায় না। ইন্দ্রিয় দ্বারা যেমন বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপন হয়, আত্মার সঙ্গে সেইরূপ কতকগুলি আধ্যাত্মিক বৃত্তি দ্বারা ঈশ্বরের যোগ হয়।" (আচার্যের উপদেশ; ২য় খণ্ড: পৃঃ ২৭) ১৮৭২ সালের ১২ই মে "যোগী ব্রাহ্ম" উপদেশে বলেছেন, "যিনি যোগী তিনি ব্রাহ্ম।

ঈশ্বরের সঙ্গে যাঁহার যোগ নাই, তিনি কখনই ব্রাহ্ম পরিগণিত হইতে পারেন না। কতকগুলি সত্যে শুদ্ধ বিশ্বাস থাকিলে, কিম্বা পরোপকার করিলে ব্রাহ্ম হওয়া যায় না। কিন্তু যাঁহার আত্মা ব্রহ্মযোগে যোগী তিনিই যথার্থ ব্রাহ্ম।" (আচার্যের উপদেশ; ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪৪) ১৮৭২ সালে বেলঘরিয়া উদ্যানে, কেশবচন্দ্র 'সাধন কানন' প্রতিষ্ঠা করেন, সেই উদ্যানে ১৮৭৬ সালে, ভারতাশ্রমে উপাসনার পর তাঁর অনুগামীদের মধ্যে সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত যোগ শিক্ষার্থী, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ ভক্তি শিক্ষার্থী, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় জ্ঞান শিক্ষার্থী রূপে মনোনীত হলেন। পরে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ও শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত সেবা শিক্ষার্থী (কর্মসাধক) রূপে মনোনীত হন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র স্বয়ং প্রত্যেককে যোগ, ভক্তি ও সেবা সম্পর্কে উপদেশ দিতেন; এই উপদেশ দেওয়ার আগে প্রাতঃকালে উপাসনার মাধ্যমে কেশবচন্দ্র নিজেকে ঈশ্বর চরণে আত্মনিবেদন করে অন্তরে যে আলোক পেতেন সেই অনুযায়ী উপদেশ দিতেন। বিকেল ৩টের সময় উপদেশ দেওয়া আরম্ভ হতো ও উপদেশের শেষে প্রার্থনা ও সংকীর্তন হতো। কেশবচন্দ্রের নির্দেশে উপাধ্যায় গৌর-গোবিন্দ রায় হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করে ভক্তি শিক্ষার্থীর জন্য সতেরোটি ও যোগ শিক্ষার্থীর জন্য ষোলটি সংযম বিধি সংস্কৃতে রচনা করেছিলেন এবং তাঁরা ঐ পদ্ধতি অনুযায়ী সাধন করতেন। শিক্ষার্থীদের উপর ভার ছিল হিন্দু শাস্ত্রের সাহায্যে নিজ নিজ পন্থার ব্যাখ্যা করা। পনের দিন এইভাবে সাধন করার পর কেশবচন্দ্র তাঁদের প্রত্যেকের জন্য নিত্য পালনীয় ও মাসিক পালনীয় কয়েকটি সাধন নির্দিষ্ট করে দেন। কিন্তু এভাবে সাধন-ভজনের ফলে যাতে অভ্রান্ত গুরুবাদ তাঁদের মধ্যে প্রবেশ না করে সে বিষয়ে কেশবচন্দ্র সতর্ক ছিলেন, তাই প্রথম দিন (১৮৭৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী) "যোগ ও ভক্তি শিক্ষার্থীকে ব্রতদান" উপদেশে তিনি বলেছেন "আমিও ব্রত গ্রহণ করিলাম, আমিও তোমাদের নিকট শিক্ষা করিব। শিক্ষা করিয়া শিক্ষা দিব, শিক্ষা দিয়া শিক্ষা করিব। এই প্রকার ধর্মজ্ঞান-বিনিময়ের ভিতরে বসিয়া, এই ধর্ম ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছি।" (ব্রহ্মগীতোপনিষৎ; ৬ষ্ঠ সং, পৃ: ৯) কেশবচন্দ্রের এই উপদেশ যে গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছিল তাকে তিনি 'গীতা' ও 'উপনিষদে'র সমন্বয়ে "ব্রহ্মগীতোপনিষৎ" নাম দিয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র বলেছেন, "যোগ শব্দের অভিধানের অর্থ, দুই স্বতন্ত্র স্থানে স্থিত পদার্থের একত্র মিলন। দুয়ের একত্র মিলন যোগ।—এই যোগ দ্বারা বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের মিলন হয়। —উপাসনা সময়ে যে সামীপ্য অনুভূত হয়, তাহাই যত্ন দ্বারা অন্য সময়েও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। —জ্ঞান, ভাব এবং কার্যে আমাদের ঈশ্বর হইতে যে দূরতা, উহাই এই রূপ সাধন

দ্বারা নিরস্ত হয়। এই রূপে ক্রমে সর্ববিষয়ে দূরত্ব চলিয়া গিয়া ঈশ্বর এবং জীবাত্মার একত্ব উপস্থিত হয়, এই একত্ব বা মিলনই যোগ। এই রূপে যাহার ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলন, হইয়াছে, তাহাকেই যোগী বলা যায়।" (ব্রহ্মোগীতোপনিষৎ; ৬ষ্ঠ সং; পৃঃ ১৫-১৬) প্রাণায়াম প্রভৃতি বহিরঙ্গ সাধনের উপর কেশবচন্দ্র বিশেষ গুরুত্ব দেন নি, মন সংযম সম্পর্কে তিনি বলেছেন; বুদ্ধি স্থির করিয়া মনঃসংযোগ কর। মনকে স্থির করিবার পক্ষে দুইটি শত্রু। প্রথম; অন্য চিন্তা, দ্বিতীয়; পাপ চিন্তা;··· সংকল্প বহির্ভূত চিন্তা আসিবামাত্র তাহাকে দূর করিয়া দিবে।··· অন্য চিন্তা আসিবামাত্র আত্মা গম্ভীরভাবে 'দূরহ' শব্দ উচ্চারণ করিবে। ইহার সুফল দেখিয়া তোমরা অবাক হইবে। একথা উচ্চারণে সরলতা ও গাম্ভীর্য চাই। সরল গম্ভীর ভাবে এ কথা উচ্চারণ করিলে দেখিতে পাইবে, এ কথার মধ্যে বল আছে। এই বিধি সর্বদা স্মরণ রাখিও যখনই কোন বিরুদ্ধ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখনি 'দূর হ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উহাকে দূর করিয়া দিবে।···আহার স্নানাদি নিয়মকে সংযম বলে না, কঠোর ব্রতাদির দ্বারা প্রিয় ইন্দ্রিয় হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত রাখা সংযম।" (ঐ; পৃঃ ২৩-২৭) তিনি আরো বলেছেন; যোগবলে সূক্ষ্ম জগতে যাইতে হইবে, সেখানে সব পূর্ণ দেখিতে পাইবে। সমুদয় শোনিত সমুদয় নিশ্বাস ভিতরে টান। প্রকৃত যোগশাস্ত্রের অর্থ সাধনের দ্বারা মনের গতিকে, জীবনের গতিকে ফিরাইয়া ভিতরে লইয়া যাওয়া, চক্ষু কর্ণাদির ভিতরে গতি।··· সেখানে মনোরূপ সরোবরে ব্রহ্মচন্দ্র দেখা যায়, অস্থির করে নিশ্বাসবায়ু, তাই তাহার প্রতিমা পড়ে না। বায়ু রুদ্ধ হইলে মনস্থির হইবে। প্রশ্বাস বিষয়ের উচ্ছ্বাস। বিষয়ের উচ্ছ্বাস অবরোধ করিলে মন স্থির হয়, বাহিরের শ্বাসাবরোধ নহে।" ঐ; পৃঃ ৬০-৬১) কেশবচন্দ্রের এই উক্তি কঠোপনিষদের ৩।১২ শ্লোক ও গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৫ নং শ্লোকে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যীশুখৃষ্টকে একজন শ্রেষ্ঠ যোগী বলে মনে করতেন। ১৮৮০ সালের ২৮শে নভেম্বর "ইচ্ছাযোগ" উপদেশে তিনি বলেছেন; "হিন্দু কিম্বা অন্যান্য যে ধর্মে যোগের তত্ত্ব আছে তাহাতেই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যের কথা আছে।··· খৃষ্ট ধর্মের মূলেও দেখিতে পাই 'আমি ও আমার পিতা একই।' হিন্দু ও খৃষ্ট ধর্ম আপাততঃ লোকের নিকট বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। একটি ধ্যানের ধর্ম আর একটি কর্মের ধর্ম। এদেশের ঋষি ধ্যানশীল। ঈশা ও তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে কর্মের প্রাদুর্ভাব। কিন্তু কি আশ্চর্য! দুই-এর ভিতরেই ঈশ্বরের সঙ্গে এক হওয়ার কথা। দুইএতেই যোগের লক্ষণ দেখা যায়। দুইএতেই জীব ও পরমাত্মার ঐক্য, দুইএতেই পরমাত্মাতে

জীবের লয়। হিন্দু ঋষি ও নীতিপরায়ণ সাধুশ্রেষ্ঠ ঈশা এ দুই-এর সাধনের আরম্ভে ভিন্নতা, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঐক্য ও সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়।...যতক্ষণ সাধনের অবস্থা শ্রবণ, মনন ও নিধিধ্যাসনের অবস্থা, ততক্ষণ ঋষি জীব ও পরমাত্মার ভিন্নতা বুঝিতে পারেন, কিন্তু চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকিতে থাকিতে যখন সমাধি উপস্থিত হয়, তখন পরমাত্মাও নাই, জীবাত্মাও নাই, বোধহয় সকলই একাকার, নিরাকার, অকূল জ্ঞানসমুদ্রে জীবাত্মা বিলীন।...জ্ঞানেতে, শক্তিতে প্রেমেতে আনন্দেতে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের অভেদ হইয়া গেল। এ অবস্থা অতি গভীর ও নিগূঢ়।...ঈশার ধর্মও মূলে যোগের ধর্ম। কিন্তু হিন্দু ঋষিদিগের যোগ হইতে এ যোগ স্বতন্ত্র। এ যোগ ইচ্ছাযোগ, কর্তৃত্ব যোগ। অন্তরে এক ইচ্ছা, ইচ্ছাতে ইচ্ছা বিলীন. এখানে স্বেচ্ছার বিনাশ। ইচ্ছাযোগ কি না স্বেচ্ছার সংহার, স্বইচ্ছাকে বিদায় দিয়া ব্রহ্মের ইচ্ছাতে জীবের ইচ্ছা বিলীন করা। যেমন আত্মা ধ্যানের সময় পরমাত্মাতে নিমগ্ন হয়; তেমনি কার্যেতে ক্ষুদ্র ইচ্ছা পরমাত্মার ইচ্ছাতে বিলীন হয়।" (সেবকের নিবেদন ; ১ম ও ২য় খণ্ড, ; পৃঃ ২৩৭-২৩৯)

পরবর্তী কালে শ্রীঅরবিন্দের 'পূর্ণযোগ' এর সঙ্গে কেশবচন্দ্রের অধ্যাত্ম যোগের যথেষ্ট ভাব গত সাদৃশ্য দেখা যায়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ; "আসন, প্রাণায়াম, কুম্ভক, চিত্তশুদ্ধি বা অন্য কোন প্রাথমিক সাধনার প্রয়োজন হয় না, যদি সাধক দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে সাধনা আরম্ভ করেন।" (yogasadhan ; P. 1) শ্রীঅরবিন্দ আরো বলেছেন, "এই যোগের সাধনা কোন বিশেষ মানসিক শিক্ষা বা বাঁধাধরা পদ্ধতির ধ্যান, মন্ত্র উচ্চারণ বা অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না ; কিন্তু আকাংখা, অন্তরে বাইরে আত্ম সংযম, আমাদের উর্ধে পবিত্র শক্তির কর্মপদ্ধতির নিকট আত্মাকে মেলে ধরা, হৃদয়ের পবিত্র সত্তার কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে দেওয়া এবং এসবের প্রতিকূল যা কিছু আছে তাকে পরিহার করার উপর নির্ভর করে। কেবলমাত্র বিশ্বাস, আকাংখা এবং আত্মসমর্পনের দ্বারাই নিজেকে উন্মুক্ত করে দেওয়া সম্ভব।" (Light on yoga ; 9thed. P. 1) আর একটু ব্যাখ্যা করে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ; "যোগের প্রথম প্রক্রিয়া হল আত্মসমর্পনের সংকল্প গ্রহণ করা। তোমার হৃদয় ও শক্তির সবটাই ঈশ্বরের হাতে সঁপে দাও। পরবর্তী প্রক্রিয়া হল নিস্পৃহভাবে নিজের মধ্যে পবিত্র শক্তির ক্রিয়া লক্ষ্য করে যাওয়া। প্রায়ই নানা রকম বিঘ্নের ফলে এই ক্রিয়া উপলব্ধি করতে বাধার সম্মুখীন হতে হয় ; তাই বিশ্বাসের প্রয়োজন। যদিও নানা রকম প্রকাশ্য ও গোপন অপূর্ণতার জন্য পরিপূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করা সব সময় সম্ভব হয় না...কিন্তু যখন সন্দেহ মনকে আবৃত করে তখন নিস্পৃহভাবে তা চলে

যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর…আত্মসমর্পনের যৌগিক নীতির উপর পূর্ণ আস্থা রেখো।…যোগের তৃতীয় প্রক্রিয়া হল সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বরের সত্ত্বা উপলব্ধি করা… কিন্তু সর্বোচ্চ উপলব্ধি হল যখন সমগ্র বিশ্ব যে এক অনন্ত পবিত্র ব্যক্তি-সত্বার লীলার প্রকাশ এ সম্পর্কে সচেতন হওয়া।" (The yoga and its objects , 1968 ; P. 7-12) শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ-এ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই মন্ত্র ; "Complete self-surrender to the Divine Mother".

'জীবন-বেদে'র পরবর্তী সাতটি অধ্যায় যথাক্রমে 'আশ্চর্যগণিত', "জয়লাভ" 'বিয়োগ ও সংযোগ', "বিবিধ ভাব," 'জাতি নির্ণয়', 'শিষ্য প্রকৃতি' ও 'অনৃত খণ্ডন'। দ্বাদশ অধ্যায় 'বিয়োগ ও সংযোগ' সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে যে 'জীবন-বেদের' মর্মবাণী ঐ অধ্যায়ে পরিস্ফুট হয়েছে। 'আশ্চর্য গণিত' ও জয়লাভ' এই দুই অধ্যায়ে যথাক্রমে বলা হয়েছে যে পার্থিব হিসাব নিকাশের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জগতের অঙ্ক মেলে না এবং সব কিছু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ভক্ত জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা জয়যুক্ত হয়। ত্রয়োদশ অধ্যায় 'ত্রিবিধ ভাবে' কেশবচন্দ্র বলেছেন "তিন প্রকৃতি এই জীবনে বিরাজ করিতেছে। তিন প্রকার স্বভাবের সমন্বয় হইয়াছে।…একটি বালক, একটি উন্মাদ আর একটি মাতাল।" চতুর্দ্দশ অধ্যায় 'জাতি নির্ণয়ে' বলেছেন ; "অনেক অনুসন্ধানে এবং পঁচিশ বছরের সূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, আত্মা দরিদ্র জাতীয়।" পঞ্চদশ অধ্যায় 'শিষ্য-প্রকৃতি'তে তিনি বলেছেন ; "এই পৃথিবী ব্রহ্মবিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে যতদিন থাকিত হইবে, ধর্মোপার্জন ও জ্ঞান চর্চা করিয়া ব্রহ্মকে লাভ করিব।…শিষ্য হইয়া আসিলাম, শিষ্যের জীবন ধারণ করিতেছি, শিষ্যই থাকিব অনন্তকাল।…কত গুরুর নিকট হইতেই সত্য শিখিতেছি। আকাশ-গুরু, পাখীগুরু মৎস্যগুরু সকল গুরুর নিকটেই শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছি।" ষোড়শ অধ্যায় 'অনৃত খণ্ডনে' কেশবচন্দ্র, যাঁরা তাঁকে ভুল বুঝে তাঁর সম্পর্কে নানা রকম মন্তব্য করেছিলেন, তাঁদের অভিযোগগুলি খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর অনুভূতি সম্পর্কে চরম কথাটি বলেছেন ; "যাঁহারা বলিলেন, এ জীবন প্রত্যাদিষ্ট নয়, এ ব্যক্তি ঈশ্বর দর্শন করে নাই, তাঁহারাও মিথ্যা কথা বলিলেন। বারংবার ঈশ্বর দর্শন করিতেছি, তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতেছি, এই সত্য, ইহাই বেদের কথা।…আমি বাহিরের বস্তু সকলকে যেমন দেখিতেছি, ভগবানকে ঠিক তেমনই দেখিতেছি।" তাঁর ধর্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ধর্মবন্ধু সাধকশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও ঠিক এই রকম দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গেই তাঁদের ঈশ্বর উপলব্ধির কথা ঘোষণা করেছিলেন। এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত "দৈবী মানুষ" ব্রহ্মানন্দ

কেশবচন্দ্র সেন ষোলটি অধ্যায়ে তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের গভীর অনুভূতির কথা 'জীবন-বেদে' আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন, যাতে আমরা সকলে তাঁর পন্থা অনুসরণ করে নিজ নিজ জীবনকে 'বেদে' রূপান্তরিত করতে পারি।

'জীবন-বেদে'র এই অকিঞ্চিৎকর ভূমিকা লেখার জন্য যাঁদের কাছ থেকে প্রেরণা ও উৎসাহ পেয়েছি তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার না করলে অপরাধ হবে। প্রথমেই মনে পড়ছে আমার গুরু তুল্য স্বর্গীয় সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা। তিনিই আমাকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও তাঁর আদর্শের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট করেন ও আমার অন্তরে নববিধানের বীজ বপন করেন। নানা ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা ও উৎসাহ পেয়েছি ও বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি উপহার দিয়েও তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। কতদিন সহজ ভাষায় কত আলোচনা করে কেশবচন্দ্রের আদর্শকে সহজ সরল ভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন। তারপর মনে পড়ে স্বর্গীয় নিরঞ্জন নিয়োগীর কথা। তাঁর পূত চরিত্রের সংস্পর্শে এসেও কেশবচন্দ্র সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি। স্বর্গীয় দেবপ্রসাদ মিত্র, স্বর্গীয় ননীভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা দুজনেই সঙ্গতসভা ও সাধনাশ্রমে কেশবচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা করে নূতন ভাবে তাঁর আদর্শ সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেছেন। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ডাঃ সুধীরকুমার চক্রবর্তীর কথাও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। 'জীবন-বেদ' অবলম্বন করে কেশবচন্দ্র সম্পর্কে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ও অন্যান্য জায়গায় কথকতা করেছিলেন। এঁদের সকলকেই আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথমেই ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের তরুণ সম্পাদক শ্রীমান তপোব্রত ব্রহ্মচারীকে কৃতজ্ঞতা জানাই, তিনিই আমাকে এই ভূমিকা লেখার অনুরোধ করে আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখিয়েছেন। তাঁর অনুরোধে এই ভূমিকা লিখতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। তারপরেই মনে আসে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র পাঠচক্রের সহকারী সম্পাদক ও মধ্যমণি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্তের কথা। তিনিও এ ব্যাপারে আমাকে নানা ভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। তারপরে আমার পুত্র শ্রীমান সুতনু চক্রবর্তীর কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাংসারিক চাপে অথবা নিজের শিথিলতার জন্য যখন মাঝে মাঝে লেখার স্রোত মন্দীভূত হয়ে যেত তখন শ্রীমান সুতনু নানা ভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছে। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ। ঈশ্বর এঁদের আশীর্বাদ করুন।

সুরথ চক্রবর্তী

পরিশিষ্ট

ব্রাহ্মসমাজ-ইউনিটেরিয়ানবাদ-কেশবচন্দ্র

ইউনিটেরিয়ানবাদের অর্থ ঈশ্বরের ঐক্য, তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো সরিক নেই, কোনো বিকল্প নেই।

উপনিষদের যে ব্রহ্মবাদ তার সঙ্গে এর কোনো বিরোধ নেই। ইসলামও এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী— লা ইলাহা ইল্লল্লাহ্ (এক ঈশ্বর ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নেই)। সুতরাং ইসলামের সঙ্গেও এর কোনো বিরোধ নেই। এই দিক থেকে দেখলে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ ও ইসলামের একেশ্বরবাদ, এই দুই ধর্মের মধ্যেই মূলতঃ মিল রয়েছে। পার্থক্য যা আছে, যা নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ, সে শুধু বাইরের আচার-বিচার, বিধিনিষেধ নিয়ে। ধর্মের দিক থেকে এগুলো গৌণ ও সামাজিক দিক থেকে সাম্য তখনই আসবে যখন যুক্তির পথে মানুষের মন মুক্তিলাভ করে বুঝতে পারবে যে এই সব পার্থক্যের কোনো সার্থকতা নেই। গোঁড়ামী, ভুয়োসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের দাসত্ব মানুষের ঘোচেনি।

অন্যদিকে ক্রিশ্চিয়ান ধর্মে দেখি ঈশ্বরের ঐক্য নিয়ে বিতর্ক বহুদিন থেকে ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছে। ওল্ড (Old) টেস্টামেন্টে ঈশ্বরের ঐক্যই অবিসংবাদিতভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে— যদিও সেই ঈশ্বর একটি জ্ঞানগোষ্ঠির একটি ছোটো দলের ঈশ্বর, যে দলটিকে তিনি বিশেষ ভাবে নির্বাচিত করেছেন। তর্ক উঠেছে নিউ (New) টেস্টামেন্টকে নিয়ে। কারণটা জানা দরকার। খৃষ্টের জীবিতকালে তাঁর কথামৃত কেউ লিপিবদ্ধ করে যান নি। যারা তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে, তিনি যেখানে যেখানে উপস্থিত হয়েছেন, দলে দলে সেখানে জমায়েত হয়েছেন, তাদের বেশীর ভাগই সমাজের নিম্নকোটির লোক, অপাঙক্তেয় অবহেলিত। রোমান সাম্রাজ্যের উচ্ছৃঙ্খল ভোগবিলাসের সর্বনিম্নস্তরে ছিল অগণ্য অখ্যাত অবজ্ঞাত পরিত্যক্ত মানুষ। পশুরমতো যারা জন্মাতো, পশুর সঙ্গে একই ঘরে বাস করত ও প্রাণত্যাগ করত। ইহকালেও তাদের কোনো আশা ছিল না, পরকালও তাদের মনে কোনো আশ্বাস এনে দিতে পারে নি। এসবই লোকের উদ্দেশ্যহীন জীবনে তিনি আশার আলো জেলে দিলেন, তাদের ব্যর্থ জীবনকে অর্থবান করলেন দীনদরদী আর্তবন্ধু যিশু। তিনি পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন তোমরা ঈশ্বরের বাণী মেনে চলো, তিনি রাজার ও রাজা, পরলোকে স্বর্গরাজ্য তোমাদেরই। তাঁর Sermon of the Mount

সেদিনের দীনদরিদ্র, নিপীড়িত হতভাগ্য জনগণের জন্তই উচ্চারিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত যিশুর জন্ম হয়েছিল সরাই খানার এক পশুশালায়।

যিশুর অনুগামীদের মধ্যে কেতাবী ও কেতাদুরস্ত লোক ছিল না বললেই হয়। তাঁর জীবন ও মৃত্যুকে ঘিরে যত কাহিনী, উপকথা, অতিকথা, রূপকথার সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর একশো বছর পরে সেগুলি তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যরা সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ করেন। এই সব উপকরণ নিয়েই সেণ্ট ম্যাথ্যু ল্যুক ও মার্কের সুসমাচার (Gospel) প্রণীত হয়। সেণ্ট জনের সুসমাচার তারও পরে লিখিত হয় এবং তার মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে— খৃস্টতত্ত্বের সুরু এখান থেকেই। এই খৃস্টতত্ত্বকে আরও সুদৃঢ় করেন সেণ্ট পল। সেণ্ট পল শিক্ষিত সমাজে খৃস্টধর্ম প্রচারে ব্রতী হন এবং অনুভব করলেন শিক্ষিত গ্রীক ও রোমানদের যদি আকৃষ্ট করতে হয় তবে তার মধ্যে দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত করার খুব প্রয়োজন। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে নিউ টেস্টামেণ্ট গ্রীক ভাষায় সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ হয়। চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে এর ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ত্রিত্ববাদ বা ত্রীশ্বরবাদের উৎপত্তি সেণ্ট জন ও সেণ্ট পল থেকেই। ত্রিত্ববাদ বা ত্রীশ্বরবাদ হচ্ছে যে ঈশ্বরের প্রকাশ ত্রয়ীজরূপে— ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র ও ঈশ্বর পবিত্রাত্মা প্রত্যেকেরই পৃথক অস্তিত্ব ও পৃথক ক্রিয়া।

যেহেতু পূর্বোক্ত প্রথম তিন সুসমাচারে ত্রিত্ববাদের স্পষ্ঠ উল্লেখ নেই সেই হেতু কেউ কেউ এই ত্রিত্ববাদের বিরোধিতা করেন। অ্যালেকজান্দ্রিয়ার বিশপ অ্যাথেনিসিয়াস এই মতবাদের একজন শক্তিশালী সমর্থক ছিলেন এবং বিরোধিতা করেন তাঁরই গির্জার এক পাত্রি অ্যারিয়ান। এক ধর্ম সভায় (খৃস্টীয় তৃতীয় শতকে) অ্যাথেনিসিয়াসের ব্যাখ্যাই গৃহীত হল ও অ্যারিয়ানের মত পরিত্যক্ত হল। এই অ্যারিয়ানই ইউনিটেরিয়ান মতবাদের অর্থাৎ ঈশ্বর একই, যিশু ঈশ্বর নন, পবিত্রাত্মাও ঈশ্বর নন, প্রথম হোতা। এর পরে দেখি ফাউস্টাস সোসিনাস (Faustus Socinus) প্রকাশ্যে, ক্রিশ্চিয়ান চার্চের ফতোয়ার বিরুদ্ধে, ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে ইউনিটেরিয়ান মতবাদের সমর্থন করছেন। তিনি ইটালিয়ান কিন্তু পোলাণ্ডে আসেন সেখানে বসবাস করতে ও সেখানেই একটি ইউনিটেরিয়ান চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন।

ইংল্যাণ্ডে এই মতবাদ সমর্থন করেন ফ্রান্সিস বিডল (Francis Biddle)।

তিনি ১৬৪০ খৃঃ স্পষ্টভাবে বলেন যে সুসমাচারের ত্রিত্ববাদের কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন পাদ্রি থিয়োফিলাস লিণ্ডসে (Theophilus Lindsay) ১৭৮০ খৃঃ নাগাদ এবং তিনি এসেক্স স্ট্রীট (Essex Street) গির্জা স্থাপন করেন ও সেখানে নিয়মিত রূপে উপাসনার ব্যবস্থা করেন। এই বিষয়ে তিনি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক যোসেফ প্রিষ্টলি (Joseph Priestley) (যিনি লীডস গির্জার আচার্য ছিলেন ও যিনি অক্সিজেন গ্যাসের আবিষ্কর্তা) তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেন।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ধর্ম জগতে তিন ধরনের একেশ্বরবাদ বর্তমান। হিন্দু একেশ্বরবাদ (যাঁরা বৈষ্ণব তাঁরা বিষ্ণুকেই একমাত্র ঈশ্বর বলেন যাঁরা শৈব তাঁরা শিবকেই একমাত্র ঈশ্বর বলেন, যাঁরা শাক্ত তাঁরা দুর্গাকেই একমাত্র ঈশ্বরী বলেন। এঁদের একটা বিশেষত্ব যে এঁদের ঈশ্বর অবয়ববিশিষ্ট এবং এক ঈশ্বরের অবয়ব অন্য ঈশ্বরের অবয়ব থেকে পৃথক এবং কেহবা দেব কেহবা দেবী) ক্রিশ্চিয়ান একেশ্বরবাদ যার ভিত্তি যিশুখৃষ্ট ও বাইবেল ও সর্বশেষে মুসলমান একেশ্বরবাদ যার প্রবর্তক মহম্মদ ও যার ভিত্তি কোরাণ। চতুর্থ আর একটি একেশ্বরবাদ আছে যাকে বিশ্বজনীন বা ব্রহ্ম একেশ্বরবাদ বলা যেতে পারে, যে ঈশ্বর কোনো বিশেষ ধর্মের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয় কিন্তু সব কিছু যাঁর অন্তর্গত সব কিছু তাঁর সৃষ্টি। সেই এক ঈশ্বর, সমগ্র জগতের ঈশ্বর, সমগ্র বিশ্ববাসীর (তাদের বর্ণ, দেশ, ভাষা যাই হোক না কেন) ঈশ্বর— তিনি হিন্দুরও ঈশ্বর, ক্রিশ্চিয়ানদেরও ঈশ্বর, মুসলমানদেরও ঈশ্বর, আর যারা হিন্দু ক্রিশ্চিয়ান মুসলমান নয়, যারা তাঁকে মানে বা মানে না, জানে বা জানে না, তাদেরও এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর, নিরাকার ও অনন্ত।

ব্রাহ্মসমাজ সেই এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন সংস্কার ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই বিশ্বজনীন সর্বভৌমিক, বিবেক ও নীতির ভিত্তিতে ব্রাহ্মধর্ম গড়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতে এর পরিধি বিস্তৃত হতে থাকবে। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ান ইউনিটেরিয়ানদের সাযুক্ত ও সংযোগই আমার আলোচনার বিষয়বস্তু এবং সেই জন্যই ক্রিশ্চিয়ান ইউনিটেরিয়ান মতবাদের উৎপত্তির ইতিহাস কিছুটা বিবৃত করেছি। আধুনিক কালে অবশ্য ইউনিটেরিয়ানরা নিজেদের ক্রিশ্চিয়ান বলতে সম্মত নয় কারণ তাঁরা যিশুকে মোক্ষলাভের

একমাত্র পথ বলে স্বীকার করেন না।

ব্রাহ্মধর্মের বীজ মানুষের অন্তরে স্মরণাতীত কাল থেকে নিহিত আছে এবং এই বীজমন্ত্র উপনিষদের ঋষিদের উপলব্ধির মধ্যে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত। অধুনিক যুগে এই প্রাচীন ব্রাহ্মধর্মকে এদেশে পুনঃ প্রবর্তিত করেন রামমোহন রায়।* তাঁকে রাজা বা রাজর্ষি বা মহর্ষি বা স্বামীজী উপাধিতে ভূষিত করে তাঁর গৌরব বৃদ্ধি করা যায় না। অন্য দিকে তাঁকে পাষণ্ড, ম্লেচ্ছ, ভাক্ত অধার্মিক বলে অভিহিত করলেও তিনি খর্ব হন না। শুদ্ধমাত্র পিতৃদত্ত নামেই পরিচিত হবার প্রতিভা তাঁর আছে। রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩) আজীবন বেদ বেদান্ত, শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতোপনিষদ (সংক্ষেপে "গীতা"), হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম ও ক্রিশ্চিয়ানধর্ম গভীর ও ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেছেন। এই তিন ধর্মে তিনি যতদূর গভীর ও ব্যাপকভাবে বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন আজ পর্য্যন্ত কোনো এক ব্যক্তির পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। তিনি এই তিন ধর্মের শাস্ত্রগুলি মূল সংস্কৃত আরবী, ফার্সী, গ্রীক, ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় অনুশীলন করেন। তিরিশ বছর বয়সে (১৮০৩ খ্রীঃ), তিনি তুহফৎ-উল-মুয়াহহিদীন লেখেন ফার্সী ভাষায় ও তার ভূমিকা লেখেন আরবী ভাষায়। তারপর (১৮১৫ থেকে ১৮১৯ খ্রীঃ) তিনি বেদান্ত গ্রন্থ কেনোপনিষদ্, কঠোপনিষদ্ মাণ্ডুক্য ও মুণ্ডকোপনিষদ্ অনুবাদ করেন বাংলায়, হিন্দিতে ও ইংরাজিতে। সে যুগে তর্কবাগীশ পণ্ডিতরা ছাড়া রামমোহনের উপনিষদের বাংলা অনুবাদ আর কেউ পড়তেন বলে জানা নেই। বরং তখনকার কালে এই ধারণা ছিল যে বাংলা ভাষায় লেখা এই উপনিষদ্‌গুলি রামমোহনেরই মৌলিক রচনা, যা হিন্দুধর্ম-বিরোধী। তিন হাজার বছর আগে ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বিদেশাগত আর্যজাতির দ্বারা যে এগুলি রচিত হয়েছিল, সে কথা সেদিন সাধারণ লোকের ধারণার বাইরে ছিল— এটাও অবিদিত ছিল যে প্রচলিত পৌত্তলিক ও জাতিভিত্তিক হিন্দুধর্মের সর্বশেষ প্রমাণ্য গ্রন্থ, বেদ ও উপনিষদ আবার উপনিদের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ হচ্ছে ব্রহ্মবাদ বা পরাবিদ্যা।

রামমোহনের হিন্দি অনুবাদ উত্তরভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রামমোহনের পরে যিনি ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করেন) যখন

* তিনিই সর্বপ্রথম ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ইউনিটেরিয়ানদের সংযোগস্থাপন করেন।

প্রথম হিমালয় ভ্রমণের পথে মথুরায় উপস্থিত হলেন (১৮৫৬ খ্রীঃ), তখন যমুনাতীরে এক সন্ন্যাসীর কাছে তিনি রামমোহনের উপনিষদের হিন্দি অনুবাদ দেখতে পান। শতদ্রু তীরে ভজ্জির রাণার রাজধানী শোহিনী। ভজ্জির রাণার গুরু সুখানন্দ স্বামী অবধূত, তাঁর কাছেও দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের নাম শুনেছিলেন। এখন বাংলাভাষায় উপনিষদের বহু অনুবাদ হয়েছে। মুসলমান প্রকাশকও উপনিষদের বাংলা সংস্করণ বার করেছেন। কিন্তু সংস্কৃতশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে রামমোহন পথিকৃৎ। যে গায়ত্রী মন্ত্রপাঠের অধিকার কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের অধিকার ছিল, যে মন্ত্র শোনার অধিকারও ব্রাহ্মণেতর জাতের বা নারীজাতির (ব্রাহ্মণ কন্যা হলেও) ছিল না, রামমোহন সেই গায়ত্রীমন্ত্রের বঙ্গানুবাদ করে, তাকে সবসাধারণের সম্পত্তি করে দিলেন। সাহিত্যের ও ধর্মের ইতিহাসে ব্রাহ্ম সমাজের বাইরে এই সাহসিকতার কোনো তুলনা নেই। সুতরাং রামমোহন যে ব্রাহ্মণদের ও হিন্দুধর্মের নেতাদের চক্ষুশূল হবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ কথা এখানে বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ধর্মশাস্ত্রের প্রথম বাংলা অনুবাদ, বাইবেলের অনুবাদ করেন শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের পাদ্রি উইলিয়াম কেরী। এর আগে কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি জৈন, কি মুসলমান শাস্ত্রের কোনো বাংলা অনুবাদ হয় নি। ঠিক এর পরেই আসে রামমোহনের উপনিষদের অনুবাদ। তারপরে কেশবচন্দ্র সেনের (ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় প্রধান নেতা) নির্দেশে কোরাণের (মূল আরবী থেকে) অনুবাদ করেন গিরিশচন্দ্র সেন।

রামমোহনের উপনিষদের ইংরাজি অনুবাদ বিলেত ও আমেরিকাতে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে অনুবাদগুলির ভূমিকা চিন্তাশীল ইংরাজ ভাষাভাষীদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এইসব অনুবাদ ও ভূমিকা থেকেই তাঁরা ভারতীয় ধর্মোপলব্ধি যে প্রাচীনকালে কত গভীর ও উন্নত ছিল তার পরিচয় লাভ করেন।

এরপর ১৮২০তে রামমোহনের ইংরাজি বই Precepts of Jesus : A Guide to Peace and Happiness (যিশুর উপদেশ—সুখ ও শান্তির পথপ্রদর্শক) যখন প্রকাশিত হল তখন শ্রীরামপুরের পাদ্রিদের সঙ্গে (বিশেষ করে Joshna Mershman) তুমুল তর্ক বেধে যায়। রামমোহন দেখাতে চেয়েছিলেন যে যিশুর বাণীর মধ্যে যে নীতি, মানব সেবা ও ঈশ্বরপ্রেমের যে

আদর্শ আমরা দেখি, তা যে শুধু আমাদের ঈশ্বরবোধকেই সমুচ্চ ও বিশুদ্ধ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে তাই নয়, সাধারণ মানুষের হিতসাধন, সুখ ও শান্তির সহায় হয়। সামাজিক জীবনে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কি হবে, যিশুর উপদেশে, সেই বিষয়ে সহজ, সরল ও সবল নির্দেশ আছে। এদেশের পাদ্রিরা কিন্তু সেই উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়ে, খৃষ্টতত্ত্ব নিয়ে রামমোহনকে আক্রমণ করলেন। মানুষের সুখ ও শান্তি নিয়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিতে একালে অনেক আলোচনা হচ্ছে; এর সুরু বোধহয় করেন Jeremy Bentham (১৭৮০) ও প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন এই ইউ-টিলিটেরিয়ান মতবাদেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। কিন্তু কারা এই শাশ্বত সুখ ও শাশ্বত শান্তি লাভ করতে পারে অন্য একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তার বর্ণনা পাই দুটি কঠোপনিষদের (২/২/১২) শ্লোকে যার রচনাকাল ন্যূনপক্ষে তিন হাজার বছর আগের।

শ্রীরামপুরের পাদ্রিদের সঙ্গে এই তর্কের বিবরণ ইংরাজি পত্র পত্রিকা মারফৎ ইউরোপে, আমেরিকায় প্রকাশিত হতে থাকে ও সেখানকার ধর্মনেতা, ধর্মসংস্কারক ও বিদগ্ধ সমাজে রামমোহন পরিচিত, স্বীকৃতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মূর্তিপূজা, কুসংস্কার, কুপ্রথা, দুর্নীতি ও ভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ও ঈশ্বরের ঐক্যে বিশ্বাসস্থাপনে ও মানবের হিতসাধনে তাঁর প্রচেষ্টা লেখা সমাদর ও সমর্থন লাভ করে। বিদেশের মণীষীরা রামমোহনের জ্ঞানের প্রসারতা উদারতা ও তাঁর তার্কিক যুক্তির প্রখরতা ও মার্জিত রুচি দেখে কৌতূহলান্বিত বিস্মিত ও আকৃষ্ট হন। রামমোহনকে বহুবার তর্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে এবং এখানে তিনি এক নূতন রীতি স্থাপন করেন। সেই নূতন আদর্শ হচ্ছে মার্জিত রুচির। তর্কের খাতিরে এদেশে বিরুদ্ধ পক্ষকে কটূক্তি করা ও কুৎসা রটানোই চলিত ছিল। রামমোহন মার্জিত রুচির পথ থেকে কখনো, বিচ্যুত হন নি—মাঝে মাঝে তিনি শ্লেষ ও ব্যঙ্গের আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু তা ছিল যেমনি সূক্ষ্ম তেমনি ধারালো। ইউরোপের মনীষীরা রামমোহনের এই গুণটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছিলেন ও যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।

কলকাতায় বহু ইংরেজ ও স্কটিশ সিভিলিয়ান ও শ্রেষ্টিদের সঙ্গে রামমোহনের হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব ছিল। John Digby, Thomas Woodforde, Andrew Romsay, Sir Hyde East, David Hare, George James Gordon,

William Tale প্রমুখ। মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল—তারা তাঁকে বলত জবরদস্ত মৌলভী। মুসলমানদের সঙ্গে রামমোহনের এই মেলামেশা তখন হিন্দুরা মোটেই সুনজরে দেখতেন না ও তাঁর বিরুদ্ধে এটাও একটা কারণ ছিল। আবার বহু উদারচেতা অভিজাত, প্রগতিশীল শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে অনেকে তাঁর সান্নিধ্যে আসেন ও বহুপ্রকারে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেন। এঁদের সক্রিয় সাহায্য না পেলে আত্মীয়সভা বা ব্রাহ্ম-সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যথা দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, গোপীনাথ মুন্সী, ব্রজমোহন মজুমদার, নন্দকিশোর বসু, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব, মথুরানাথ মল্লিক, বেহারীলাল চৌবে, রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি।

শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনের পাদ্রিরা বাইবেলের যে বাংলা অনুবাদ করেছিলেন, (১৮০১)। তার ভাষা রামমোহনের মনঃপূত হয় নি। তিনি স্বাভাবিক বাংলায় বাইবেলের অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন (১৮২১) এবং শ্রীরামপুরের দুই পাদ্রি তাঁর সহায় হয়েছিলেন— উইলিয়াম অ্যাডাম ও উইলিয়াম ইয়েটস। বাইবেলের তত্ত্বগুলির আলোচনা করতে করতে অ্যাডাম ত্রিত্ববাদ ত্যাগ করে ঐক্যবাদী হলেন। তিনিই এ দেশে প্রথম ইউনিটেরিয়ান ক্রিশ্চিয়ান। শ্রীরামপুরের পাদ্রিরা এই ঘটনাকে 'দ্বিতীয় ব্রাত্য অ্যাডাম' বলে আখ্যাত করেছিলেন। এর আগে একজন অনুন্নত শ্রেণীর মাদ্রাজি উইলিয়াম রবার্টস (১৭১৩)। Joseph Priestley (অক্সিজেনের আবিষ্কারক) ও Theophilus Lowdsay-র লেখা পড়ে তিনি ইউনিটেরিয়ান মতবাদে আকৃষ্ট হন ও ১৮১৩ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে একটি ছোটো ইউনিটেরিয়ান গির্জা স্থাপন করেন পুরুষ বক্কম এলাকায়। ইংরেজ পাদ্রি Thomas Belsham-এর কাছ থেকে তিনি প্রভূত উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছিলেন। এই টমাস বেলশামের সঙ্গে রামমোহনেরও যোগাযোগ ছিল। উইলিয়াম অ্যাডাম পরে আমেরিকায় বসবাস আরম্ভ করেন ও Toronto-র ইউনিটেরিয়ান গির্জার (Unitarian Church) প্রধান আচার্য নিযুক্ত হন (১৮৪৬)। বিলাতে ও আমেরিকায় অ্যাডাম বহুস্থানে বহুবার রামমোহনের জীবন ও সংগ্রাম সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন।

পাদ্রি টমাস বেলশামের নাম আগেই উল্লেখ করেছি। তিনি লণ্ডনের Unitarian Society-র আচার্য (minister) ছিলেন। ১৮১৮ খৃঃ এক প্রবন্ধে তিনি রামমোহনের সুখ্যাতি করেন। ১৮১৯ খৃঃ ইংল্যাণ্ডের ইউনিটেরিয়দের সম্পাদিত এক পত্রিকায় (Monthly Registerv) রামমোহনের প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকার ১৮২০ খৃঃ জানুয়ারী মাসের সংখ্যায় ফরাসী বিশপ আবে গ্রেগোয়ার (Abbe Gregoire) রামমোহনের বিষয় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। আবে গ্রগোয়ার ফরাসী ভাষাতেও রামমোহন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন।

১৮২১ খৃঃ অ্যাডাম ও রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও অন্যান্য ইংরেজ ও স্কটিশ বন্ধুদের সহযোগিতায়, ক্যালকাটা ইউনিটেরিয়ান কমিটি (Calcutta Unitarian Committee) স্থাপন করেন। এই সময় থেকেই অ্যাডাম লণ্ডন, বষ্টন ও বলটিমোরের ইউনিটেরিয়ানদের সঙ্গে পত্রালাপ করেন। এই সূত্রে পাদ্রি জ্যারেড স্পারকস্ (Rev. Jared Sparks) তাঁর নিজের সম্পাদিত Unitarian Miscellanye-তে (১৮২২, ১৮২৩ খৃঃ) রামমোহন ও অ্যাডাম সম্বন্ধে দুটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। আমেরিকায় প্রকাশিত Christian Register-এও রামমোহন সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল সম্পাদকীয় বার হয়। এই সময় প্রসিদ্ধ ইউনিটেরিয়ান নেতা, উইলিয়াম এলেরি চ্যানিংএর (William Ellery Channing) যিনি বষ্টনের Federnal Street Church-এর আচার্য একটি নিবেদন (sermon) রামমোহন ও অ্যাডাম কলকাতায় প্রকাশিত করেন। এই সময় চ্যানিংকে একটা চিঠি পাঠানো হয়। তিনি তখন ইউরোপে থাকাতে চিঠিটা হার্ভাডের Hollis Professor of Divinity, হেনরি ওয়ার-এর (Henry ware) হাতে পড়ে (১৮২৩ খৃঃ)। এই পত্র পেয়ে, ওয়ার কুড়িটি প্রশ্নের এক পত্র রামমোহনকে লেখেন। রামমোহন এর যে জবাব দেন তা ছাপা হয় Christian Register-এ (May 8, 1824) এর একবছর আগে বষ্টনের The Christian Register-এর সম্পাদক ডেভিড রীড (David Reed) রামমোহনকে কয়েকটি প্রশ্ন লিখে পাঠান। রামমোহনের উত্তর ছাপা হয় ১৮২১ খৃঃ তেরই জানুয়ারী। এঁরা জানতে চেয়েছিলেন যে ভারতে সাফল্যের সঙ্গে ইউনিটেরিয়ান ক্রিশ্চিয়ানিটি প্রচার করা সম্ভব কি না? উত্তরে

রামমোহন বললেন এদেশে এখন সবচাইতে প্রয়োজন পাশ্চাত্য শিক্ষার, বিশেষ করে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার। উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন বিদেশী শিক্ষকরা যদি এদেশে আগ্রহসহকারে এরূপ শিক্ষা দেন যাতে এদেশের লোকদের বিচারশক্তি যুক্তি ও নীতির ভিত্তিতে উন্নত ও দৃঢ় হয় তবেই সত্যধর্ম জয়ী হবে ও এদেশের সকল শ্রেণীর লোকেদের সুখ সৌভাগ্য ও স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি পাবে। রামমোহন আরও বলেন যে এদেশের সকল সাধারণ লোকই চায় যে তাদের সন্তানরা পাশ্চাত্য ভাষায় পাশ্চাত্য জ্ঞান অর্জন করুক। ১৮২৬ খৃঃ ইউনিটেরিয়ান Joseph Tuckerman ও the Christian Examiner-এ রামমোহন সম্বন্ধে একটি অতিদীর্ঘ সুচিন্তিত ও অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন একটি প্রবন্ধ লেখেন। আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি Ezra Stiles gannett ১৮২৬ খৃঃ রামমোহনকে কয়েকটি বই উপহার পাঠান। রামমোহনের সঙ্গে যোসেফ টাকারম্যানের শেষ দেখা হয় ২০ অগষ্ট ১০৩৩। রামমোহন তখন ইংলণ্ডে। এই সাক্ষাতের বিবরণ দিয়ে টাকারম্যান একটা চিঠি লেখেন চ্যানিংকে ; তাতে টাকারম্যান বলেন যে তিনি রামমোহনকে সম্পূর্ণ সুস্থই দেখেছিলেন এবং রামমোহন আমেরিকায় যাবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। তার পাঁচ সপ্তাহ পরেই রামমোহনের মৃত্যু হয়, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩।

ইংরেজ ও আমেরিকান ইউনিটেরিয়নদের সঙ্গে এই রকম যোগাযোগের বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এখানে যেটুকু বলা হয়েছে তাতে একথা স্পষ্ট ভাবেই বোধগম্য হবে যে শিক্ষা, ধর্ম সমাজ-সংস্কার এমন কি প্রশাসনিক পুনর্গঠন বিষয়েও রামমোহনের প্রচেষ্টা, আদর্শ ও নির্ভীকতা বিদেশে যে বিস্তার ও সম্মানলাভ করেছিল তা অন্য কোন ভারতবাসীর ভাগ্যে ইতিপূর্বে ঘটে নি। পরেও (একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত, যিনি দৈবক্রমে ব্রাহ্ম ও একেশ্বরবাদী ছিলেন) আর কেউ এরকম শ্রদ্ধা, সম্মান সৌহার্দ পেয়েছেন কি না সন্দেহ। একান্তভাবে এই অসামান্য প্রতিভাশালী মহাপুরুষ সমগ্র বিশ্ববাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। আমি আর একটি কথা বলে এই পর্ব শেষ করবো। রামমোহন যখন ইংলণ্ডে তখন (১৮৩১ খৃঃ) British Unitarian Society (ব্রিটিশ ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি) তাঁকে সম্বর্ধনা জানান। সেই সভায় তদানীন্তন সম্পাদক ডাঃ জন বাউরিঙ (যিনি পরে Sir John Bowring হন) বলেন যে এই সভায় আজ যদি Socrates, Plato, Milton বা

Newton উপস্থিত থাকতেন তাহলে তাঁরা যতখানি আনন্দিত ও গৌরবান্বিত হোতেন, এই সভায় রামমোহনের উপস্থিতিতে তাঁরা সেই রকম অভিভূত হয়েছেন। রামমোহনের মরদেহ সমহিত করার সময়েও তাঁর প্রশস্তি পাঠ করেছিলেন একদল ইউনিটেরিয়ান Lant Carpenter।

রামমোহনের মৃত্যু (১৮৩৩) ও অ্যাডাম সাহেবের ভারতত্যাগ (১৮৩৮), এইখানেই ব্রাহ্মসমাজ ও ইউনিটেরিয়ানদের মধ্যে আদানপ্রদানের প্রথম পর্বের সমাপ্তি। এই সময় একটা জিনিষ লক্ষণীয় যে তখনও ব্রাহ্মসমাজ সংগঠিত হয়নি ও ব্রিটিশ ও আমেরিকান ইউনিটেরিয়ানরাও তাদের বিদেশনীতি সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি। প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতে বিশ্বাসী ক্রিশ্চিয়ানদের কিন্তু এই ধরণের কোনো সমস্যা ছিলনা— ধর্মান্তরিতকরণই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইউনিটেরিয়ান ক্রিশ্চিয়ানদের মধ্যেও সেই উদ্দেশ্যই কাজ করে গেছে, কিন্তু তা ছাড়াও ইউনিটেরিয়ান পাদ্রিরা আরও ব্যাপকভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশেছেন।

ইউনিটেরিয়ান ও ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কের দ্বিতীয় পর্বের পটভূমিকায় বিশেষ ভাবে দেখা যায় ইউনিটেরিয়ানদের তরফ থেকে পাদ্রি চার্লস ডলকে (Charles H. N. Dall,) ও ব্রাহ্মসমাজের দিক থেকে বয়সানুযায়ী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাখালদাস হালদার, কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে। এই সময়ের মধ্যে (১৮৫৫ থেকে ১৮৮৬) ইউনিটেরিয়ান মেরী কার্পেনটার (Mary Carpenter ভারত সফরে আসেন ও স্ত্রী শিক্ষার পথকে বিস্তৃততর করেছেন। স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যে ও বিষয়বস্তু নিয়ে মেরী কার্পেনটারের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের মতানৈক্য ছিল এবং কেশবচন্দ্রের সে মনোভাব পরে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই বিভেদের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পাদ্রি (এই প্রবন্ধে 'পাদ্রি' কথাটা আমি ইংরাজী Reverend-এর প্রতিশব্দ হিসাবেই ব্যবহার করছি, অন্য কোনো অর্থে নয়), পাদ্রি ডলের এক বছর আগে, আর একজন ইউনিটেরিয়ান পাদ্রি চার্লস ব্রুকস (Charles Brooks) মাসখানেকের জন্য কলকাতা ঘুরে যান (১৮৫৪)। কলকাতায় যাঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় তার মধ্যে ছিলেন ইংরেজ ইউনিটেরিয়ান হজসন প্র্যাট (Hodgson Pratt যিনি ছিলেন গভর্নমেন্টের আণ্ডার সেক্রেটারী), পাদ্রি লালবিহারী দে এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রসন্নকুমার

ঠাকুরের পুত্র যিনি খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় ব্যারিষ্টার (Bar-at-law) এবং পরে লণ্ডনে হিন্দু আইনের অধ্যাপক হন। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কোনো নিরপেক্ষ বা বিশদ বিবরণ ব্রুকস এদের কারুর কাছ থেকেই পান নি। এমন কি ব্রুকস সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে বস্টনে (Boston) রামমোহন সম্বন্ধে লোকেদের যতটুকু জ্ঞান আছে এখানকার লোকেরা তার চেয়েও অজ্ঞ। রামমোহনের বিলাত যাত্রার পনের বছরের মধ্যে তাঁকে ভুল বোঝা তো দূরের কথা তাঁকে প্রায় ভুলে যেতে এদেশের লোকেরা সমর্থ হয়েছিল। মেরী কার্পেণ্টার যখন ১৮৬৬ খৃঃ এদেশে আসেন, তখন তিনিও লক্ষ্য করেছিলেন যে রামমোহনের স্মৃতি এদেশে কতখানি অবহেলিত। দেশে ফিরে গিয়ে ব্রুকস যে বিবরণ পেশ করেন তার ভিত্তিতেই আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েসন (American Unitarian Association) স্থির করেন যে ভারতে একজন ইউনিটেরিয়ান পাদ্রির পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা আছে ও সেই ভিত্তিতেই তাঁরা পাদ্রি চার্লস ডলকে (Charles H. A. Dall) মনোনীত করেন। তখন তাঁর বয়স উনচল্লিশ বছর। ১৮৫৫ খৃঃ তিনি কলকাতায় পদার্পণ করেন ও দীর্ঘ একত্রিশ বছর এখানেই অতিবাহিত করে এদেশের মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (১৮৮৬ খৃঃ)।

এদেশে এসে ইংরেজ ইউনিটেরিয়ান হজসন প্রাট, আমেরিকান কনসাল রিচার্ড লিউস (Richard Lewis) ছাড়াও বিশেষভাবে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় ক্রিশ্চিয়ান জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ব্রাহ্ম রাখালদাস হালদার ও ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে। এদেশে এসে তিনি বাংলা, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেন। রাখালদাস হালদারের উৎসাহেই তিনি খিদিরপুর ব্রাহ্মসমাজে কয়েকবার ধর্মোপদেশ দান করেন। তাঁর বিষয়বস্তু হল যিশুর প্রমত্ত ভক্তি ও রামমোহন যে আলোকে যিশুকে এনেছিলেন তারই ব্যাখ্যা। খুব সম্ভব এই সূত্রেই তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। তবে এই পরিচয়ের পরিণাম খুব মধুর হয় নি। দেবেন্দ্রনাথ তখন ঘোরতর ক্রাইষ্ট বিরোধী। ঠিক ক্রাইষ্ট বিরোধী কিনা বলা হয়তো যায় না—তবে এদেশে যে উপায়ে ক্রাইষ্টের ধর্ম পাদ্রিরা প্রচার ও প্রসার করছেন, দেবেন্দ্রনাথ তার আপোষহীন বিরোধী ছিলেন। তিনি ডলকে স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিলেন যে ব্রাহ্মসমাজে তিনি ক্রাইষ্টের নামোচ্চারণও শুনতে চান না। যখন কলকাতা (আদি) ব্রাহ্মসমাজে ধর্মোপদেশ দেবার

সুযোগ দেবেন্দ্রনাথ বন্ধ করে দিলেন, তখন ডল রামমোহন রায় সোসাইয়েটি (১৮৫৭ খৃঃ) স্থাপন করেন। এই কারণে রাখালদাস হালদারও ব্রাহ্মসমাজ বর্জন করেন। ১৮৫৭ খৃঃ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগদেন। ব্রাহ্মসমাজে তর্কচচার প্রভাব ও ধর্মনিষ্ঠার অভাব দেখে ১৮৫৬ খৃঃ শেষভাগে দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় যাত্রা করেন। আত্মজীবনীতে তিনি বলছেন, "আমি এখান হইতে পলাইব, সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইব, আর ফিরব না।"

দেবেন্দ্রনাথের জীবনে পরস্পর বিরোধি দুটি ধারা সমান্তরাল ভাবে প্রভাবিত; একদিকে দুঃসাহসিক, অন্যদিকে রক্ষণশীল। যেখানে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মোপলব্ধি সেখানে বাইরের কোনো বাধা তিনি গ্রাহ্য করেন নি। ঐশ্বর্যের আকর্ষণ যৌবনের উন্মাদনা আচার সর্বস্ব প্রচলিত সংস্কার, সামাজিক সম্মান সব কিছু পরিহার করে অন্তর্লব্ধ আধ্যাত্মিক সত্যের দুরতিক্রম্য পথই তিনি বেছে নিয়েছেন। পৌত্তলিকতা তিনি বর্জন করলেন, বেদ উপনিষদের অভ্রান্ততা অপৌরুষেয়ত্তা তিনি অস্বীকার করলেন। অপরদিকে যেখানে সামাজিক প্রচলিত প্রথা সেখানে তার আমূল পরিবর্তনে তাঁর দ্বিধা ছিল। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিপত্রে তিনি বলতেন যে বিয়েতে জাতপাতের বাধা উঠে যাবেই, ব্রাহ্মণ আচার্যেরাই যে ভাল উপাসনায় সক্ষম এমনও নয়, ব্রাহ্মবিবাহে রাজবিধিরও প্রয়োজন আছে অথচ সমাজের জীবনে এইসব নীতি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তিনি উৎসাহযুক্ত ছিলেন না। এই ক্ষেত্রে বুদ্ধি দিয়ে তিনি যা বললেন, মন দিয়ে তাতে সায় দিতে পারতেন না। আধুনিক যুগে হিন্দুদেরও এই সমস্যা। বুদ্ধির দ্বারা তারা যা গ্রহণ করেন মনের দ্বারা প্রতিরোধ শক্তির তার অভাবে তারা তা ত্যাগ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্র যত্নসহকারেই অধ্যয়ন করেন। কিন্তু খ্রীষ্টের আত্মনিবেদিত কর্মময় জীবনের সঙ্গে বোধহয় তাঁর গভীর পরিচয় ছিল না। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যমপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন যে সেমেটিক (ইহুদী) ধর্মশাস্ত্রে দেবেন্দ্রনাথের জ্ঞান খুবই সীমিত ছিল এদেশের খ্রিশ্চিয়ান মিশনারীরা খৃষ্টতত্ত্বকে যে ভাবে প্রচার করতেন তা দেবেন্দ্রনাথ অপছন্দই যে করতেন তা নয়, তার প্রতিবাদও করেছেন। তবে তত্ত্বকথা পার হয়ে খ্রিশ্চিয়ান সাধকেরা ভগবৎ প্রেমে অবগাহন করে যে অনির্বচনীয় মাধুর্য তাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল তার পরিচয় দেবেন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই পান নি। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র

রবীন্দ্রনাথ সেই পরিচয় পেয়েছিলেন। তাই আজো দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রতি বছর ২১শে ডিসেম্বর (পৌষউৎসবের ঠিক পরেই) খৃস্টোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ক্রাইস্ট সম্বন্ধে এই সীমাবদ্ধতা পরবর্তী যুগে নব্য যুবক ব্রাহ্মদের সঙ্গে বিরোধের অন্যতম কারণ।

ডল সাহেব এদেশে এসে প্রথম দিকে যাঁদের হিন্দুধর্মের সংস্কার-সমূহ নির্মূল করতে ও ইউনিটেরিয়ান মতবাদে বিশেষ আগ্রহান্বিত বলে চিহ্নিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেশবচন্দ্রের স্থান ছিল না। কেশবচন্দ্র তখনও অখ্যাত। ডল সাহেব তাঁর মিশন হাউসে একটি লাইব্রেরি স্থাপন করেছিলেন। সেখানে চ্যানিং (William Ellery Channing), ওয়ার (Henry Ware), এমার্সন (Ralph Waldo Emerson), হেজ (Hedge), ডিয়ুই (Orvills Dewey), পার্কার (Theodore Parker) প্রভৃতি ইউনিটে-রিয়ান লেখকদের বই রাখা হত। কেশবচন্দ্র ওই লাইব্রেরিতে যাতায়াত করতেন। কেশবচন্দ্রের বয়স যখন আঠার তখনই ডল সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সে যুগের যাঁরা 'ইয়াং বেঙ্গল (Young Bengal) তাঁদের অনেকের সঙ্গে ডল সাহেবের যোগ ছিল। তাঁদের অনেকেই ডল সাহেবের বক্তৃতা শুনতে আগ্রহী ছিলেন ও ধর্ম বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে অনেক কথোপকথন হতো। এদের মধ্যে কেউ কেউ অর্থ দান করতেন, কেউ কেউ ইউনিটেরিয়ান বই কিনতেন ও অল্প কয়েকজন ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের অনুরাগী হয়েছিলেন।

অল্প বয়স থেকেই কেশবচন্দ্রের মধ্যে ধর্মপ্রবণতা ও নীতিবোধ দেখা দিয়েছিল। তিনি অল্পবয়সে শিক্ষাকালীণ অবস্থায় যে তিনজন ক্রিশ্চিয়ান মিশনারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরা পাদ্রি জেমস লঙ (নীলদর্পণের অনুবাদক) পাদ্রি টি, এইচ, বার্ন (কলকাতা বিশপের যাজক, Chaplain) ও আমেরিকান ইউনিটেরি মিশনের পাদ্রি চার্লস ডল। কেশবচন্দ্রের কলুটোলা সান্ধ্য বিদ্যালয়েও (Colootolah Evening School) ডল সাহেব বক্তৃতা দিয়েছেন। কেশবচন্দ্রের অনুরোধে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির কার্যকলাপে তিনি যোগ রক্ষা করতেন, যদিও এই সভায় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনাই বেশি হত, তবে ধর্ম প্রসঙ্গও একেবারে বাদ পড়ত না। এই সভাতে পাদ্রি জেমস লঙও আসতেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের রচনা এঁদের বাদানুবাদের কৌতুকপ্রদ বর্ণনা আছে। ডল সাহেব মনে করতেন যে কেশবচন্দ্রের

ধর্মোন্মেষের যুগে তিনিই তাঁর ধর্মোপদেষ্টার কাজ করেছেন। দুজনের মধ্যে ধর্মবিষয়ে অনেক গভীর আলোচনা হতো। ডল সাহেব তাঁর তরুণ প্রতিভাবান শ্রোতাকে শোনাতেন যে ধার্মিকের জীবন ক্রমিক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। সকল ধর্মকেই কেবল পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাকলেই তার নিগূঢ় উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না, নবতর প্রেরণা লাভ করার জন্য উন্মুখ থাকতে হবে। ক্রাইস্ট যিনি বিশুদ্ধ প্রেম, বিশ্বাস, জ্ঞান ও শক্তির আধার, তাঁকে গ্রহণ করতে হবে, যুগে যুগে দেশে দেশে ঈশ্বরের মহিমা নানাভাবে প্রকাশিত হয়, বেদ উপনিষদের যুগও এমনি একটি যুগ ইত্যাদি। কেশবচন্দ্র স্থাপিত গুডউইল ফ্রেটারনিটির (Goodwill Fraternity) সঙ্গেও খুব সম্ভবত যোগ ছিল ও এখানেই কেশবচন্দ্র Dr. Chalmar-এর Discourse on Enthusiasm ও Theodore Parker-এর Sermon on Inspiration তাঁর অনুগামী যুবকদের পাঠ করে শুনিয়েছেন। কোন সন্দেহ নেই যে ইউনিটেরিয়ান চিন্তাধারার কেশবচন্দ্রের জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল। The Unitarian Herald কেশবচন্দ্রের বিখ্যাত বক্তৃতা, Jesus Christ, Europe and Asia (মেডিকেল কলেজ থিয়েটারেএ প্রদত্ত, ১৮৬৬ খৃঃ) আলোচনা প্রসঙ্গে লেখেন যে কেশবচন্দ্রের ভাষার ও ভাবের সঙ্গে ক্যানিং ও অন্যান্য প্রভাবশালী ইউনিটেরিয়ানদের মিল রয়েছে। এই বক্তৃতা পাঠ করে লর্ড লরেনস (Lord Lowrence) তদানীন্তন গভর্ণর জেনারল, কেশবচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কেশবচন্দ্রের সহায় হন। Jesus Christ সম্বন্ধে আরও দুটি বক্তৃতা দেন India Asks : Who is Christ ? (১৮৭৯ খৃঃ) ও That Mervellous Mystery : The Trinity (১৮৮২ খৃঃ)। শেষোক্ত বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র বিদেশী মিশনারীদের সাবধান করে বলছেন যে যদি আপনারা সত্য গোপন করে এই কথা প্রচার করেন যে ক্রাইস্টই মূর্তিমান ঈশ্বর, ক্রাইস্টই নরাকারে ঈশ্বর তাহলে আপনারা এই মুহূর্তে দেশ ত্যাগ করে চলে যান (quit the land) কারণ তাহলে আপনারা ভারতদ্রোহী, ক্রাইস্টদ্রোহী ও ঈশ্বরদ্রোহী। গান্ধিজীর Quit India আওয়াজ তোলার আগেই আমরা কেশবচন্দ্রের মুখে শুনি quit the land,। এই বক্তৃতার আর এক জায়গায় কেশবচন্দ্র বলছেন নর ও নারীর গুণের উৎকর্ষতার সংযোগের ভাবমূর্তিই হচ্ছে ক্রাইস্ট। কেশবচন্দ্র ক্রাইস্টকে কোনো ধর্মের প্রবর্তক বা নীতির উপদেষ্টা হিসেবে দেখেন

নি। তিনি তাঁকে দেখেছেন চূড়ান্ত আত্মনিবেদনের আধ্যাত্মিক অনুভূতি হিসেবে। এইখানেই রামমোহনের সঙ্গে তাঁর কিছুটা পার্থক্য। আবার রামমোহনের সঙ্গে তাঁর মিলও আছে যখন কেশবচন্দ্র বলছেন, ক্রাইস্ট যে বিশুদ্ধ নীতির উপদেশ দিয়েছেন সর্ব-মানবের চেতনায় তার সাড়া ও সায় পাওয়া যায়। এছাড়াও তাঁর বহু বক্তৃতার মধ্যে ক্রাইস্টের উল্লেখ আছে। তাঁর শেষ বক্তৃতা, (জানুয়ারী ১৮৮৩) Asia's Message to Europe তে তিনি মানুষের হিতসাধনার্থে উৎসর্গীকৃত ক্রাইস্টের জীবন তাকেই যে শুধু শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন তা নয়, জগতের সমস্ত ধর্ম-প্রবর্তকরাই (বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, ইহুদী ধর্ম, জোরাথ্যাষ্ট্রিয়ান ধর্ম, চৈতন্যের ভক্তি ধর্ম) আমাদের শ্রদ্ধার্হ এবং শেষে তিনি বলছেন যে করুণাময় ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানে আজ পৃথিবীতে এমন সুযোগ এসেছে যাকে অবলম্বন করে আমরা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারি— এই আন্তর্জাতিক মৈত্রীর স্বপ্ন যখন তিনি দেখছেন তখন League of Nation বহুদূরে, United Nation Organization আরও দূরে আর দুই প্রতিষ্ঠানেরই কর্মক্ষেত্র সীমিত কেননা সেখানে ঈশ্বরের প্রেমের স্থান নেই আর এই প্রেম হৃদয়ে না জাগলে মানবভ্রাতৃত্ব ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদ।

কেশবচন্দ্রের লণ্ডনে পৌছবার অব্যবহিত পূর্বে সেখানকার ইউনিটেরিয়ান পত্রিকা The Inquirer লেখেন যে ১৮৬০/৬১ খৃঃ কেশবচন্দ্র যে সকল পুস্তিকা (tracts) প্রণয়ন করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে তাঁর বহু বক্তৃতার মধ্যে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার আধ্যাত্মিক একেশ্বরবাদের সাদৃশ্য আছে— যে চিন্তাধারা নিউম্যান (F N. Newman), থিয়োডোর পার্কার ও ফ্রান্সেস কব (Frances Cobbe) প্রভৃতি ইউনিটেরিয়ান লেখকদের রচনায় পাওয়া যায়। রাখালদাস হালদার কেশবচন্দ্রের আগেই ইংল্যাণ্ডে যান এবং তিনিও কেশবচন্দ্রের রচনার সঙ্গে ইংরেজ পাঠকেদর পরিচয় করিয়ে দেন। কেশবচন্দ্র যখন ইংল্যাণ্ডে পৌছন তিনি সেখানে একেবারে অজ্ঞাত অখ্যাত আগন্তুক হয়ে যান নি। কেশবচন্দ্রের শুভানুধ্যায়ী Lord Lawrenceও তখন লণ্ডনে।

১৮৭০ খৃঃ মার্চ মাসে কেশবচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে পদার্পণ করেন। সেখানে নানা জায়গায় তিনি বক্তৃতা ও ধর্মোপদেশ দেন। সকল সম্প্রদায়ের চার্চেই তিনি ভাষণ দেন, বহু ইউনিটেরিয়ান চার্চ থেকে আমন্ত্রণ তিনি পান। তাঁর বক্তৃতার

বিবরণ সোফিয়া ডবসন কলেক্ট, (Sophia Dobson Collect) যদিও তিনি অংগ্রিকান ছিলেন, অতি যত্নের সঙ্গে প্রকাশিত করেন। বিদ্যুৎগতিতে তাঁর খ্যাতি ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। বহু লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়— সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁকে ডেকে পাঠান ; হল্যাণ্ডের রাণীর সঙ্গেও তাঁর কথাবার্তা হয়, তাঁর আলাপ হয় Sophia Collect, Frances Cobbe, Elizabeth, Sharpe, Lord Sheftesbury, Sir Robert Montgomary, Dr. Guthrie (স্কচ পাদ্রি) Dean of West Minster, (Dr. Arthur Stanley), Professor Max Mueller, John Stuart Mill, Charles, Darwin, Sir Charles Trevelyan, Gladstone এবং আরো অনেক চিন্তাবিদদের সঙ্গে। আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান মিশনারী W. G Eliot-এর সঙ্গেও তাঁর আলাপ হয়। Little Portland Street-এ অবস্থিত Dr. James Martineau-র গির্জায় কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শোনার জন্য House of Lords এবং House of Commons-এর অনেক সদস্য অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। British and Foreign Unitarian Association যে স্বাগত সম্বর্ধনার আয়োজন করেন (১২ই এপ্রিল ১৮৭০) সেখানেও অ্যাসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট ছাড়াও বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন ও উপস্থিত ছিলেন ইংল্যাণ্ডের সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৭০, Hanover Square Rooms-এ তাঁর বিদায় সভাতেও এগারটি বিভিন্ন ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ভারতবর্ষে ফিরে এসে কেশবচন্দ্র কর্মের পূর্ণ জোয়ারে ব্রাহ্মসমাজ তরণী ভাসিয়ে দিলেন। motto হল যে ব্রাহ্মদের হৃদয় হবে ভারতীয় ঋষিদের মত পবিত্র ও শান্ত ও তাদের হাত হবে ইউরোপীয়ানদের মত সবল ও সক্রিয়। তিনি নারীজাতির আর্থিক উন্নতির জন্য, কেতাবী ও কারিগরী শিক্ষার জন্য, দরিদ্রদের জনসুলভ ও সহজলভ্য সাহিত্য সৃষ্টির জন্য, মাদকাসক্তি নিবারণের ও দুর্বল শ্রেণীর আর্থিক সাহায্যের জন্য পাঁচটি বিভাগে ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েসন (Indian Reform Association) প্রতিষ্ঠা করেন এবং কার্যসূচী রূপায়নে ইংরেজ ও আমেরিকান ইউনিটেরিয়ানদের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেন। ১৮৭২ খৃঃ ব্রাহ্মবিবাহ আইন (অন্য নামে) কার্যকরী হয়।

কিন্তু ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে গতির চেয়ে কেশবচন্দ্রের ঝোঁক পড়ল স্থিতির দিকে। বহির্মুখীন থেকে তাঁর মন ক্রমশ অন্তর্মুখীন হয়ে উঠল। যিনি একদিন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন তিনি এখন ভক্তির প্রবলতা, ধ্যানের প্রবলতা, বৈরাগ্যের প্রবলতা, যোগের প্রবলতা, ঈশ্বরের ও তাঁর প্রেরিত সাধুদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে লাগলেন ও প্রত্যাদেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। এখানে আবার দেখি তাঁর ধর্ম-পিতা দেবেন্দ্রনাথের জীবনের ধারার সঙ্গে মিল— সেই ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরস পান, সেই আদেশের প্রতীক্ষা। সর্বশেষে কুচবিহার বিবাহ ব্রাহ্মসমাজে দ্বিতীয় বার বিপ্লব সংঘটন করল। কেশবচন্দ্রের এই পরিবর্তন ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার ইউনিটেরিয়ানদের মনে বিস্ময় ও বীতরাগ এনে দিল। তিনি তীক্ষ্ণ সমালোচনার পাত্র হয়ে উঠলেন। পশ্চিমের জনমতের পাল্লা ভারী হল সাধারণ সমাজের দিকে। কিন্তু তাঁরাও সাধারণ সমাজে এমন কোনো লোকের সাক্ষাৎ পেলেন না যিনি কেশবচন্দ্রের স্থান পূরণ করতে পারেন।

অবশেষে দীর্ঘ রোগভোগের পর ৮ই জানুয়ারী ১৮৮৪ খৃঃ, কেশবচন্দ্র তাঁর স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে চিরবিশ্রাম লাভ করলেন। তাঁর অন্তিম রোগশয্যায় তাঁকে দেখতে আসেন কলকাতার লর্ড বিশপ, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তাঁর মৃত্যু মুহূর্তে একমাত্র বিদেশী যিনি উপস্থিত ছিলেন তিনি সেই আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান পাদ্রি চার্লস ডল যার মিশন হাউস (Misson House) লাইব্রেরীতে কিশোর কেশবচন্দ্র ধর্মশাস্ত্র পড়তে যেতেন ও যাঁর সঙ্গে ধর্মচর্চা করতেন। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর ২ বছর পরেই এদেশের মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আমেরিকান পাদ্রি সেই চার্লস ডল (১৮৮৬, জুলাই)।

ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্র ও আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান চার্লস ডলের মৃত্যুতে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ইউনিটেরিয়ানদের সংযোগের দ্বিতীয় পর্বের শেষ হল, যেমন প্রথম পর্বের শেষ হয়েছিল ব্রাহ্ম রামমোহনের মৃত্যুতে (১৮৩৩ খৃঃ) ও ইংরেজ ইউনিটেরিয়ান উইলিয়াম অ্যাডামের ভারত ত্যাগে (১৮৩৮ খৃঃ)। তৃতীয় পর্ব সুরু হয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ডকে (Javez. T. Sunderland) কেন্দ্র করে। ততদিনে দৃষ্টিভঙ্গীর ও কর্মপন্থা দুটোরই পরিপ্রেক্ষিতের পরিবর্তন হয়েছে— কিন্তু এই তৃতীয় পর্বের ইতিহাস আমাদের আলোচ্য সীমানার বাইরে।

অনিল মৈত্র

সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ অফ ইণ্ডিয়া।